শাস্ত্র মহিমা।

-০০:--:০০ ———

(সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রের সঙ্ক্ষিপ্ত সমালোচনা।)

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধং ।
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতং ॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সামযজুরেব চ ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং ॥

*　　*　　*　　*

"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

গীতা

———০::০———

৬৫.২নং বিডন ষ্ট্রীট হইতে
গ্রন্থকার সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

"লিলিয়ান যন্ত্র," ৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন।

সন ১২৯৮ সাল।

৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন "লিলিয়ান যন্ত্রে"

শ্রীবিনোদবিহারী মজুমদার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

আমরা হিন্দু হইয়া হিন্দু শাস্ত্র জানি না, বুঝি না, ইহাপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? হিন্দু শাস্ত্র এত বৃহৎ ও এত জটিল হইয়াছে যে আজি কালিকার দিনে কাহারই সেই সকল শাস্ত্র পাঠ করিবার সময় ও সুবিধা নাই। যাহাতে অপর সাধারণ সকলেই হিন্দু শাস্ত্রের প্রকৃত মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে বহু পরিশ্রমে আমরা এই ক্ষুদ্র "শাস্ত্র মহিমা" প্রণয়ণ করিলাম। এই পুস্তক পাঠ করিয়া এক জনেরও হিন্দু ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মিলে আমাদের সকল পরিশ্রম সফল হইবে।

সূচনা।

তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়াছে; ঝটিকার পর ঝটিকা ছুটিয়াছে; তবুও আর্য্যঋষিগণ গঙ্গা যমুনার তীরে যে ধর্ম্ম সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, দিনে দিনে তাহা উৎকর্ষতা লাভ করিয়া সুদৃঢ় হইতে সুদৃঢ়তর ভিন্ন নিস্তেজ বা নিষ্প্রভ হয় নাই। অসি হস্তে ধর্ম্মোৎসাহী উন্মত্ত মুসলমানগণ লক্ষে লক্ষে ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন; বাইবেল হস্তে দয়ামায়া স্বাধীনতা ও সাম্যনীতি প্রচার করিতে করিতে ভারতে খৃষ্টিয়াণগণ প্রবিষ্ট হইয়া পবিত্র জীযুর ধর্ম্ম প্রচারিত করিতে এখনও প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু এই সকল ধর্ম্ম বিপ্লবে আর্য্যধর্ম্ম অধিকতর দীপ্তিমান ভিন্ন দীপ্তিহীন হইতেছে না। ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য রিতিনীতি আচার ব্যবহার ও সভ্যতা ছিন্নকুল স্রোতস্বতীর ন্যায় চারিদিক ভাসাইয়া ছুটি-তেছে। সেই দুর্দ্দমনীয় তরঙ্গে ভারতীয় সকলই ভাসিয়া যাইতেছে। অনেকেই ভয় করিয়াছিলেন যে সম্ভবমত এই প্রবল স্রোতে পবিত্র আর্য্যধর্ম্মও ভাসিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা যায় নাই। ইংরাজি শিক্ষায় ভারতে জ্ঞান বিস্তারের ও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ভারতবাসীর হিন্দুধর্ম্মে অনাদর না হইয়া বরং তাঁহাদের এই সনাতন ঋষিধর্ম্মে অধিকতর ভক্তি জন্মিতেছে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গা ও

সূচনা।

যমুনার তীরে অরণ্যবাসী, ফলমূলাহারী ঋষিগণ যে ধর্ম্মের বীজ সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে কালে যে বৃহৎ বৃক্ষ সমুৎপন্ন হইয়াছে, বহু ঝটিকায়ও তাঁহা উৎপাটিত হয় নাই। অরণ্যবাসী ঋষিগণ নির্জ্জনে বসিয়া ভারতে যে পবিত্র ও সুন্দর ধর্ম্মপ্রাসাদ নির্ম্মিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর দিয়া কত প্রলয় কালীন মত্ত মারুত ছুটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই বিস্তৃত প্রাসাদের এক ক্ষুদ্রাংশও স্থানচ্যুত করিতে সক্ষম হয় নাই। কালে গ্রীক ও রোমানদিগের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এক সময়ে মিশর রাজ্যে যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্তও এক্ষণে নাই। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যে মুসলমান ধর্ম্ম জগতের প্রায় অর্দ্ধাংশ গ্রাস করিবার উদ্যম করিয়াছিল, দিনে দিনে সেই মুসলমান ধর্ম্মও প্রায় নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে: যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম দ্বাদশ জন ধীবর সন্তান পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য জনপদের একমাত্র ধর্ম্মরূপে পরিগণিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই মহা দীপ্তিমান খৃষ্টিয়াণ ধর্ম্মও শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে। ভারতে হিন্দুধর্ম্মকে বিলুপ্ত করিবার জন্য এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত প্রবল বেগে ছুটিয়াছিল, কিন্তু সে স্রোতও প্রায় অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পবিত্র ঋষিধর্ম্মের নিকট যে আইসে, সেই পরাস্ত হইয়া যায়; সহস্র বৎসরের যুদ্ধেও সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ক্ষীণ হয়েন নাই; জরাজীর্ণ হইলেও তিনি বৃদ্ধ নহেন। তাঁহার চির যৌবন সমভাবে সকল কালে সমানই বিরাজিত রহিয়াছে; ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে হিন্দুধর্ম্মই এ জগতে একমাত্র অমর ধর্ম্ম।

সূচনা

হিন্দুধর্ম্মে এমন কি আছে, যাহার বলে হিন্দুধর্ম্ম সমভাবে মস্তকোত্তলন করিয়া সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন? তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়াছে, ঝটিকার পর ঝটিকা গিয়াছে, তবুও কি বলে ফলমূলাহারী ঋষিধর্ম্ম এখনও সেই পূর্ব্ব তেজে বিরাজমান রহিতেছেন? ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হয় যে হিন্দুধর্ম্মই সত্য ও হিন্দুধর্ম্মই ঈশ্বরবাক্য।

মিথ্যা কখনই বহুদিন তিষ্ঠিতে পারে না; মিথ্যা যদি চিরকাল থাকিত, তাহা হইলে গ্রীক, রোম ও মিশরের মহা সমারোহ-যুক্ত ধর্ম্ম সকল কখনই বিলুপ্ত হইয়া যাইত না। তাহা হইলে মুসলমান এবং খৃষ্টিয়াণ প্রভৃতি ধর্ম্মও দিনে দিনে নিস্প্রভ হইয়া আসিত না। হিন্দুধর্ম্ম যদি মিথ্যা হইত, তাহা হইলে ইহা কখনই এত ঝটিকার পরেও সমভাবে দীপ্তিমান থাকিত না।

হিন্দুধর্ম্ম সত্য ও ঈশ্বর বাক্য। আমরা হিন্দু হইয়া যেমন এই কথা বলি, অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণও ঠিক সেইরূপ স্ব স্ব ধর্ম্মকে সত্য ও ঈশ্বর বাক্য বলিয়া থাকেন। হিন্দুধর্ম্ম বহু প্রাচীণ ও বহু ধর্ম্ম বিপ্লবেও সমভাবে ভারতে বিরাজিত রহিয়াছে বলিয়াই কি হিন্দুধর্ম্মকে সত্য ও ঈশ্বর বাক্য বলিতে হইবে? যদি ইহাই হিন্দুধর্ম্মকে সত্য ও ঈশ্বর বাক্য বলিবার একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে আমরা কখনই হিন্দুধর্ম্মকে এ উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহসী হইতাম না।

ধর্ম্ম মাত্রেরই মূল ধর্ম্ম শাস্ত্র। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই বিশ্বাসের ভিত্তি কতকগুলি পুস্তক। এই সকল শাস্ত্রে বহুবিধ ধর্ম্ম উপদেশ, ধর্ম্মকথা ও মহাত্মাগণের বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

কোন কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ভগবান মনুষ্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহারই বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। সকলেই বলেন যে এই সকল বাক্য স্বয়ং ভগবানের কণ্ঠ নিঃসৃত, সুতরাং এ সকল কথা সমস্তই সত্য। পূর্ব্বে এই সকল ঈশ্বরবাক্য মহাত্মাগণের মুখে মুখে ছিল, এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া জন সাধারণ সকলের দ্বারা পঠিত হইতেছে।

এই সকল ধর্ম্ম পুস্তকে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহার সকলই সত্য ও সকলই ঈশ্বর বাক্য বলিলে বাতুলের প্রলাপ হইবে। হিন্দুধর্ম্মে সহস্র সহস্র ধর্ম্মপুস্তক আছে ; এই সমস্ত ধর্ম্ম-পুস্তকে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহার সকলই সত্য ও সকলই ঈশ্বরবাক্য, এ কথা আমরা বলি না, একথা বলিতে কেহই সাহস করিবেন না। হিন্দুধর্ম্ম কিসে সত্য ও কি কারণে হিন্দুধর্ম্মই কেবল ঈশ্বরবাক্য, তাহার বিস্তৃত আলোচনা আমরা ক্রমে করিব।

ঈশ্বর স্বয়ং আসিয়া এই সকল কথা কাহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, প্রকৃতস্থ ব্যক্তি মাত্রের কেহই একথা বিশ্বাস করিবেন না। ঈশ্বর যে হস্তপদ বিশিষ্ট জীব বিশেষ নহেন, ইহা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ বহু গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন। তিনি যে হস্তপদ বিশিষ্ট হইয়া মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিয়া মানুষকে হিতোপদেশ দেন, একথাও কেহ বিশ্বাস করিবেন না, কারণ যতদিন হইতে জগতে প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তত দিনের মধ্যে ভগবানের এরূপ আবির্ভাব এপর্য্যন্ত আর কেহ কখনও

প্রত্যক্ষ করেন নাই। প্রাচীণ কালে তিনি এরূপ করিতেন, আর আধুনিক সহস্র বৎসরের মধ্যে একবারও করেন নাই, ইহা কখনই সম্ভব নহে। এই জন্য হস্তপদ বিশিষ্ট ভগবানের আবির্ভাব যে সকল পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভগবান হস্তপদ বিশিষ্ট জীব বিশেষ নহেন, তিনি মনুষ্যের ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করেন না; তিনি অনন্ত, অজ্ঞেয়, ও অসীম।

ঈশ্বরের এইরূপ অস্তিত্বই বিজ্ঞান ও দর্শন সম্মত; আর জগতের মধ্যে কেবল হিন্দুগণই এইরূপ ভগবানে বিশ্বাস করেন; সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি যে সত্যের উপর সংস্থাপিত, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব এইরূপ হয়, তাহা হইলে এরূপ ঈশ্বর কখনই স্বয়ং আসিয়া কাহাকেও ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করেন না, বা এরূপ ঈশ্বরে এরূপ কার্য্য সম্পাদিত হওয়া সম্ভবও নহে।

তবে ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরবাক্য হয় কিরূপে? আমরা দেখিয়াছি ও প্রত্যহ দেখিতেছি যে, আমরা সকলে কবি নহি। জগতের সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে চারি পাঁচটী কবি ব্যতিত আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল কবি ও ইহাঁদের কবিতা অমরত্ব লাভ করিয়া সমতেজে চির-কাল মানব হৃদয়ে সুখের ধারা বর্ষন করিতেছে। তুমি আমি সকলেই কবি হইতে পারিনা কেন? জগতে কোটী কোটী লোক জন্মিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেবল চারি পাঁচটী মাত্র কবি কেন? অপর কেহই বা কবি হইতে পারেন নাই কেন? ইহার উত্তরে সকলকেই বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে কবি

চেষ্টা করিয়া হওয়া যায় না। যাঁহার প্রতি ভগবান সদয় হন, তাঁহারই হৃদয়ে "ইনিস্‌পিরেসন" (Inspiration) আইসে; আর বিনা "ইনিস্‌পিরেসনে" কেহই কবি হইতে পারেন না। "ইনিস্‌পিরেসন" কি? "ইনিস্‌পিরেসন" যে কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। ভিতর হইতে কি এক অজ্ঞেয় শক্তি যেন আমাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, আমাদের ইন্দ্রিয়গণের ক্ষমতা যেন বিস্তৃত করে, কণ্ঠে বসিয়া যেন মধুর বাক্য গুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেয়। এইরূপ ভাব যাঁহার হয়, তখন তিনিই কবি হয়েন, চেষ্টা করিয়া এই অজ্ঞেয় ক্ষমতা লাভ করিতে কেহই কখন সক্ষম হয়েন না। এই জন্যই এই ক্ষমতা বা শক্তিকে "ইনিস্‌পিরেসন" বলে।

যে ক্ষমতা অজ্ঞেয়, সেই ক্ষমতা ঈশ্বরের ক্ষমতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তাহাই "ইনিস্‌পিরেসন"কে সকলেই ভগবানের আবির্ভাব বলিয়া বিবেচনা করেন। "ইনিস্‌পিরেসনে" ভগবানের শক্তি মানব হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সেই মানবের কণ্ঠ হইতে এরূপ বাক্যাবলী প্রকাশ করে যে, সাধারণে বহু চেষ্টা করিলেও সেরূপ করিতে কখনও সক্ষম হন না। এই জন্যই কবিতাকে ঈশ্বর বাক্য বলা যায়, আর এই জন্যই প্রকৃত কবিতা অমর। জগতে কত মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত কবিতা অমরত্ব লাভ করিয়া সমতেজেই চিরকাল বিরাজমান রহিয়াছে। এই জন্যই কবিতা সত্য ও ঈশ্বর বাক্য।

জগতে কোটি কোটি কবিতা লিখিত হইয়াছে ও আজও হইতেছে, তাহাই বলিয়া কি সকল কবিতাই সত্য ও ঈশ্বরবাক্য? বলা বাহুল্য, যে ইহা কখনই সম্ভব নহে। ঠিক এই কারণেই

ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহার সকলই সত্য ও ঈশ্বর বাক্য, এ কথা কেহই বলিতে সাহস করেন না। যাহা সত্য তাহাই অমর। যাহা অমর, তাহাই ঈশ্বর বাক্য।

ঈশ্বর স্বাধীন ভাবে কখন আবির্ভূত হয়েন না, কিন্তু শক্তি রূপে মানব হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সেই মানবের কণ্ঠ হইতে ধর্ম্ম বাক্য সকল জগতে প্রচার করিয়া থাকেন। কবি ও কবিতার প্রতি লক্ষ করিলেই ইহার সত্যাসত্য বিষয়ে আমাদের আর কোনই সন্দেহ থাকে না। ঈশ্বর এইরূপই আবির্ভূত হয়েন, তিনি প্রাচীণকালেও এইরূপে হইতেন, এখনও হইতে-ছেন। তবে সর্ব্বত্র সমান ভাবে হয়েন না। কোথায়ও বা তাঁহার পূর্ণবিকাশ দেখা যায়, কোথায়ও বা আবার তাঁহার আংশিক বিকাশ মাত্র লক্ষিত হয়। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতিতে তাঁহার যেরূপ বিকাশ হইয়াছে, অন্যান্য মহাত্মাগণে তত বিকাশ হয় নাই। মহাত্মাগণ স্বয়ং কত বার বলিয়াছেন,—"যে শক্তির বলে আমি এই এই কথা তোমা-দিগকে বলিয়াছি, সে শক্তি আর এক্ষণে আমাতে নাই।" গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই একথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, সময় সময় ভগবানের শক্তি মানব হৃদয়ে আবির্ভূত হয়; কেন হয়, এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান সহজ নহে। যে কারণে গোলাপ আপন মনে ফুটে, ফল আপনি আপনি সুপক্ক হয়; যে কারণে ব্যাঘ্র হরিণ বিনাশ করে, সর্প মস্তক অবনত করিয়া চলে; সেই কারণেই কোন কোন মহাত্মার হৃদয় সিংহাসনে কোন কোন সময়ে ভগবানের

অজ্ঞেয় শক্তির ছায়া পতিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে হিত বাক্য সকল, সত্য বাক্য সকল, মানব জীবনের সুখের ও জ্ঞানের উপায় স্বরূপ বাক্যসকল নিঃসৃত হয়।

ঈশ্বরের এরূপ আবির্ভাব যখন যেখানে হয়, তখন তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নহে। যখন যিনি সহসা সাধারণ লোক অপেক্ষা অতি উন্নত ও অত্যুচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তখনই বুঝিতে হইবে যে তাঁহার হৃদয়ে ঐশ্বরিক শক্তির ছায়া পতিত হইয়াছে! তাঁহার বাক্য সকল সাধারণ লোকের নিকট অজ্ঞেয়, অত্যুচ্চ, অসীম, জ্ঞানময়, সুখময়, ও অনন্ত বলিয়া বোধ হইতে থাকে। কে কবি বুঝিতে যেমন আমাদের কাহারই ক্লেশ হয় না, তেমনই মহাত্মা কে তাহাও বুঝিতে আমাদের কোন ক্লেশ জন্মে না। যাঁহার হৃদয়ে ভগবানের শক্তির ছায়া পতিত হয়, তিনিই মহাত্মা; আর তিনি তৎকালে যাহা বলেন, তাহাই সত্য ও ঈশ্বরের বাক্য।

এই জন্যই বেদ সত্য ও ঈশ্বরবাক্য। বেদে যে মধুর, জ্ঞান ময়, ধর্ম্মময়, অজ্ঞেয়, অনন্ত কথা সকল আছে, তাহা এখনকার লোকের নিকট বিশেষ আশ্চর্য্যজনক না হইলেও, যে সময়ে বেদ মানব কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, সে সময়ে আর্য্য সমাজের সভ্যতা, শিক্ষা, ও জ্ঞানালোচনার আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে বেদের ন্যায় জ্ঞানপূর্ণ বাক্যাবলী রচনা করিবার ক্ষমতা তৎকালের সাধারণ লোকের কাহারই ছিল না। যাঁহার হৃদয়ে ঐশ্বরিক ছায়া পতিত হইয়াছে, কেবল তাঁহারই কণ্ঠ হইতে বেদ বাক্য সকল নিঃসৃত হইয়াছে। যিনি এক সময়ে বেদ রচনা করিয়াছেন, তিনিই

আবার অপর সময়ে বেদ রচনায় সক্ষম হয়েন নাই। গভীর অরণ্য মধ্যে অসভ্যতার অন্ধকারে আবরিত থাকিয়া বন্য-জাতি-বিনাসে-তৎপর, মেষপালক আর্য্যগণ যে বেদের ন্যায় বাক্য রচনার সম্পূর্ণই অনুপযুক্ত সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। অথচ সেই সময়ে সেই আর্য্যগণের কাহারও কাহারও কণ্ঠ হইতে বেদ বাক্য সকল নিস্থত হইয়াছে। যাঁহার হৃদয়ে ঐশ্বরিক ছায়া পতিত হইয়াছে, তিনিই কেবল বেদ প্রণয়নে সক্ষম হইয়াছেন। এই জন্যই বেদ ঈশ্বরবাক্য ও সত্য। কিন্তু বেদান্ত বা দর্শন তাহা নহে। কারণ বেদান্ত বা উপনিষৎ ও দর্শন গ্রন্থসকল চিন্তাশীল দার্শনিকগণ অসীম চিন্তা করিয়া নানা গবেষণার পর রচনা করিয়া ছিলেন। সহসা কোন অজ্ঞের শক্তি তাঁহাদিগের হৃদয়ে অবিভূর্ত হইয়া তাঁহাদিগের কণ্ঠ হইতে দর্শন নিস্থত করে নাই। এই জন্যই দর্শন ঈশ্বর বাক্য নহে, বেদ ঈশ্বর বাক্য।

বেদ চেষ্টা করিয়া কেহ রচনা করেন নাই। বেদ চিন্তা করিয়া গবেষণার পর রচিত হয় নাই। গভীর অন্ধকার রজনীতে যেমন মহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া সমস্ত জগত আলোকিত করিয়া ফেলে, ঠিক সেই রূপ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যবাসী আর্য্যসমাজে মধ্যে মধ্যে বেদ বাক্য সকল প্রকাশিত হইয়া সমস্ত মানব জাতির হৃদয়ে অব্যক্ত আলোক প্রদান করিত। স্বয়ং ভগবান পরমসৌভাগ্যবান আর্য্যমেষপালকগণের হৃদয়ে অধিষ্টিত হইয়া তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে মানবকে জ্ঞানালোক প্রদান করিয়াছেন; সেই আলোকের সহায়তায় মানব ক্রমে অসভ্যতার ও অজ্ঞতার গভীর অন্ধকার

হইতে বহির্গত হইয়া আজ জ্ঞানালোকে বিচরণ করিয়া সুখে ভাসমান হইতেছে।

এই সকল পবিত্র ঈশ্বর বাক্যের উপর হিন্দু ধর্ম্ম সংস্থাপিত, সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি যেরূপ সত্যমূলক ও সুদৃঢ়, তেমন আর কাহারই নহে। ঈশ্বর বাক্য অবলম্বন করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম গঠিত; বিজ্ঞান ও দর্শন সম্মত ঈশ্বরের স্বত্বার উপর হিন্দু ধর্ম্ম অধিষ্ঠিত, এরূপ ধর্ম্ম যে মহা প্রলয়েও সমভাবাপন্ন থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এরূপ ঐশ্বরিক বা অজ্ঞেয়শক্তি সম্পন্ন মহাত্মা যে কেবল ভারতবর্ষেই জন্মিয়াছেন, এরূপ ঈশ্বর বাক্য যে কেবল ভারতেই প্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ নহে। পৃথিবীর সর্ব্বাংশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহাদের কণ্ঠ হইতেও বহুতর ঈশ্বর বাক্য নিসৃত হইয়াছে। আজিও স্থানে স্থানে অনেক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিতেছেন; আজিও ভগবান তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া জগতে আলোক প্রদান করিতেছেন।

এই রূপেই বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও বহু ধর্ম্ম শাস্ত্রের সৃষ্টি হই-য়াছে। একটী সত্যের সহিত একশতটি মিথ্যা সংযোজিত হইয়াছে। আজিও কি আমরা প্রত্যহ সচক্ষে দেখিতেছি না যে যদি একটী সাধুকে আমরা কোন স্থানে দেখি, তবে তাঁহার আশে পাশে আরও শত শত ভণ্ড প্রতারককে দেখিতে পাই। ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলেরও ঠিক এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কালে কালে প্রতি ধর্ম্ম শাস্ত্রে এতই মিথ্যার সংজোযনা হইয়া গিয়াছে, যে কোনটি সত্য আর কোনটী যে মিথ্যা, তাহা এক্ষণে আর অবগত হইবার কোনই উপায় নাই।

যখন সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেরই এই অবস্থা, তখন আমরা কি কারণে হিন্দু ধর্ম্মকে পবিত্র ও সত্য বলিতেছি? প্রকৃত পক্ষে হিন্দু ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য আর কোন ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না। ধর্ম্ম কাহাকে বলে ও ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যই বা কি?

মানব মাত্রেই সুখের প্রয়াসী। মানব মাত্রেরই হৃদয়ে আত্মরক্ষার ইচ্ছা স্বভাবতঃই প্রবল। এই ইচ্ছা মানবকে কেহ কখনও শিখায় না; ইহা তাহার একটী প্রধান প্রকৃতি, এমনকি ইহাই মানবের মূল প্রকৃতি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রকৃতির উপরই মানবের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত। এই আত্ম রক্ষার ইচ্ছাই সুখের চেষ্টা এবং এই আত্ম রক্ষা করিতে পারিলেই মানব হৃদয়ে সুখের উপলব্ধি হয়। যাহা হউক, এই সকল গভীর দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিবার স্থান এই পুস্তকে নাই, তবে আমাদের সকলের জীবনেরই উদ্দেশ্য যে সুখ, সে বিষয়ে কোনই মতভেদ নাই। যিনি অরণ্যবাসী অনাহারী ঋষি, তিনিও সুখের প্রয়াসী; আর যিনি বিলাসসাগরে ভাসমান রাজকুমার, তিনিও সুখের প্রয়াসী; কিন্তু এ সংসারে সুখের বহুবিধ উপায় আছে; কোনটীর সুখ বা ক্ষণস্থায়ী, কোনটীর সুখ বা দীর্ঘকালস্থায়ী; কোনটীর সুখ বা আপাততঃ মনোরম, কোনটীর সুখ বা পরে জ্ঞাতব্য; এই রূপে সুখের বহু বিধ প্রকার থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত সুখ মানুষ অনুসন্ধান করিয়া পায় না। সকলেই সুখের জন্য ধাবমান, কিন্তু প্রকৃত সুখ সহজে মিলে না।

যাহা হউক, এক্ষণে ইহা এক রূপ সর্ব্ববাদি সম্মত মত যে

সূচনা।

ধর্ম্মাচরণই সুখের এক মাত্র প্রকৃত উপায়; কিন্তু ধর্ম্মাচরণ কাহাকে বলে, ধর্ম্মই বা কি? ধর্ম্মাচরণ করিলেই বা সুখ হইবে কিরূপে? ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাচরণের উল্লেখ করিলেন; কেহ বলিলেন, "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম"। কেহ বলিবেন, "পূজাদি পরম ধর্ম্ম। কেহ আবার বলিলেন, "তীর্থকর, ব্রতকর, যাগ যজ্ঞ কর, তাহা হইলেই ধর্ম্মাচরণ করা হইবে।" কেহ বলিলেন, "অরণ্যে গিয়া যোগে নিমগ্ন হও।" এইরূপে নানা জনে নানা ধর্ম্মাচরণের উল্লেখ করিলেন; সুখের জন্য মানব হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, যে যাহা বলে তাহারা তাহাই করিতে ধাবমান হয়।

কেবল কথায় বলিলে সুখের উপায় হইল না। ইহা কর বা উহা কর, বলিলে কি প্রকৃত সুখ লাভের উপায় হইল? কত জন অরণ্যে গিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, কতজন আবার সংসারে থাকিয়া ঘোর বিলাসী হইল, কিন্তু কে যে প্রকৃত সুখী তাহার স্থিরতা নাই।

ধর্ম্মাচরণই সুখের এক মাত্র উপায় স্বীকার করি, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ কি ও ধর্ম্মই বা কাহাকে বলে, তাহা স্থির করা নিতান্ত আবশ্যক। কতক গুলি বাক্য, সেই বাক্য গুলি সমস্ত ঈশ্বর বাক্য হইলেও তাহা ধর্ম্ম নহে। কারণ আমরা সকলেই জানি, কোন বিষয় কথায় বলা সহজ, কিন্তু কাজে করা সহজ নহে। স্বয়ং ভগবান যদি পঙ্গুকে বলেন, "রে পঙ্গু, তুমি পর্ব্বত লঙ্ঘন কর।" আর সেই পঙ্গুকে পর্ব্বত লঙ্ঘনের ক্ষমতা যদি তিনি প্রদান না করেন, তবে কোন মতেই সে পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। যে সকল ধর্ম্ম কেবল বাক্যময়, সেই সকল বাক্য সত্য হইলেও সে ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম নহে।

এবং ইহার জন্য দুইটী দৃষ্টান্ত প্রদানও প্রয়োজন। হিন্দুধর্ম্মেই কেবল এইরূপ দুইটী জলন্ত ধর্ম্মাচরণ ও সুখোপার্জ্জনের চিত্র অঙ্কিত আছে। অবোধ হউক, অজ্ঞ হউক, অথবা জ্ঞানী হউন, চিন্তাশীল হউন; সকলেই এই দুই দৃষ্টান্ত দেখিয়া অতি সহজেই সুখের পথে ও ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবেন। এমন সুন্দর উপায় আর কোন ধর্ম্মেই নাই? তাহাই অন্য গুলি ধর্ম্ম নহে, হিন্দুধর্ম্মই কেবল একমাত্র প্রকৃত ধর্ম্ম।

অথচ এই সৃষ্টি কেবল মানব বিশেষের কল্পনা প্রসূত নহে। যে দুই জনের জীবনি হিন্দুধর্ম্মে চিত্রিত হইয়াছে, ভগবান স্বয়ং অবতার হইয়া সেই দুই জীবনে লীলা করিয়াছিলেন, একথা আমরা বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না। যাঁহার বিশ্বাস হয়, করুন; যাঁহার বিশ্বাস না হয়, তিনি নাই করুন; কিন্ত ইহাতে কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তাহাই বলিয়া কবির কল্পনা ভাবিয়া ইহাদিগকে মিথ্যা বলিবার কোনই উপায় নাই। এ জগতে যাহা আপনাআপনি হয়, তাহাকেই ঈশ্বর-সৃষ্ট বলি। যে সরোবর আমরা খনন করি, তাহাকে আর হ্রদ বলে না। আমরা সহস্র প্রস্তর খণ্ড আনিয়া স্তুপাকার করিলেও কেহ তাহাকে পর্ব্বত বলে না। এ সংসারে যাহা একদিনে হয় না, যাহা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণতা লাভ করে, কে যেন ভিতরে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া যাহা গঠিত করেন, যাহা আপনাআপনি হয়, আমরা তাহাকেই ভগবানের হস্তপ্রসূত বলিয়া থাকি। আমরা যে দুইটী সুখের ও ধর্ম্মের জীবনের জলন্ত দৃষ্টান্ত হিন্দু ধর্ম্মে দেখিতে পাই, জলমগ্ন অর্ণব পোতের হতভাগ্য নাবিক

গণের নিকট দূরস্থ আলোক যেমন পথপ্রদর্শক, দুঃখ ক্লেশময় সংসারে এই দুইটি চিত্র আমাদেরও ঠিক তেমনই পথ-প্রদর্শক। সুখের চেষ্টা করিয়া ও ধর্ম্মাচরণে যত্নশীল হইয়া আমরা ক্রমে উভয় কার্য্যেই বিফল মনোরথ হইয়া ক্রমে হতাশ হইয়া পড়ি; তখন ভাবি, মহাত্মাগণ যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিতেই মিষ্ট, ভাবিতেই মহৎ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন মানুষই এরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম হন না। ঠিক এই সময়ে আমরা যদি আমাদের চক্ষের উপর এক ব্যক্তিকে সেই সকল কার্য্য করিতে দেখি, তবে কি আমরা নিজে নিজেই লজ্জিত হইব না? তবে কি আমরা সকলেই আবার সেই ব্যক্তির ন্যায় এই সকল কার্য্য করিতে প্রোৎসাহিত হইব না? এই জন্যই আমরা আবার বলি, হিন্দু ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম, কারণ হিন্দুধর্ম্মে চক্ষের উপর এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়, অন্য ধর্ম্মে তাহা নাই। মহম্মদ যে সকল জ্ঞানগর্ভ নীতিমালা বলিয়া গিয়াছেন, তিনি নিজ জীবনে সেরূপ কার্য্য করেন নাই। তিনি মানুষকে যাহা হইতে বলিয়াছেন ও যে রূপে ধর্ম্মাচরণ করিতে বলিয়াছেন, সমস্ত মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে সে রূপ একটী দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না! জিষু মানুষকে যেরূপ হইতে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সমস্ত খৃষ্টিয়াণ ধর্ম্ম শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে সে রূপ একটীও দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রকৃত পক্ষে সে রূপ কেহ কখন হইতে পারেন না। মহাত্মাগণ মানুষকে যেরূপ হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, মানুষের পক্ষে ঠিক সেরূপ হওয়া অসম্ভব। উপদেশ প্রদান করিতে হইলে অধিক

করিয়াই দিতে হয়। অধিক উপদেশ প্রদান করিলে মানব সেই উপদেশের সকল গুলির অনুযায়ী কার্য্য করিতে সক্ষম না হইলেও, সকল গুলি করিতে চেষ্টা করিয়া অন্ততঃ কতক-গুলিতেও সফল হয়। মানবজাতির কিরূপ হওয়া উচিত, ইহার যদি একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করিতে হয়, তবে সে চিত্রও অতিরঞ্জিত হওয়া কর্ত্তব্য। অতিরঞ্জিত চিত্র অনুকরণ করি-লেই তবে কতকটা সেই চিত্রের সমান হইবার আশা থাকে। এই জন্য জগতে যে সকল মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন পবিত্রতাময় হইলেও দৃষ্টান্ত রূপে মনুষ্য জাতির সম্মুখে প্রতিষ্টিত হইবার উপযুক্ত নহে। যদি মানবের সম্মুখে কোন পবিত্রতাময়, সুখময় ও ধর্ম্ম-ময় জীবন দৃষ্টান্ত স্বরূপে স্থাপিত করিতে হয়, তবে সেই জীবনি প্রথমতঃ অতিসুন্দর হওয়া প্রয়োজন; দ্বিতীয়তঃ, তাহা এতই প্রীতিপ্রদ হওয়া উচিত যে দেখিলেই তাহার দিকে মন আকৃষ্ট হয়। মানুষ কল্পনা বলে সুখের, ধর্ম্মের ও পবিত্রতার যে পরম ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, সেই চিত্রে তাহাই বা তাহা অপেক্ষাও অধিক থাকা আবশ্যক। তাহাতে কল্পনারও শেষ থাকা প্রয়োজন; নতুবা মানবমন সেরূপ দৃষ্টান্তে কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। এই জন্য এ সংসারে এ পর্য্যন্ত যত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারই জীবন মানুষের সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবার উপযুক্ত নহে। কারণ একটি মানবজীবনে সম্পূর্ণতা সংঘটন কোন মতেই সম্ভব নহে। এই জন্য একটী সত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম্মের আবশ্বক; মনুষ্যজাতিকে মনুষ্য জীবনে সুখী হইবার উপায় প্রদর্শনের

জন্য ভগবানের তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন প্রয়োজন। এ কার্য্য কোন নশ্বর মানব জীবনের সাহায্যে প্রদর্শন সম্ভবপর নহে, তাহাই ভগবানের অবতার অবশ্যম্ভাবি। যেমন আমাদের তৃষ্ণার জন্য তিনি জল সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি তিনি আমাদের প্রাণের তৃষ্টার জন্য এইরূপ অবতার রূপি জল নিশ্চয়ই হইয়াছেন। এরূপ অবতার হিন্দুধর্ম্মে ব্যতিত আর কোন ধর্ম্মেই নাই। তাহাই হিন্দুধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম।

কেন হিন্দুধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম, তাহা আমরা আরও পরিষ্কার করিয়া দেখাইব। হিন্দু ধর্ম্মে ধর্ম্মের, সুখের ও পবিত্র-তার দুইটী চিত্র অঙ্কিত আছে। একটী কৈলাসের চিত্র, অপরটি বৃন্দাবনের চিত্র। একটীতে হরগৌরী চিত্র, অপরটীতে রাধাকৃষ্ণের চিত্র। এই দুইটী চিত্র যে কত সুন্দর, এই দুইটীই যে মানব জীবনের সুখোপার্জ্জন ও ধর্ম্মাচরণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তাহা আমরা এই পুস্তকের শেষাংশে আলোচিত করিয়াছি। এক্ষণে এই দুইটী মানব জীবনের প্রকৃত দৃষ্টান্ত স্বরূপ চিত্র কিরূপে গঠিত হইয়াছে তাহাই দেখাইব।

এই দুইটী চিত্র কবির কল্পনা নহে। এক জন কবি নিজের মনে এই চিত্র কল্পনা করিয়া জগতে যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহা কেহ মনে করিবেন না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ইহা মানব সৃষ্ট কল্পিত মিথ্যা বিষয় হইত। এই দুই চিত্র এক দিনে জগতে সম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হয় নাই। আজ আমরা আমাদের সম্মুখে যে হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের চিত্র দেখিতেছি, তাহা এক দিনের সৃষ্টি নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ইহাকে আমরা অনিত্য মানবকল্পিত বিষয় বলিতাম;

কিন্তু তাহা নহে, স্বয়ং ভগবান যেরূপ ভাবে এ জগত সৃষ্টি করিয়াছেন, যে রূপ ভাবে বহুকালে পর্ব্বতকে উন্নত করিয়াছেন, সমুদ্রকে নীল জলে পূর্ণ করিয়াছেন; যেরূপ ভাবে তিনি অদৃশ্য থাকিয়া বীজ হইতে সুন্দর বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে অধিকতর সুন্দর ফল ফুল সৃষ্টি করিতেছেন; সেইরূপে তিনি বহুকালে ধীরে ধীরে নানারূপে জগতে এই দুইটী চিত্র অঙ্কিত করিয়া মানব জাতির সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। হরগৌরির চিত্র কেহ ভাবিয়া চিন্তিয়া গঠিত করেন নাই; কেমন করিয়া কোথা হইতে কিরূপে এই চিত্র অঙ্কিত হইল, তাহাও কেহ বুঝিতে পারেন না। অন্ধকারের মধ্য হইতে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে যেমন নানাবিধ সুন্দর সুন্দর দৃশ্য সৃষ্ট হইয়া দৃষ্টি গোচর হয়, ঠিক সেইরূপ ধর্ম্ম-বিপ্লব মধ্য হইতে এই চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। অদৃশ্য থাকিয়া তিনি অন্ধকার হইতে জগত সৃষ্টি করেন, অদৃশ্য থাকিয়া অন্ধকার হইতেই তিনি এই চিত্রদ্বয় সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পুস্তকস্থ পুরাণের বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করিলেই পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, এই দুইটী চিত্র কাহারও অঙ্কিত নহে, কেহ ইচ্ছা করিয়া এই দুই চিত্র অঙ্কিত করিবার সহায়তাও করেন নাই। ইহা কেমন আপনাআপনিই হইয়াছে। আপনা আপনিই হইয়া ক্রমে দিনে দিনে ইহা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে, হইতেছে ও ভবিষ্যতে আরও হইবে।

যাহা মানব সৃষ্ট নহে এ সংসারে তাহাই যদি ভগবানের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে এই দুইটী চিত্র ভগবানের সৃষ্টি। তাহা যদি হয়, তবে হিন্দু-ধর্ম্ম প্রকৃতই ভগবানের সৃষ্ট ধর্ম্ম। যদি এ সংসারে ধর্ম্ম বলিয়া কিছু থাকে, তবে সে হিন্দুধর্ম্ম; আর যদি

কোন ধর্ম্ম আপনাআপনি জন্মিয়া থাকে, তবে সেও হিন্দুধর্ম্ম। যাহা অপনাআপনি সৃষ্ট হয়, তাহাই ভগবান সৃষ্টি করেন; এই জন্যই হিন্দু-ধর্ম্ম ভগবানের সৃষ্ট ধর্ম্ম, তাহাই হিন্দুধর্ম্ম সনাতন, পবিত্র, অনন্ত, অসীম, সত্য ও সুখের এক মাত্র উপায়।

এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম বহুতর সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকিলেও হিন্দুর প্রধান দেবতা শিব ও দুর্গা এবং রাধা ও কৃষ্ণ। হিন্দুর প্রধান উৎসব, এই দেবতাগণের জীবনির দুই চারিটি প্রধান ঘটনা। হিন্দু ইহাঁদের জীবনের অনুকরণ করিতেই ব্যগ্র, হিন্দু ইহাঁদের পূজা করিয়াই জীবনাতিবাহিত করেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ভারতের সর্ব্ব প্রদেশে সকলেরই সম্মুখে কৈলাস ও বৃন্দাবনের মনোহর দৃশ্য। আমরা প্রতিমা গড়িয়া পূজা করি বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা কি পৌত্তলিক? নেপোলিয়ানের মত হইবার ইচ্ছা করিয়া সেই ইচ্ছাকে হৃদয়ে বলবতী করিবার জন্য নিজ গৃহে তাঁহার ছবি রাখিলে কি তাহা পৌত্তলিকতা হয়? ইহা যদি না হয়, তবে হরগৌরীর বা রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিয়া তাঁহাদের মত হইবার ইচ্ছাকে উদ্দিপিত করিলে, তাহা পৌত্তলিকতা নামে অভিহিত হইবে কেন?

প্রাচীনতম আর্য্য মেষপালকগণের কণ্ঠে বেদ ধ্বনিত হইয়াছিল। পরে আর্য্যগণ সভ্য হইয়া গঙ্গা ও যমুনার তীরে উপনিবেশ সংস্থাপন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। বেদের বাক্য সকল লইয়া চিন্তাশীল ঋষিগণ চিন্তা করিয়া গভীর গবেষণা পূর্ণ ও ঈশ্বরের

গভীর ভাব পূর্ণ, পূর্ণ-ব্রহ্মের বিষয় আলোচনা করিয়া বহুশত উপনিষদ রচনা করিলেন। ক্রমে ভারতে জ্ঞানের বিস্তৃতি হইল; এই সময়ে ভারতে এক এক করিয়া কয়েকখানি দর্শনও রচিত হইল। বেদের সময় ঋষিগণ ঈশ্বরকে কেবল মাত্র অজ্ঞেয় বলিয়া তাঁহার স্তব স্তুতি করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু চিন্তাশীল উপনিষদকারগণ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ভগবান কিরূপ, তাহারই আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন; পরে দার্শনিকগণ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া,-কেবল মাত্র ঈশ্বরের ভাব পর্য্যালোচনায় সন্তুষ্ট না হইয়া,—ধর্ম্মাচরণ কি, সুখের উপায় কি, ঈশ্বর কি, প্রভৃতি গুঢ় বিষয় সকলের আলোচনা করিলেন। ভগবান স্বয়ং আর্য্য মেশ-পালকগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া যে সত্য ধর্ম্মের বীজ জগতে প্রোথিত করিয়াছিলেন,ভারতে ধীরে ধীরে সেই বীজ হইতেই সুন্দর বৃক্ষ সমুত্থিত হইতেছিল। উপনিষদ, দর্শন, পরে দর্শনাপেক্ষাও কঠোর দার্শনিক ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম, সকলই সেই বীজ হইতে অঙ্কুরিত শাখা প্রশাখা। কিন্তু তখনও ইহা সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই, তখনও সে বৃক্ষ ফলোৎপাদনের উপযোগী হয় নাই। মানব জাতিকে সুখের পথ ও ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিবার জন্য ভগবান আর্য্য-মেষ-পালকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া যে ধর্ম্মের বীজ রোপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বৃক্ষ জন্মিয়া যে ফল উৎপাদিত হইবে তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম ও তাহাই সুখের একমাত্র উপায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দৃষ্টান্তই ইহার একমাত্র উপায়; দৃষ্টান্তই একমাত্র প্রকৃত ধর্ম্ম। উপদেশ বা নীতিবাক্য ধর্ম্ম নহে; সুখময় ও ধর্ম্মময় জীবনই প্রকৃত ধর্ম্ম। যে বীজ ভগবান স্বয়ং

প্রোথিত করিয়াছিলেন, সেই বীজ হইতে যে বৃক্ষ জন্মিবে স্বভাবতঃই মনে হয় যে নিশ্চয়ই সেই বৃক্ষের ফলই এইরূপ দৃষ্টান্তময় জীবন। প্রকৃতই তাহাই হইয়াছে। সেই বেদ-ধর্ম্ম ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া তাহাতে দুইটী সুখময় ও ধর্ম্মময় জীবনের জলন্ত দৃষ্টান্ত অঙ্কিত হইয়াছে। উপনিষদ, দর্শন, ও বৌদ্ধধর্ম্ম ইহাকে জ্ঞানের ভিত্তিতে সংস্থাপন করিয়াছিল, পরে পুরাণ আসিয়া ইহাকে আকার প্রদান করিল, তৎপরে তন্ত্র, তৎপরে পাশ্চাত্য জ্ঞান, ভারতে আসিয়া ইহাকে আরও অধিকতর পরিস্ফুট করিয়াছে। কিরূপে জগতে এই দুইটী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কিরূপে ভগবান ভাবরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে মনুষ্যের ন্যায় কার্য্যকলাপ লীলা খেলা করিয়া মানুষকে ধর্ম্মের পথ ও সুখের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রদর্শন এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা এই পুস্তকে বেদ, উপনিষদ, দর্শন, অষ্টাদশ পুরাণ এবং তন্ত্রের বিস্তৃত সমা-লোচনা করিয়াছি। এই সমালোচনা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে করিয়াছি। হয়তো আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা অনে-কের নিকট অহিন্দুর বাক্য বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। অনেকে যে ভাবে হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, ঠিক সে ভাবে হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বাস না করিলেও হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বাসের কোন ক্ষতি হয় না। আমরা যেরূপে এই সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের সমালোচনা করিয়াছি তাহাই প্রকৃত; আমরা যাহা বলিয়াছি, প্রকৃত পক্ষে তাহাই সত্য,—কিন্তু ঘটনা বিশেষের সত্যাসত্য

অথবা কোন বিষয় বিশেষের বিশ্বাস অবিশ্বাসে কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কারণ হরগৌরি ও রাধাকৃষ্ণই হিন্দুধর্ম্মের জীবন। তাহা যে ভাবেই গঠিত হউক, তাহা সম্পূর্ণ সুখ ও ধর্ম্মের আবাসস্থল। তাহাপেক্ষা সুখও ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত জগতে মনুষ্যজীবনে আর হইতে পারে না, মনুষ্য কল্পনায়ও ইহাপেক্ষা সুখ ও ধর্ম্ম চিত্র আর আইসে না, সুতরাং এই দুই চিত্রই প্রকৃত ধর্ম্ম। আর আমরা পুরাণের বিস্তৃত সমালোচনায় ইহাও দেখাইয়াছি যে, এই দুই চিত্র মনুষ্যের অঙ্কিত নহে; বহুকালে নানা ঘটনা উপলক্ষে ইহারা আপনা-আপনি সৃষ্ট হইয়াছে, কাজে-কাজেই ইহারা ভগবানের সৃষ্ট বিষয়। কাজেই ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের সৃষ্ট ধর্ম্ম। ইহাই সত্য ও অনন্ত ধর্ম্ম।

আমরা এই পুস্তকের প্রথম অংশে হিন্দু গৌরবস্থল বেদ, উপনিষদ এবং দর্শনের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া ইহাদের কোনটীতে কি আছে দেখাইয়াছি। পরে দ্বিতীয়াংশে পুরাণ হইতে তন্ত্র ও আধুনিক ধর্ম্মবিপ্লবের আলোচনা করিয়া হরগৌরি ও রাধাকৃষ্ণ চিত্র কিরূপে ক্রমে গঠিত হইয়াছে, তাহাই দেখাই-য়াছি। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের তৎকালের অবস্থারও সমালোচনা করিয়াছি। তৎপরে এই দুই পবিত্র চিত্রের বা অবতারের বিষদ ও বিস্তৃত আলোচনাও করিয়াছি। আশা, যিনি আজও অহিন্দু আছেন,—তিনি এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া আর একদিনও হিন্দুর গৌরবান্বিত পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবেন না।

বৈদিক হইতে বৌদ্ধ কাল

শাস্ত্রমহিমা।

(প্রথমাংশ)

বেদ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বেদই হিন্দুর মূল শাস্ত্র,—বেদই হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি, এক্ষণে আমরা যে হিন্দুধর্ম্ম দেখিতে পাই ও যে হিন্দু ধর্ম্মের গৌরবে গৌরবান্বিত হই, সেই হিন্দু ধর্ম্মের মুল-মন্ত্র বেদ। বেদের পর শত সহস্র ধর্ম্ম শাস্ত্র ভারতে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ সুন্দর ও বৃহৎ বৃক্ষের মূল ও কাণ্ড বেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদ পবিত্র, বেদ সত্য, বেদ নিত্য, বেদ ব্রহ্মবাক্য, হিন্দুমাত্রেরই এই বিশ্বাস; যিনি এরূপ বিশ্বাস করেন না, বা যাঁহার এরূপ বিশ্বাস নাই, তিনি হিন্দু নহেন, তাঁহাকে হিন্দু বলাও যায় না। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম প্রকৃত কি ও হিন্দু শাস্ত্রই বা কি ও এই সকল অগনিত হিন্দুশাস্ত্রের উদ্দেশ্যই বা কি, ইহারা কিসের জন্যই বা জগতে শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয়, এ সকল দেখিতে হইলে প্রথমেই এই পবিত্র, নিত্য, সত্য বেদের আলোচনা আবশ্যক।

বেদই আমাদের ধর্ম্মের মূল শাস্ত্র, কিন্তু দুঃখের বিষয় বেদ পাঠ করা দূরে থাকুক, বেদের আকার কিরূপ অবগত হওয়া দূরে থাকুক, সহস্রের মধ্যে বোধ হয় আমাদের একজনও বেদ যে কি ব্যাপার, তাহা অবগত নহি।

এমন যে সুন্দর, এমন যে সত্য, এমন যে নিত্য,—এ বেদ কি? ধর্ম্মের কথা, জ্ঞানের কথা, প্রাণের কথা, ভাবের কথা, এ সংসারে অনেক প্রচারিত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বহুতর সাধু মহাত্মা ও কবি জন্ম গ্রহণ করিয়া অনেক অতুলনীয় জ্ঞানের কথা, প্রাণের কথা, ভাবের কথা প্রচার করিয়া মানব জাতিকে সুখের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন ও এখনও যাইতেছেন, কিন্তু জগতের সমস্ত জাতির ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেও আমরা বেদের ন্যায় এত প্রাচীন বাক্য আর দেখিতে পাই না। যখন সমস্ত পৃথিবীস্থ মানব মণ্ডলীগণ গভীরতম অন্ধকারে বিরাজ করিতে ছিলেন, যখন গভীরতম অরণ্য মধ্যে মনুষ্য জাতি বন্য পশুর ন্যায় বসবাস করিতেছিলেন, যে সময়ে জগতে জ্ঞানালোক অতি অস্পষ্টভাবে গোধূলির ন্যায় শোভা বিস্তার করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, সেই সময়ে সেই অতি প্রাচীন কালে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত-স্থিত পঞ্চনদ প্রদেশে আর্য্য মেষ পালকগণের মধ্যস্থ কাহারও কাহারও কণ্ঠ হইতে বেদ বাক্য সকল ধ্বনিত হইয়াছিল।

বেদ কতকগুলি হৃদয়ের ও প্রাণের আবেগময় গান ব্যতিত আর কিছুই নহে। এই সকল গানে আর্য্যগণ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি লয় স্বরূপ কারণ পরমব্রহ্মের ভাব হৃদয়ে উপলব্ধ করিয়া তাঁহার মন নিরদবরণ মেঘমালা, তাঁহার গভীরতম বজ্রধ্বনি,

তাঁহার চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র মণ্ডলি, তাঁহার সুনীল বিস্তৃত অনন্ত আকাশ,—তাঁহার দীপ্তিময় অগ্নি,—এই সকল দেখিয়া তাঁহাকে ভাবে বিভোর হইয়া এই সকলকে প্রাণের সহিতও হৃদয়ের সহিত আহ্বান করিয়া তাঁহাদের স্তব স্তুতি করিতেছেন, কখনও বা তাঁহাদের তুষ্টির জন্য তাঁহাদিগকে মিষ্ট কথা বলিতেছেন। কখন বা তাঁহারা তাঁহাদের পূজা করিতেন, কখনও বা তাঁহাদিগকে ভগবানের বিকাশ মনে করিয়া তাঁহাদের নিকট ধন ধান্য ও শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতেন; কখনও বা হৃদয়ের পাপের জন্য দুঃখ ও যন্ত্রনায় কাতরে তাঁহাদিগকে ডাকিতেন। কেহ কেহ বা একেবারে ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য ও প্রকৃতি সুন্দরীর কমনীয় কায়া দেখিয়া ভগবানের ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার স্তব করিতেন।

বেদ এইরূপ সুন্দর ভাবপূর্ণ সঙ্গীত। ভাবের বিকাশ ভিন্ন বেদে আর কিছুই নাই; মানবজাতি জগতে প্রথম চৈতন্য লাভ করিয়া জগত স্রষ্টার যেরূপ ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, বেদ সঙ্গীতে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। আর কোন জাতির ধর্ম্ম পুস্তকে এরূপ অতি প্রাচীন ও মানব জাতির প্রথম ধর্ম্ম-ভাবের প্রথম অঙ্কুর একেবারেই নাই; বেদই কেবল ইহার একমাত্র দৃষ্টান্ত, বেদেই প্রথমে মানবজাতির ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল।

বেদ চারি খানি। ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব্ব। ইহার মধ্যে ঋক সর্ব্ব প্রাচীন; ঋকের পরে সাম প্রচারিত হয়, সামের পর যজু, এবং এই তিন বেদ হইতে কতকগুলি সংগ্রহ সমষ্টি করিয়াই অথর্ব্ব র'চত হয়। কোন সময়ে এই সকল বেদ রচিত

যা গীত হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। আধুনিক ইয়োরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গণ (উইলসন, মুলার, গল্ডষ্টুকার, মাকস্‌মুলার) প্রভৃতি বহু অনুসন্ধানেও বেদের কাল নিশ্চয় রূপে স্থিরিকৃত করিতে পারেন নাই। তবে অনুমান চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই সকল সুন্দর ভাব পূর্ণ গীত পঞ্চনদের উপকূলে আর্য্যগণের কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইয়াছিল। খৃষ্টের জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ও বুদ্ধদেবের জন্মের অন্ততঃ দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সকল বেদসঙ্গীত ধ্বনিত হয়। সে আজিকার কথা নয়,—যে সময়ে এই পৃথিবীস্থ ভিন্ন ভিন্ন জাতির মনুষ্যগণ অরণ্য মধ্যে পশুবৎ বসবাস করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে বা তাহারও পূর্ব্বে এই সুন্দর, সুললিত, অপূর্ব্ব ভাবময়, জগতের কারণ স্বরূপ ভগবানের ভাব পূর্ণ, বেদগান জগতে ধ্বনিত হয়। চারি দিকে যখন অন্ধকার, যখন জগতের লোক ভগবানের উচ্চতম ভাব একেবারেই উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, যখন তাহাদের কোনই শিক্ষা নাই, জ্ঞান নাই, ভাব নাই, যখন তাহারা বনে বনে ফলাহার করিয়া, বন্যপশু শিকার করিয়া ও অতি সামান্য ভাবে কৃষি কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিল, তখন কিরূপে কোন শক্তির বলে, কোন জ্ঞানালোকের সহায়তায়, এই সকল সুন্দর, পবিত্র, নিত্য, সত্যময় গান সেই সকল আর্য্যগণের কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল? কেবল ইহাই নহে,—সকল আর্য্যের কণ্ঠে বেদ ধ্বনিত হয় নাই, শত সহস্রের মধ্যে হয়তো একজনের কণ্ঠে এইরূপ সুন্দর ভাবময় গান উচ্চারিত হইয়াছে। আর কেহ তাহা পারেন নাই, যাঁহারা বেদ গান রচনা করিয়া ছিলেন, বা যাঁহাদের কণ্ঠ হইতে বেদগান

ধ্বনিত হইয়াছিল, তাঁহাদের অনেকের নাম অনেক গানে আছে, এই সকল নামের মধ্যে দুই একটী রমণীর নামও দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ রচয়িতাগণের নাম থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন এই সকল বেদবাক্যকে সত্য, নিত্য ও ঈশ্বর বাক্য বলিতেছি? ঈশ্বর বাক্য কি ও কোন গুলি তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়াস আমরা ভূমিকায় করিয়াছি। সহসা যাঁহার হৃদয়ে একরূপ অব্যক্ত শক্তি আসিয়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে তাঁহার সাধ্যাতিত বাক্য সকল উচ্চারিত করে, তখন তাঁহাকে সাধু ও মাহাত্মা বলে। তিনি যাহা বলেন, বা তাঁহার কণ্ঠ হইতে যাহা উচ্চারিত হয়, তাহাকেই ঈশ্বর বাক্য কহে। বেদ গান এইরূপ ঈশ্বর বাক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা অন্য আর কিছুই হইতে পারে না। সে সময়ে আর্য্যগণের যেরূপ সামাজিক অবস্থা ছিল, সে সময়ে তাঁহাদের যে রূপ শিক্ষা ছিল, আচার ব্যবহার ছিল, তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে ঐশ্বরিক শক্তি প্রবিষ্ট না হইলে কোনমতেই ঋগবেদের ন্যায় গান সকল আর্য্যের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইতে পারিত না; এই জন্য বেদ সত্য, এই জন্য বেদ নিত্য, এই জন্যই বেদ ঈশ্বর বাক্য।

তাই বলিয়া সকল বেদের সকল কথা একরূপ নহে। সাম, যজু ও অথর্ব্ব বেদে অনেক পরবর্ত্তী গান আছে; সেই সকল গান স্পষ্টই পরবর্ত্তী লোকের রচিত, এবং যেমন প্রকৃত কবিতা ও বাজে কবিতা দেখিলেই কোনটী কি বুঝিতে পারা যায়, কোনটী প্রকৃত বেদ বাক্য ও কোনটী প্রকৃত বেদ বাক্য নহে, তাহাও দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

বলা বাহুল্য, এই সকল বেদ বাক্য প্রথমে লোকের বক্ষে কণ্ঠে ছিল, প্রাচীন সমাজে আর্য্যগণ মনের আবেগে, জ্যোৎস্না দেখিলে, অন্ধকার দেখিলে, ঝড় বৃষ্টি দেখিলে, গ্রহণ ও ভূমিকম্প দেখিলে, ঈশ্বরের ভাবে বিভোর হইয়া এই সকল বেদ বাক্য ও বেদ গান গাইয়া হৃদয়ের আবেগ মিটাইতেন। তখন আর অন্য কিছুই ছিল না, তখন যাগ যজ্ঞ হইত না, তখন জাতিভেদ ছিল না, আর্য্যগণ মেষ চরাইতেন, চাস করিতেন, কাপড় বুনিতেন, সুখে গৃহ ধর্ম্ম করিতেন। রমণীগণ গৃহে, গৃহে, আদৃত ও যত্নে পালিতা হইত; যে গৃহে রমণী কর্ত্রী, সে গৃহে সর্ব্বদা সুখ সচ্ছন্দতা বিরাজ করিত, বড়ই সুখে আর্য্যগণ পঞ্চনদের তীরে নির্ব্বিবাদে ভগবানের গান, প্রেমের গান, ভাবের গান, প্রাণের গান, গাইয়া হৃদয়ের আবেগ মিটাইতে ছিলেন।

বেদ এই সকল গানে পূর্ণ। এই সকল ভাবের গান ব্যতিত বেদে আর অন্য কিছুই নাই। যখন সমস্ত জগত অন্ধকারে নিমগ্ন, যখন সংসারে জ্ঞানালোক একেবারেই প্রকাশিত হয় নাই, সেই সময়ে আর্য্য মেষপালকগণের কণ্ঠে ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মালোক ও জ্ঞানালোক মানব জাতিকে দেখাইবার জন্য এই সকল বেদগান প্রচারিত করিয়াছিলেন। এমন সুন্দর, এমন মনোহর, এমন সরল ভাবময় ও প্রাণের আবেগময় গান এ সংসারে আর নাই।

ঋগ্‌বেদ।

যতগুলি বেদ আছে তাহার মধ্যে ঋগ্‌বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই বেদই সর্ব্ব প্রথম, তৎপরে এই বেদের গান লইয়া

সাম ও যজু রচিত হয় ; পরে এই তিন খানি বেদ একত্র করিয়া অথর্ব্ব বেদ ইহারই সংগ্রহ ও সার একত্রিত করিয়া প্রচারিত হয়।

ঋগ্ বেদে কিরূপ সুন্দর সুন্দর ঈশ্বরভাবপূর্ণ গান আছে, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি।

ঐশ্বরিকভাবে বিভোর হইয়া আর্য্য একটী গানে বলিতেছেন,—

"তুষার মণ্ডিত পর্ব্বত মালা যাঁহার ক্ষমতা প্রচার করে,—সুনীল সমুদ্র দূরবর্ত্তী স্রোতস্বতীগণের সহিত যাঁহার মহিমা প্রকাশ করে, এই বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার দুই বাহুর স্বরূপ,—তিনি ব্যতিত আমরা আর কাহার পূজা করিব ?"

"যাঁহার মহিমায় আকাশ উজ্জ্বল, পৃথিবী সুদৃঢ়, যাঁহার কৃপায় স্বর্গ সৃষ্ট হইয়াছে, যিনি বাতাসে আলোককে অবস্থাপিত করিয়াছেন, — তিনি ব্যতিত আমরা আর কাহার পূজা করিব ?"

"যাঁহার দিকে স্বর্গ মর্ত্ত সভয়ে সর্ব্বদা চাহিতেছে, যাঁহার উপর সূর্য্য উজ্জ্বলতা বিকীর্ণ করিতেছে,—তিনি ব্যতিত আমরা আর কাহার পূজা করিব ?"

"যেখানে গভীরতম মেঘমালা বিচরণ করে,—যেখানে বীজ অবস্থাপিত হইয়াছে ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, যিনি দেবতাগণের জীবের জীবন, তিনি সেই খান হইতে উত্থিত হইয়াছেন।—ইনি ব্যতিত আমরা আর কাহার পূজা করিব ?"

ইহাপেক্ষা ঐশ্বরিক ভাব আর অধিকতর সুন্দর কি হইতে পারে ? আর একটী গানে আর একজন বলিতেছেন,—

"প্রজাপতি,—তুমিই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের একমাত্র কর্ত্তা। যাহা কামনা করিয়া তোমাকে আমরা আহ্বান করিয়াছি, তাহা যেন আমরা পাই।"

আর একটী গানে আর একজন কি সুন্দর হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করিতেছেন ;—

"আমাকে এখনই মৃত্তিকা-গৃহে প্রবিষ্ট হইতে দিবেন না, হে সর্ব্বশক্তিমান, আমার প্রতি দয়া করুন, দয়া করুন।"

"যদি আমি কম্পিত কলেবরে যাই, হে সর্ব্বশক্তিমান, আমার প্রতি দয়া করুন, দয়া করুন।"

"নিজ দুর্ব্বলতার জন্য আমি বিপথে গিয়াছি, হে সর্ব্বশক্তি-মান, আমার প্রতি দয়া করুন, দয়া করুন।"

"হে প্রভু,—আমার নিজ দুর্ব্বলতায় আমি বিপথগামী হইয়াছিলাম ; হে সর্ব্বশক্তিমান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার প্রতি দয়া করুন।"

"জলের মধ্যে অবস্থান করিলেও ভক্তের তৃষ্ণা যায় না, হে সর্ব্ব শক্তিমান, আমার প্রতি দয়া করুন,—আমার প্রতি দয়া করুন।"

"হে সর্ব্ব শক্তিমান, যখন আমরা কোন অপরাধ করি, যখন আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ আপনার নিয়ম লঙ্ঘন করি,—তখন আমাদের প্রতি দয়া করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন।"

আর একটী গানে ভক্ত ভক্তেশ্বরকে সম্ভাষণ করিয়া প্রাণের আবেগে বলিতেছেন,—

"আমি তোমায় বুঝিলাম না।

আমার কর্ণ তোমাকে শুনিতে চায় ;

আমার চক্ষু তোমাকে দেখিতে চায়;

প্রাণের ভিতর যে আগুণ আছে, তাহা তোমাকে বুঝিতে চায়।

আমি তোমাকে কি বলিব?

আমি তোমাকে কিরূপে বুঝিব?"

বেদ গানে আর্য্যগণ ভগবান ও অনন্তের ভাব কি সুন্দর উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা আর একটী গানে দেখুন।

"তখন কিছুই ছিল না। না আকাশ না বাতাস। তবে কিসে সকল আবরিত ছিল? তখন কোথায় কি ধারণ করিত? সে কি জল, সে কি গভীতম গভীরতা?"

"তখন মৃত্যু ছিল না, অমরত্বও ছিল না। তখন দিনও ছিল না, রাতও ছিল না। তখন কেবল "একই" একের উপর বিরাজ করিতেন। তাহা হইতে আর কিছুই সতন্ত্র ছিল না।"

"প্রথমে অন্ধকারে অন্ধকার মিশ্রিত হইয়া ছিল। এই সমস্তই অব্যক্ত জল; "কিছুনায়" আবরিত হইয়া মহাধ্যানে "এক" বিরাজ করিতেছিলেন।"

"এই অব্যক্ত, অনন্ত, অজ্ঞেয় "একে" ইচ্ছা শক্তির উদয় হইল। এই শক্তিই অনন্তের সহিত অন্তের সম্মিলন ঘটায়।"

"কে বলিতে পারে কাহা হইতে ও কোথা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। দেবতাগণ সৃষ্ট, তবে কে বলিতে ইহার মূল কে ও তিনি কোথায়!"

"কি হইতে এই জগত সৃষ্টি হইল ও কেহ এই জগত সৃষ্টি করিয়াছেন কিনা, তাহা কেবল তিনিই জানেন, অথবা তিনিও জানেন না।"

ইহা হইতে ভগবানের ভাব আর উচ্চতর কি হইতে পারে? মানুষের কর্ম্মে, মানুষের আত্মজ্ঞানে, এ ভাব তাহার হৃদয়ে আইসে না, তাহাই বলি ভগবান,—দয়াময়ী মা,—মানবজাতিকে আত্মজ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিবার জন্য, আর্য্য মেষপালকের কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া এই সকল জ্ঞানের কথা, ভাবের কথা ও প্রাণের কথা প্রচারিত করিয়াছেন! এ সকল যদি সত্য না হয়, তবে সত্য এ সংসারে আর কি আছে? এইরূপ আরও বহুতর ঋগ্বেদের গানে আর্য্য মেষপালকগণ ভগবানের ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

কেবল ইহাই করিয়া তাঁহারা নিরস্ত হন নাই, তাঁহারা জগতে তিনটী অলৌকিক দ্রব্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই তিনটীকে জগতের মূল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এই তিনটীর নাম,—অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ। এই তিনটীকেও তাঁহারা দেবতা পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহুতর নামে পূজা, স্তব ও স্তুতি করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্যকে সাবিত্রী, বিষ্ণু প্রভৃতি বহু নামে ডাকা হইয়াছে, আকাশকেও ইন্দ্র প্রভৃতি নাম প্রদান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রকৃতির আরও বহুতর সুন্দর বিকাশকেও তাঁহারা দেবতাপদ প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে ঊষা (প্রাতঃকাল) মারুত (বাতাস) প্রভৃতি অনেক দেবতার স্তব ও গান ঋগবেদে আছে।

কেবল ইহাই নহে,—সর্ব্বদাই প্রকৃতিতে যে সকল ঘটনা ঘটে, কখনও বা মেঘাড়ম্বর করিয়া ঝটিকা হয়, কখনও বা অজস্র মুষলধারে বৃষ্টি হইতে থাকে, কখন বা সুন্দর কৌমুদী আলোকে প্রকৃতি সুন্দরী হাসিতে থাকেন, কখন বা গভীরতম অন্ধকারে জগত আবরিত হইয়া যায়,—ঋকবেদের কবিগণ এই

সকল দেখিয়া প্রকৃতির এই সকল বিকাশে জীবন ও আকার প্রদান করিয়া সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এরূপ সুন্দর কবিতাও আর জগতে রচিত হয় নাই। মন্দে মন্দে মলয় পবন বহিতেছে, কবি বলিলেন,—"মারুত দেব প্রণয়ার্থে প্রণয়িনীর নিকট যাইতেছেন।" আকাশে ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, কবি বলিলেন,—"ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সহিত মহাযুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছেন।" দুঃখের বিষয় পরে এই সকল সুন্দর সুন্দর কবিতার ভাব লোকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া এই সকল কবিতার ভিন্ন ভিন্ন বহুতর অর্থ করিয়াছেন।

আর্য্য মহাত্মাগণ ভগবানকে বুঝিয়াও প্রকাশ করিতে না পারিয়া বলিলেন, "হে প্রভু, তুমিই সব, তোমাকে বুঝা যায় না।" তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "জগতের মূলে "এক" আছেন,—সেই "এক" হইতেই সব। কিন্তু সেই অনন্ত অসীম অজ্ঞেয় "এক"কে বুঝা যায় না, দেখা যায় না, জগতই তাঁহার বিকাশ।" মানুষের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা প্রকৃতি সুন্দরী নানা ভাবে মনুষ্যকে দেন, তাহাই তাঁহারা মানুষের জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মূল বিষয় অগ্নি, জল, সূর্য্য, বায়ু, প্রভৃতির গান, স্তব, ও পূজা করিতেন। এই জগত, এই প্রকৃতিই, ভগবানের বিকাশ ;—জলের জন্য জলরূপী, অগ্নির জন্য অগ্নিরূপী, বায়ুর জন্য বায়ুরূপী, ব্যোমের জন্য আকাশরূপী, ভগবানকে ডাকিলেই এই সকল পাওয়া যায় ভাবিয়া তাঁহারা এই সকল দেবতার স্তব করিতেন। ইহাপেক্ষা সুন্দর, সরল ও সত্যধর্ম্ম মানবজাতির পক্ষে আর কি হইতে পারে?

হিন্দুজাতির এই মূল ধর্ম্ম। বেদ এই ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। বৈদিক কালের প্রারম্ভে হিন্দুগণ পূজা, যাগযজ্ঞ না করিয়া ঋকের সুন্দর সুন্দর গানে ভগবানকে নানা ভাবে স্তব করিতেন। বিশ্বামিত্র, অগস্ত, বশিষ্ঠ, বামদেব, অত্রির প্রভৃতি আর্য্যগণ এই সকল গান রচনা করেন। একজনের কণ্ঠ হইতে এইরূপ গান উচ্চারিত হইত, শত শত জনে এই গান গাইয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন। ভক্তিভাবে সরল চিত্তে প্রাণের সহিত ডাকিয়া তাঁহারা ভগবানের নিকট যাহা চাহিতেন, তাহাই পাইতেন। সে সময়ে সংসারে এত পাপের প্রাদুর্ভাব হয় নাই, তাহাই তাঁহারা নিজ নিজ পাপের জন্য প্রায়ই কাঁদিতেন না, তাঁহারা তাঁহাদের কৃষির জন্য জল, ধন, ধান্য, শান্তি,—শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা প্রভৃতি চাহিতেন, আর তাঁহারা যাহা চাহিতেন তাহাই পাইতেন।

অন্যান্য বেদ।

এই সময়ে দিন দিন আর্য্যদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল, সমস্ত পঞ্চনদ (পাঞ্জাব) প্রদেশ তাঁহাদের বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহারা ক্রমে বিস্তৃত হইয়া গঙ্গা যমুনার তীরেও উপনিবেশ স্থাপন আরম্ভ করিয়াছিলেন; ভারতের উর্ব্বরা ক্ষেত্রে মেষ চারণ ও কৃষি কাজ করিয়া তাঁহাদের ধন ও সুখ শান্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইয়াছিল। এক্ষণে আর তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতেন না, এক সঙ্গে অনেকে বাস করায় অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গ্রামের সৃষ্টি হইয়াছিল। অনেকে ধনী হইয়াছিলেন, অনেকে দরিদ্রও ছিলেন। ক্রমে অর্থ বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছাও সকলের হৃদয়ে প্রবল হইয়াছিল, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তাঁহারা কৃষি

কার্য্যের উন্নতি করিতেছিলেন, এই জন্য জগতের আদিম অধিবাসীগণের সহিত তাঁহাদের প্রায়ই যুদ্ধ করিতে হইতেছিল। বিদেশীয়গণ আসিয়া তাহাদের জঙ্গল পুড়াইয়া দিতেছে, তাহাদের বাসভূমি দখল করিয়া তাহাতে চাস বাস করিতেছে দেখিয়া আদিম অধিবাসীগণ সময় সময় তাহাদিগকে অক্রমন করিত, তাহাই আর্য্যগণকে প্রায়ই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। এই সকল আদিম অধিবাসীগণের উল্লেখ বেদে দেখিতে পাওয়া যায় ; দস্যু, দানব, রাক্ষস প্রভৃতি নামে তাহারা অভিহিত হইয়াছে।

ধন বৃদ্ধি হওয়ায় আমোদ প্রমোদ উৎসবাদি করিবার ইচ্ছা স্বভাবতই আর্য্যগণের হইয়াছে। তাঁহারা আর কেবল মাত্র বেদ গান করিয়া সন্তুষ্ট হন না, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি উৎসব আরম্ভ করিয়াছেন, নানারূপ যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। এই সকল যজ্ঞে প্রাণীবধ হয়, সোমরস নামক সুরাপান যথেষ্ট পরিমানে হইয়া থাকে। আর্য্যগণ পূর্ব্ব হইতেই মাংসাহারী ও সুরাপেয়ী ছিলেম, এক্ষণে এই মাংসাহার ও সুরাপান তাঁহারা ধর্ম্ম কার্য্যের একটী অংশ করিলেন, যজ্ঞে অশ্ব গো প্রভৃতি বলি দিয়া সেই মাংস ও সোমরস পান করিয়া তাহারা মহানন্দে সকলে মহোৎসব করিতেন।

কৃষিকার্য্য উত্তমরূপ চলায় ধন বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যবসা বানিজ্যেরও উন্নতি হইল। আর্য্য গ্রাম সকলে অনেকে অনেকরূপ কাজ কর্ম্ম আরম্ভ করিল, ভাল ভাল বস্ত্র বয়ন, উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল প্রস্তুত, নানাবিধ সাংসারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ হইল। সমাজের এরূপ অবস্থায় সকলে সকল

কাজ করিতে পারে না। যাহাদের যথেষ্ট পরিমান ধন বৃদ্ধি হইল তাঁহারা সর্ব্বদাই সেই ধন রক্ষার জন্ত ব্যস্ত, দস্যুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ধন ধান্ত রক্ষা করা তাঁহাদেরই স্বার্থ, তাহাই তাঁহারা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাহারই আলোচনায় সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিতেন, অথচ আমোদ প্রমোদ উৎসব যাগ যজ্ঞ করিতে তাঁহাদেরই ইচ্ছা হয় ও সামর্থ আছে, কিন্তু সে সকল করিতে যাহা যাহা শিক্ষা প্রয়োজন, তাহা শিখিবার সময় ও অবসর তাঁহাদের হয় না, তাহাই যাঁহারা সর্ব্বদা এই সকল লইয়া থাকিতেন, এই সকলের আলোচনা করিতেন ও গান গাইতে চেষ্টা পাইতেন; সেই সকল লোককে অর্থ দিয়া এই সকল যাগ যজ্ঞ করিতে লাগিলেন।

আর এক শ্রেণীর লোক কেবলই ব্যবসা বানিজ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন; তাঁহারা যুদ্ধ জানিতেন না, ধর্ম্ম কার্য্য যাগ যজ্ঞ করিতেও জানিতেন না, সুতরাং তাঁহাদের কাজ ব্যবসা বানিজ্যই হইয়া দাঁড়াইল।

এই তিন শ্রেণী ব্যতিত আর্য্য সমাজে আর এক জাতির লোকের সমাগম ঘটিল। আর্য্যগণ আদিম অধিবাসীগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের অনেককে বন্দি করিয়া রাখিতেন, তাহারা তাঁহাদের ক্রীতদাসের ন্যায় থাকিয়া তাঁহাদের সেবা করিত। ইহারা সমাজে অতি ঘৃণিত হইয়া দাসরূপে বাস করিত।

বৈদিক কালের দ্বিতীয়াংশে অর্য্যগণের সামাজিক অবস্থা ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। ঠিক এই সময়েই সামবেদ রচিত

হয়। যখন যাগ যজ্ঞের বড়ই সমারোহ, সে সময়ে যাগ যজ্ঞের নিয়ম প্রণালী ও মন্ত্র স্তবসহ গ্রন্থ না হইলে চলে না। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সামবেদ রচিত হয়। তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন ক্রীয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত হইলে যজুর্ব্বেদ প্রচারিত হয়। পরে আরও পরবর্ত্তী সময়ে ঋক, সাম ও যজু এই তিন খানি লইয়া অথর্ব্ববেদ রচিত হয়।

বলা বাহুল্য এই বেদত্রয় ঋকবেদের অনুকরণ ব্যতিত আর কিছুই নহে। যখন দেশে যাগ যজ্ঞের বড়ই আদর হইল, এক শ্রেণীর লোক যাগ যজ্ঞ করিয়াই সুখে সচ্ছন্দে অর্থ উপার্জ্জন ও সম্মান লাভ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা এই সকল যাগ যজ্ঞের উন্নতি কল্পে এই সকল পরবর্ত্তী বেদ রচনা ও সঙ্কলিত করিলেন। যাহাতে যাগ যজ্ঞ করিবার ভার তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত থাকে ও অপর কেহ এই সকল কার্য্য করিতে না পারেন, সেই উদ্দেশে তাঁহারা নানাবিধ বেদ রচনা করিলেন। এইরূপে সাম; যজু ও অথর্ব্বের সৃষ্টি হইল। এই সকল কারণে আমরা বেদের সকল গানকে সত্য ও নিত্য এবং ঈশ্বর বাক্য বলি না; যেমন সমস্ত কবিতা কবিতা নহে, সেইরূপ সমস্ত বেদবাক্যও সত্য নহে। যাহা প্রকৃত বেদবাক্য তাহাই সত্য ও ঈশ্বর বাক্য, যাহা পরবর্ত্তী সময়ে নানা লোকে স্বইচ্ছায় কল্পনা করিয়া রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সত্য বা ঈশ্বরবাক্য নহে। এই জন্য ঋগ্‌বেদ যত সুন্দর, যত সত্য, যত নিত্য ও ঈশ্বর বাক্যময়, তত অন্য বেদত্রয় নহে। তবে তিন খানি বেদই এইরূপ গানে পূর্ণ; অন্যান্য বেদে ঋগবেদের গানই অধিক পরিমানে সন্নিবেশিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে, নূতন নূতন

গানও আছে। ঋগবেদে যাহা আছে, অন্যান্য বেদেও ঠিক সেই রূপই গানই আছে বলিয়া আমরা আর অন্যান্য বেদ হইতে গান উদ্ধৃত করিলাম না।

ব্রাহ্মণ।

সমস্ত বেদের সহিত ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থ সংযুক্ত আছে। যখন যাগ যজ্ঞ আর্য্য-সমাজে বড়ই প্রচলিত হইয়াছিল, যখন এক শ্রেণীর লোক এই সকল যাগ যজ্ঞ অপরের নিকট অর্থ লাভ করিয়া তাঁহাদের হইয়া সমাধা করিয়া বেশ সুখে সচ্ছন্দে বিনা পরিশ্রমে কালযাপন করিতেছিলেন,—সেই সময়ে তাঁহারাই এই সকল যাগ যজ্ঞের নিয়ম প্রণালী কিরূপ ও কোন যজ্ঞ কিরূপে সমাধা করিতে হইবে, এই সকল বিষয় বিশেষ বিষদ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহাতে তাঁহারা ব্যতিত আর কেহ যাগ যজ্ঞ সমাধা করিতে না পারে, যাহাতে এ কার্য্য তাঁহাদেরই এক চেটিয়া থাকে, এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা এই যাগ যজ্ঞের নিয়মাবলী ও সমাধান প্রণালী যাহাতে খুব কঠিন হয় ইহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এই জন্য তাঁহাদের মধ্যে চিন্তার পরিচালনা ও জ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে এই সকল "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থও প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। যাঁহারা রচনা করিতে লাগিলেন, এবং যাঁহারা যাগ যজ্ঞ করিতেন, তাঁহারা একটা শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িলেন, এই সময় হইতেই তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণগণের অর্থের ভাবনা ছিল না। তাঁহারা ধনীগণের যাগ যজ্ঞ করিয়া বহু অর্থ পাইতেন, এই অর্থে তাঁহারা সকলেই সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতেন, তাঁহাদের কোন ভাবনা ছিল না. কেবলই বিদ্যালোচনা ও জ্ঞান চর্চ্চায় সময়াতিবাহিত করিতেন; যাহাতে তাঁহাদের মধ্যেই পুরুষানুক্রমে যাগ যজ্ঞ পূজাদি করিবার ভার থাকে, এই জন্য তাহারা নিজ নিজ পুত্রকে এই সকল কার্য্যে শিক্ষিত করিতেন। ইহাতে ক্রমে অনেক বিদ্যালয়ের স্থাপনা হইয়াছিল। গুরুর নিকট শিশু আসিয়া ১২ বৎসর বিদ্যাশিক্ষা করিতেন, তৎপরে গুরুদক্ষিণা দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণের কার্য্য করিয়া দিনপাত করিতে থাকিতেন।

ইহাঁরা যাগ যজ্ঞ সমাধা প্রণালী যে কেবল কঠিন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, এরূপ নহে।—এই সকল কার্য্যের অনেক গুপ্ত উদ্দেশ্যও প্রদান করিয়াছিলেন; যাগ যজ্ঞের যে কোনই অর্থ ছিল না, এরূপ নহে। যাহাতে এই সকল কার্য্যে মানসিক উন্নতি হয়, প্রকৃত ধর্ম্ম উপার্জ্জন হয়, যাহাতে মানব জীবনে পবিত্রতা জন্মে, এইরূপ কার্য্য ও কৌশল ব্রাহ্মণগণ বহুতর উদ্ভাভন করিয়াছিলেন। এই সকল লইয়াই ব্রাহ্মণ গ্রন্থ।

আতারিয়া ব্রাহ্মণ।

এই ব্রাহ্মণ খানি ঋগ্‌বেদের অন্তর্ভূত, ঋগ্‌বেদের প্রথম কালে যাগ যজ্ঞ কিছুই হইত না, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যাগ যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল; সেই সময়ে ঋগবেদের ঋক উচ্চারণ করিয়া দুই চারিটী যজ্ঞ ও ক্রীয়া কলাপ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ব্রাহ্মণগণ

সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঋগ্ বেদের অন্তর্ভুক্ত এই আতারিয়া ব্রাহ্মণ রচনা করেন।

এই গ্রন্থে সোম-যজ্ঞের বর্ণনাই বিস্তৃত রূপে লিখিত হইয়াছে। কিরূপে এই যজ্ঞ করিতে হয়, এই যজ্ঞ করিতে হইলে কিরূপ স্থান প্রয়োজন ও কিরূপ ভাবে যজ্ঞ বেদি নির্ম্মাণ আবশ্যক, এই যজ্ঞের জন্য কি কি দ্রব্য চাই, কোন প্রণালীতে কোন স্তব উচ্চারিত করিয়া এই যজ্ঞের সমাধান করিতে হয়, এই সকল বিষয়ের আলোচনাতেই এই পুস্তক পূর্ণ। এই যজ্ঞ সমাধা করিতে হইলে যে সকল কার্য্য আবশ্যক, তাহা এত জটিল যে সহজে বুঝিবার উপায় নাই। আজ কাল এমনই হইয়াছে যে এই সকল যজ্ঞ কি রূপে করিতে হয়, তাহা ব্রাহ্মণগণ একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন, কদাচিত কোথাও কেহ এই রূপ যজ্ঞ করিতে সক্ষম।

আজ কাল এ দেশে যাগ যজ্ঞ একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে। বৈদিক কালের যাগ যজ্ঞ এ দেশে আর নাই ; কি জটিল ও গুপ্ত কার্য্য সকল যজ্ঞ সময়ে হইত, তাহা অবগত হইয়া সাধারণ লোকের বিশেষ কোন উপকার নাই। তবে যাঁহারা এ সকল অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বা তাহার অনুবাদ পাঠ করিলেই যজ্ঞ প্রণালী বিশিষ্ঠ রূপে অবগত হইতে পারেন। তবে সাধারণতঃ, একটী বিস্তৃত প্রাঙ্গনে যজ্ঞ স্থান নির্দ্ধারিত হয়, এই স্থান নির্ম্মাণের এত জটিলতা আছে যে কেবল এই যজ্ঞ স্থান গঠিত করিবার জন্যই ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালে জ্যামিতির আবিষ্কার হয়। এই রূপ যজ্ঞে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণের আবশ্যক হইত, এক জন

ব্রাহ্মণ বেদ গান করিতেন, অপরে কেহ হোম করিতেন, কেহ বা বলি প্রদান করিতেন। যজ্ঞে ফল মূল প্রভৃতি বহু বিধ আহারিয় দ্রব্য প্রদত্ত হইত, এতদ্ব্যতীত বহু বিধ প্রাণী যজ্ঞে বলি প্রদান করা হইত, এইরূপে গোমেদ, অশ্বমেদ ও নরমেদ প্রভৃতি যজ্ঞও ক্রমে দেশে প্রচলিত হইয়াছিল।

আতেরিয়া ব্রাহ্মণে সোমযজ্ঞই প্রধান, এতদ্ব্যতীত রাজসূয় যজ্ঞের বিবরণও বর্ণিত হইয়াছে; উপসংহার ভাগে রাজার রাজ্যাভিসেক কালে যে রূপ যাগ যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন, তাহারই বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এক্ষণে এ দেশে ইহার কোন যজ্ঞই নাই, সুতরাং এ সকল যজ্ঞের বিশেষ বিবরণ আমরা আর করিব না।

তবে যজ্ঞ কালে তিনটী বিষয়ই সর্ব্ব প্রধান,—প্রথমে অগ্নি, হোমের জন্য,—দ্বিতীয় বলি (গো, অশ্ব প্রভৃতি) এবং সোমলতা (সুরা), তৃতীয় বেদগান। বেদের বিশেষ বিশেষ গান যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ সময়ে সুরলয়ে গীত হইত। এই সকল গানে সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র (আকাশ), উষা, মারুত প্রভৃতি দেবগণের স্তব ও পূজা করা হইত, এতদ্ব্যতীত যজ্ঞে সেই অজ্ঞেয় অনন্ত ব্রহ্মেরও গান গাওয়া হইত। রাজাগণ ও ধনীগণই কেবল এই সকল যজ্ঞ করিতে সক্ষম হইতেন, কারণ ক্রমে ব্রাহ্মণগণ এ সকল যজ্ঞ এত জটিল ও এত কঠিণ করিয়াছিলেন যে এই সকল যজ্ঞ করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন হইত। ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মণগণ অর্থ লোভে এরূপ করিয়া ছিলেন,—না প্রকৃত পক্ষে যজ্ঞকে এত জটিল করিয়া তাঁহারা মানব আত্মার কল্যানের আশা করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না।

ব্রাহ্মণগণ রাজাদিগের জন্য ও ধনী দিগের জন্য যজ্ঞ করিতেন; যাঁহারা যুদ্ধ ব্যবসায়ী হইয়া ছিলেন, তাঁহারা এই সময়ে ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইতেন, আর যাঁহারা ব্যবসা বানিজ্য করিতেন, তাঁহারা বৈশ্য নামে পরিচিত হইতেন, এতদ্ব্যতীত আদিম অধিবাসী বন্দি ক্রীত দাসগণ শুদ্র নাম লাভ করিয়াছিলেন। এই রূপে বৈদিক কালের শেষাংশে চারিটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আর্য্য সমাজে গঠিত হইয়াছিল, তবে প্রকৃতপক্ষে তখনও তাঁহারা চারিটী জাতিতে পরিনত হয়েন নাই। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সহিত আহারাদি ও বিবাহও হইত, কেবল শুদ্রগণই হেয় ও ঘৃনিত হইয়া থাকিত। জনক ক্ষত্রিয় রাজা হইয়াও ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

যজ্ঞ মাহাত্ম প্রকাশ করিবার জন্য ব্রাহ্মন গ্রন্থে সুন্দর সুন্দর গল্পের উল্লেখ আছে। আতিরিয় ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্র ও সুনাসেপের আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়া যজ্ঞ মহাত্ম প্রকাশ করা হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। পুস্তকের আকার নিতান্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে বলিয়া আমরা এই সকল গল্পের বিবরণ এ পুস্তকে প্রদান করিতে পারিলাম না।

শতপাঠ ব্রাহ্মণ।

এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থ খানি যজুর্ব্বেদ সংযুক্ত, ইহাতেও বহু বিধ যজ্ঞের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল যজ্ঞে সোমরসই প্রধান উপকরণ, এতদ্ব্যতীত দশপূর্ণমাস নামক কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যজ্ঞ বা ব্রতের উল্লেখও এই পুস্তকে আছে। এই সকল ব্যতীত এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থে অনেক তত্বকথা আছে।

জগত সৃষ্টি হইবার আলোচনাও ইহাতে করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণও শাস্ত্রজ্ঞ বেদগানে জগতপাতার যে অজ্ঞেয় ভাব দেখিতে পাইতেছিলেন, তাহা হৃদয়ে সহজে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জ্ঞানের সাহায্যে জগত পাতার উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইতে-ছিলেন। জগত কিরূপে সৃষ্টি হইল, ইহার সৃষ্টি কর্ত্তাইবা কে, তাঁহার স্বরূপই বা কিরূপ, ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে নিজ নিজ গ্রন্থে যজ্ঞ কাণ্ড সকলের বর্ণনা কালে এ সকলেরও কখনও কখনও আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয়,এই সময়ে জ্ঞানালোচনা আরম্ভ হওয়ায় দেশে তর্ক ও সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল। শতপাঠ ব্রাহ্মণে এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণই সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছে। জগত কিরূপে সৃষ্টি হইয়াছে শতপাঠ প্রণেতা তাহা নিশ্চিত বলিতে পারেন নাই। জগতপাতা সম্বন্ধেও সন্দেহপূর্ণ বাদানুবাদ এই গ্রন্থে হইয়াছে। অনেক স্থলে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কিছুই মিমাংশা হয় নাই।

তবে এই গ্রন্থে এক মহাপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। ইঁহার নাম যাজ্ঞবল্ক। প্রায় চারি সহস্র বৎসর অতিত হইয়া গিয়াছে, তবুও এখনও ভারতের প্রতি স্থানে ঋষি যাজ্ঞবল্কের নাম ধ্বনিত হইতেছে। বোধ হয় তৎকালে তাঁহার ন্যায় মহাপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আর কেহই ছিলেন না। যাজ্ঞবল্ক ভগবান সম্বন্ধে অতি উচ্চতম ভাব সকল প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন,—

"অদৃশ্য হইয়াও তিনি দেখেন; কেহই তাঁহাকে শুনিতে না পাইলেও তিনি শুনিতে পান। তিনি স্বয়ং অজ্ঞেয় হইয়াও তিনি

সকল জানিতে পারেন। তিনি ব্যতিত আর কেহ দেখিতে পায় না, তিনি ব্যতিত আর কেহ শুনিতে পায় না,—তিনি ব্যতিত আর কেহ কিছু জানে না। তিনিই তোমার আত্মা, আত্মাই জগতের রাজা, আত্মাই অমর। তাহা হইতে বিভিন্ন যাহা কিছু সকলই নশ্বর।"

এই ব্রাহ্মণে আমরা আমাদের চির পরিচিত আর এক ব্যক্তির নাম দেখিতে পাই। ইনি জনক রাজা। আমরা সকলই জানি, জনক ক্ষত্রিয় রাজা হইয়াও মহোর্ষী ছিলেন। মহাশাস্ত্রজ্ঞ জনকের নিকট বেদ ও সর্ব্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণও সময় সময় তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিবার জন্য আসিতেন। এমন কি এক সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য পর্য্যন্ত জনক রাজার নিকট যজ্ঞ প্রনালী ও শাস্ত্র শিক্ষা করিতে আসিশাছিলেন।

উপনিষদ।

ব্রাহ্মণগণ বেদের উপসংহার স্বরূপ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ লিখিয়াই নিরস্থ রহিলেন না। বেদ সঙ্গীত গুলি লইয়া যাগ যজ্ঞ ক্রীয়া কলাপ সকল কি প্রণালীতে করা প্রয়োজন তাহাই ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্ত কেবল যাগ যজ্ঞ ক্রীয়া কলাপ লিখিয়াই ব্রাহ্মণ ঋষি গণ নিশ্চিত বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। বেদগানে তাঁহারা ভগবানের নাম ও ভাব গীত হইয়াছে দেখিতে পান, অথচ উহা এত অস্পষ্ট ও এত গভীর যে সহজে উপলব্ধি হয় না।

বেদে যে ভাব অব্যক্তরূপে ছিল, পণ্ডিতগণ সেই ভাবের পূর্ণ বিকাশ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। তাঁহারা গভীর

গবেষণায় একেবারে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। এই সকল চিন্তা তাঁহাদের এত ভাল লাগিল যে গ্রামের কোলাহলে ও লোকালয়ের জনরবে এই সকল গভীর বিষয়ের চিন্তার অসুবিধা হয় বলিয়া তাঁহারা ক্রমে গভীর অরণ্যে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। অরণ্যে বাস করিয়া তাঁহারা জগতের এই সকল গুরুতরতত্ত্বের আলোচনায় একেবারে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। অনেকে গৃহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইলেন, অনেকে একেবারে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে এমনই হইল যে পণ্ডিতগণের অধিকাংশই অরণ্যবাসী ফলমূলাহারী ঋষি, সুতরাং বিদ্যাভ্যাস করিতে হইলে তাঁহাদের নিকট যাওয়া ব্যতিত আর অন্য উপায় রহিল না। যাঁহারা বিদ্যার্থী, তাঁহারাও এই সকল অরণ্যস্থ আশ্রমে গিয়া গুরুর নিকট বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। অরণ্যবাসী ঋষিগণ তাঁহাদিকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এই সকল শিক্ষা দিবার জন্য ও এই সকল বিষয়ের চর্চ্চা, আলোচনা ও গবেষণার জন্য জগতের গুঢ়তত্ত্ব সকলের বিশেষ উন্নতি হইল। এই সময়ে এই সকল ঋষিগণ এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া অনেক গ্রন্থ রচনা করিলেন, এই সকল গ্রন্থ "আরণ্যক" ও "উপনিষদ" নামে অভিহিত হয়। অরণ্য হইতে এই সকল গ্রন্থ রচিত বলিয়াই ইঁহাদের নাম সম্ভবমত "আরণ্যক" হইয়াছে, উপনিষদের অর্থ কেহ কেহ বলেন, "গুপ্ত বিষয়;" কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ এখনও স্থিরিকৃত হয় নাই।

যেমন বেদের উপসংহার স্বরূপ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, তেমনই ব্রাহ্মণ গ্রন্থের উপসংহার স্বরূপ এই সকল আরণ্যক ও উপনিষদ গ্রন্থ

এই সকল আরণ্যকে আত্মা, পরমাত্মা, জগতের সৃষ্টি, মূল ও তত্ত্ব, ভগবানের স্বরূপ প্রভৃতিরই আলোচনা করা হইয়াছে।

আতিরিয় ব্রাহ্মণের উপসংহার স্বরূপ এক খানি আতিরিয় আরণ্যক গ্রন্থ আছে; ইহাতে আত্মা কি, জগত সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে আত্মার স্বরূপ কিরূপ ছিল, এইরূপ প্রশ্নের উত্তর এই আরণ্যক গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। সতপাঠ ব্রাহ্মণেরও এক খানি "বৃহৎ" নামক আরণ্যক গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থে গূঢ় বিষয় সম্বন্ধীয় যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তাঁহার স্ত্রীর যে কথোপ-কথন লিখিত হইয়াছে, তেমন সুন্দর আধ্যাত্মিক আলোচনা আর অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। যাজ্ঞবল্ক তাঁহার স্ত্রীকে বলিতেছেন;—

"মৈত্রি, আমি গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে যাইতেছি, আমি তোমার সহিত ও আমার অপর স্ত্রী কাত্যায়নীর সহিত একটী বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করি।"

"মৈত্রি বলিলেন, "নাথ, যদি সমস্ত ঐশ্বর্য্য সহ জগত আমার হয়, তাহা হইলে আমার কি অমরত্ব লাভ হইবে?"

যাজ্ঞবল্ক বলিলেন, "না, মৈত্রি, ধনীর জীবনের ন্যায় তোমার জীবন হইবে, কিন্তু ধন হইতে অমরত্ব লাভের আশা করা যায় না।"

"তখন মৈত্রি বলিলেন, "যাহা হইতে আমার অমরত্ব লাভ হইল না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? নাথ, অমরত্ব কাহাকে বলে আমাকে বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক বলিলেন, "প্রিয়তমে, তুমি প্রকৃতই প্রিয়কথা বলি-য়াছ। বসো,—আমি তোমাকে এই বিষয় বুঝাইয়া বলি। স্ত্রী

স্বামীকে ভালবাসে, ইহার কারণ,—স্বামীতে যে পরমাত্মা আছে তাহাকেই সে ভালবাসে, তাহাই স্বামীকে স্ত্রী ভালবাসে। স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে,—পরমাত্মা স্ত্রীতে আছেন বলিয়াই স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসেন। পরমাত্মা সন্তানে আছেন বলিয়াই সন্তানকে পিতা মাতা ভালবাসেন। যখন আমরা ধন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এই পৃথিবী, এই জগতকে ভালবাসি, তখন সেই পরমাত্মাকেই ভাল বাসি। প্রিয়তমে, এই পরমাত্মাকে দেখিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে ও ধ্যান করিতে হইবে। মৈত্রি, যদি আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই, শুনিতে পাই, জানিতে পাই, তবে সমস্ত জগতই আমরাই জানিতে পারিব।"

তৎপরে যাজ্ঞবল্ক বহু দৃষ্টান্ত দিয়া স্ত্রীকে পরমাত্মা বুঝাইয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক বলিলেন,—

"সমুদ্রে এক ডেলা লবণ ফেলিয়া দিলে সেই লবণ সমুদ্রের জলে মিশিয়া যায়, আর সেই লবণকে তুলিয়া লইতে পারা যায় না। সমস্ত জল লবণাক্ত হয়, কিন্তু লবণ অদৃশ্য হইয়া যায়। যখন আমরা অন্তর্হিত হই, তখন আর আমাদের কোন নাম থাকে না।"

কিন্তু ইহাতেও মৈত্রী সন্তুষ্ট হইলেন না, বলিলেন, "নাথ, আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

তখন যাজ্ঞবল্ক বলিলেন, "প্রিয়তমে, আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, তাহাই পরম জ্ঞান। যদি দুই জন থাকেন, তবে একজন একজনকে দেখেন, শুনেন ও উপলব্ধি করেন। কিন্তু যদি একই পরমাত্মা থাকেন, তবে তিনি কাহাকে দেখিবেন, কাহাকে শুনিবেন ও কাহাকে বুঝিবেন? প্রিয়তমে, ইহাকেই অমরত্ব বলে।

বেদে যে ভাব অস্পষ্ট ভাবে ধ্বনিত হইয়া ছিল, আরণ্যকে তাহাই অধিকতর পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতেও ঋষিগণ সন্তুষ্ট হইলেন না। যত জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, যত দেশে জ্ঞানালোক চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, ততই লোকে এই সকল গুঢ়তত্ত্বের আলোচনা করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। আরণ্যকে যাহা হয় নাই, উপনিষদে তাহারই চেষ্টা আরও অধিকতর হইল। কত উপনিষদ যে রচিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না; বিশেষতঃ উপনিষদের একটী বিশেষত্ব এই যে উপনিষদ রচয়িতাগণ কোনমতে স্ব স্ব নাম প্রচার করেন নাই। তাঁহারা এই সময়ে গভীরতম অরণ্যে বাস করিতে ছিলেন, সংসার একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন, আত্ম জ্ঞান একেবারে নষ্ট করিয়া ছিলেন, তাহাই তাঁহারা নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই। আমরা নিম্নে কয়েক খানি মাত্র উপনিষদের আলোচনা করিব।

প্রশ্ন উপনিষদ্।

একখানি সুন্দর উপনিষদ, এই উপনিষদে ছয় জন শিষ্য ঋষি পিপলপদকে নানা বিধ তত্ত্বের প্রশ্ন করিতেছেন; আর শিষ্যদিগের সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন। শিষ্যদিগের যে সন্দেহ জন্মিতেছে, তিনি সেই সন্দেহ দূর করিয়া দিতেছেন।

প্রথম শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কোথা হইতে এই জগত সৃষ্টি হইল?" পিপলপদ উত্তর করিলেন, "প্রজাপতি হইতে।" আর এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে

আমরা জন্মিলাম, কি রূপে আমাদের শরীরে প্রাণ আসিল?" ঋষি উত্তর করিলেন, "পরমাত্মা হইতে এই জীবন জন্মিয়াছে।" আর একজন প্রশ্ন করিলেন, "অমরত্ব কি?" তাহার উত্তরে ঋষি বলিলেন, "যে মূল শক্তি, জ্ঞান ও জীবনের পঞ্চ প্রকার ক্ষমতা অবগত হইয়াছে, সে অমরত্ব ভোগ উপলব্ধি করিতেছে। যে ইহাই জানিয়াছে, সেই অমরত্ব পাইয়াছে।"

এই উপনিষদে গভীরতম বিষয় সকলের আলোচনা হইয়াছে পরব্রহ্ম কি ও মনুষ্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধই বা কি, এই দুই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ঋষি পিপলপদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূল কথা এই যে, সমস্ত জগতের আদি কারণ পরমাত্মা; মনুষ্যাত্মা সেই আত্মার আংশিক বিকাশ। যিনি পরমাত্মাকে বুঝিয়াছেন ও জানিয়াছেন, তিনিই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। পক্ষীগণ যেরূপ রাত্রে নিজ নিজ নীড়ে যায়, মানবত্মাও শেষে পরমাত্মায় যাইয়া সেই রূপ আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

কেন উপনিষদ।

আর একখানি সুন্দর উপনিষদের নাম কেন উপনিষদ। এই উপনিষদেও জগত পাতার আলোচনা হইয়াছে। ব্রহ্মের স্বরূপ কি ও জগত হইতে তাঁহার পার্থক্য কি, এই উপনিষদে ইহারই উত্তর প্রদানের চেষ্টা হইয়াছে। মানবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি, কেন রচয়িতা তাহার উত্তর প্রদানে প্রয়াস পান নাই। এই উপনিষদে ভগবানের ভাব যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে, তেমন আর কোথাইও নাই। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কাহার দ্বারা

মানবত্মা জীবিত রহিয়া কার্য্যাদি করিতেছে?" ইহার উত্তরে গুরু বলিতেছেন,—

"যিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, চক্ষের চক্ষু, জীবনের জীবন, তিনিই সকল চালাইতেছেন।"

"যাহা উপলব্ধি করা যায়, তাহা ব্রহ্ম নহে। যাহা কিছু জ্ঞেয়, তাহা হইতে তিনি ভিন্ন।"

"যাঁহাকে বাক্যে প্রকাশ হয় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা বাক্যের প্রকাশ হয়, তাঁহারই চিন্তা কর।"

"যাঁহাকে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা মনকে চিন্তা করিতে পারা যায়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান।"

"যাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা চক্ষু দেখিতে পায়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান।"

"যাহাকে কর্ণের দ্বারা শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা কর্ণ শুনিতে পায়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান।"

এই অজ্ঞেয় ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করিবার জন্য এই উপনিষদে দুই একটী সুন্দর সুন্দর গল্পও উল্লিখিত হইয়াছে।

কঠোপনিষদ।

এই উপনিষদও পরমাত্মা ও মানবাত্মার আলোচনায় পূর্ণ। একটী সুন্দর আখ্যায়িকায় এই উপনিষদ আরম্ভ হইয়াছে। পিতৃ সত্য পালনের জন্য ঋষিপুত্র নাচিকেত যমালয়ে গমন করেন, তথায় গিয়া যমের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করায় যম তাঁহাকে তিনটী বর প্রার্থনা করিতে বলেন। প্রথম দুইটীতে পার্থিব

বিষয় সকল প্রার্থনা করিয়া ঋষিকুমার শেষ বরে বলেন, "হে মানবজীবনের শেষরূপী দেবতা, আত্মা ও পরমাত্মা কি আমায় বুঝাইয়া দিন।" ইহারই উত্তরে যম তাঁহাকে এই গুড়তত্ব বুঝাইয়া দিতেছেন। এই উপনিষদে কি সুন্দর ও কি উচ্চ পরমাত্মার ভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেখুন।

"আত্মা জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তিনি কখনও মরেনও না। কাহারও হইতে ইঁহার জন্ম হয় নাই, ইঁহা হইতে কিছু জন্ম গ্রহণও করে নাই। অজন্মিত, অনন্ত, অতি প্রাচীন, অধ্বংসনীয়, যদিও শরীর নষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা নষ্ট হয় না।"

"যদি নষ্টকারী মনে করেন যে আমি নষ্ট করিলাম, আর যদি যিনি নষ্ট হইলেন, তিনি মনে করেন, আমি নষ্ট হইলাম,—তাহা হইলে ইঁহাদের উভয়ই কিছু জানিলেন না।"

পরমাত্মা সম্বন্ধে কঠোপনিষদ বলেন, "ইন্দ্রিয় হইতে উচ্চ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দ্রব্য সকল। এই সকল হইতে উচ্চ মন, মন হইতে উচ্চ জ্ঞান, জ্ঞান হইতে উচ্চ পরমাত্মা।

"জ্ঞানী নিজ বাক্য মন দ্বারা সংযম করেন, জ্ঞানের দ্বারা মনকে সংযম করেন, পরমাত্মার দ্বারা জ্ঞানকে সংযম করেন।"

"যিনি অজ্ঞেয়, অনন্ত, অসীম ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিই মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পান।"

এই রূপ ও আরও অন্যরূপ ভাবে আত্মা ও পরমাত্মা বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তখনও ঋষিগণ বিষদ ভাবে এই সকল বুঝাইতে সক্ষম হইতেছিলেন না। তাঁহারা ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াও ভাষার অভাবে তাহা অপরকে স্পষ্ট করিয়া

বুঝাইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চ হইলেও বিষদ ও স্পষ্ট নহে। যে দেশে কেবলই "বিশ্বাস" ছিল, সেই দেশে জ্ঞানালোচনার সঙ্গে সঙ্গে তর্ক আসিয়াছে। যাহা ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ অন্ধ-বিশ্বাসে ও প্রেমে উপলব্ধি করিয়া ছিলেন, তাহাই এক্ষণে উপনিষদের ঋষিগণ উচ্চতম জ্ঞান চর্চ্চায় উপলব্ধি করিতে ছিলেন। পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার দুইটী মাত্র উপায়, একটী বিশ্বাস বা প্রেম, অপরটী জ্ঞান। অন্ধ হইয়া ভাল বাসিতে পারিলে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, আর জ্ঞানের চরম উন্নতি হইলে জ্ঞানালোকে তাঁহাকে দেখা যায়। ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে প্রেম শিক্ষায় হয় না, ভগবান যাহাকে দয়া করেন, কেবল তাহারই হৃদয়ে প্রেম দেখা দেয়, কিন্তু জ্ঞানচর্চ্চা, চেষ্টা করিলে সকলই করিতে পারে, তাহাই উপনিষদের ঋষিগণ জ্ঞান চর্চ্চারই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু প্রেমে ভগবান লাভ যেরূপ কঠিন ও অনিশ্চিত, জ্ঞানেও ঠিক তাহাই। জ্ঞান সাহায্যে ঋষিগণ নিজ নিজ হৃদয়ে ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু অপরকে ইহা বিষদ রূপে বুঝাইতে পারেন নাই। তাহাই তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, সে সকল কথা অতি গভীর হইলেও বড়ই অস্পষ্ট।

শত শত উপনিষদ লিখিত হইয়াছে। সকল উপনিষদের আলোচনা করিবার স্থান এ পুস্তকে নাই; আমরা আর এক খানি বিখ্যাত উপনিষদের আলোচনা করিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করিব।

ছান্দগ্য উপনিষদ।

এখানি সামবেদের উপনিষদ, আর সম্ভবমত এ খানি খুব পরবর্ত্তী উপনিষদ। যে সকল উপনিষদ প্রথম প্রথম রচিত হইয়াছিল, সে গুলি প্রায়ই গুরু শিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে রচিত, কিন্তু এই উপনিশদ খানি সম্পূর্ণই গল্পকয়। এখানিকে পুরাণের মূল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বিশেষতঃ, এই উপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণের নাম উল্লেখ আছে। তাহাতেই বোধ হয়, এই সময়ে দুই এক খানি পুরাণ ও ইতিহাসও রচিত হইয়াছিল।

প্রথমে সোম যজ্ঞ হইতে এই উপনিষদ আরম্ভ হইয়াছে, তৎপরে উশষ্টি নামক এক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান অবলম্বনে পরমাত্মা কি তাহাই বুঝান হইয়াছে। ছান্দগ্য উপনিষদকার বলেন, "যিনি পরব্রহ্মকে বুঝিয়াছেন, তাঁহার নিকট সূর্য্যের উদয়াস্ত নাই। তাঁহার নিকট এক অনন্ত দিন সর্ব্বদা বিরাজ করে।"

আর একস্থানে ঋষি বলিতেছেন,—"এই সমস্তই ব্রহ্ম। কারণ তাঁহা হইতে সকল হইয়াছে, তাঁহাতেই সকল যাইবে, তাঁহার দ্বারাই সকল রক্ষিত হইতেছে। আত্মসংযম করিয়া নির্জ্জনে ইহাঁকে ধ্যান করিতে হইবে। মানুষ চিন্তাপূর্ণ জীব, যাহা মানুষ এ জীবনে ভাবে, পর জীবনে তাহাই হয়; সেই জন্য নিয়ত স্তব করিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান করাই মানবের কর্ত্তব্য।"

"যিনি সকল করেন, যাঁহার ইচ্ছার উপর সকলই নির্ভর করে, যাঁহা হইতে সকল সৌগন্ধ আইসে, সকল রস জন্ম গ্রহণ

করে, যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বেড়িয়া আছেন, তিনিই আত্মারূপে আমার মধ্যে আছেন; ইহাই ব্রহ্ম। এ জীবনান্তে আমি ইহাঁকেই পাইব।"

এই উপনিষদের আর একস্থানে ঈশ্বরের স্বরূপ আরও সুন্দররূপে প্রকাশ করা হইয়াছে,—

"স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু,—বাতাস তাঁহার নিশ্বাস,—আকাশ তাঁহার দেহ,—চন্দ্র তাঁহার তেজ, পৃথিবী তাঁহার পদ,—যজ্ঞবেদী তাঁহার বক্ষ, দূর্ব্বাদল তাঁহার কেশ, হোমাগ্নি তাঁহার হৃদয়।"

এরূপ সুন্দর ভাব আর কোথায়! বেদের সত্য উপনিষদের জ্ঞানালোকে পরিস্ফুট হইয়াছে। বেদের মহান বাক্যাবলী, উপনিষদের আলোকে অধিকতর প্রতিভাসিত হইয়াছে। ভগবান আর্য্যকণ্ঠে আবির্ভূত হইয়া বেদে যে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি জগতে প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন, উপনিষদে ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ গভীর গবেষণা ও জ্ঞানরূপ ঘৃত সেই পবিত্র অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সমস্ত জগত সেই আলোকে আলোকিত করিয়া গিয়াছেন। বেদ বলিতেছেন,—"হে দেব, তুমিই সব,—তোমাকে বুঝিলাম না, জানিলাম না, তোমাকে ভাল বাসিয়াই পাগল হইলাম। তুমি কে, কোথায় থাক, তোমার স্বরূপই বা কি, তাহা আমাকে কে বুঝাইবে!" উপনিষদ এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। ঈশ্বরের এই স্বাভাবিক হৃদয়ের ভাব জ্ঞানালোকে পরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহারা চেষ্টিত হইলেন,—কিন্তু তাহাও তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "এই জগতই তুমি। তুমিই "এক" সর্ব্বত্র

বিরাজ করিতেছ, আমি তোমার অংশ মাত্র। তুমি পরমাত্মা, আমি আত্মা, তোমাতে না মিশিতে পারিলে আমার শান্তি নাই।"

যাগ যজ্ঞে ইহা হয় না, যাগ যজ্ঞে আমোদ হয় সত্য, কিন্তু সে আনন্দ স্থায়ী হয় না। যাগ যজ্ঞে মানসিক উন্নতি হয় সত্য, কিন্তু একেবারে পরমাত্মায় পরিণত হইতে পারা যায় না। জ্ঞানের স্বাদ পাইয়া ও পূর্ণ-ব্রহ্মের ভাব জ্ঞানালোকে ঋষিগণ হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া যে আনন্দ লাভ করিলেন, তাহার বর্ণনা হয় না। তাঁহারা এই আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য লোকালয়ের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্য মধ্যে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মানন্দের স্বাদ পাইয়া সংসারিক আনন্দে বিতৃষ্ণ হইলেন; গৃহ সংসার ভুলিয়া গেলেন, অরণ্য মধ্যে এই আলোচনায় ও ধ্যানে সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যাগ যজ্ঞ গৃহীদিগের জন্য রহিল, সেই যাগ যজ্ঞ করিবার জন্য এক দল ব্রাহ্মণ গৃহীও রহিলেন। ইঁহারা অরণ্যস্থ ঋষিগণের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান যত শিখুন আর নাই শিখুন, যাগ যজ্ঞ প্রণালী সকল শিক্ষা করিয়া আসিতেন এবং রাজাধিরাজ মহারাজ ও ধনীগণের গৃহে যাগ যজ্ঞ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে দেশে দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইল। একদল ঋষি, ইঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান-সুধা পানে বিভোর হইয়া অরণ্যে বাস করেন, ইঁহারা জ্ঞানালোকে জগত আলোকিত করেন, অপর দল লোকের নিকট ধর্ম্মের নামে নানাবিধ কার্য্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকেন।

এই সময় হইতেই ব্রাহ্মণের অধঃপতন। তারপরে আর অরণ্যবাসী ফলমূলাহারী ঋষি নাই, এক্ষণে গৃহী ব্রাহ্মণগণের বংশাবলীই বিদ্যমান আছেন। এই অর্থ ললুপ ব্রাহ্মণগণ হইতেই পবিত্র আর্য্যধর্ম্মের ও সোণার আর্য্যভূমির সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে।

উপনিষদে আমরা আর একটী নূতন বিষয়ের সৃষ্টি দেখিয়াছি, সেটীও এইখানে বলা আবশ্যক। যখন সামবেদ প্রচারিত হয়, তখনই বেদের গানে সুর, লয় সংযুক্ত হইয়াছিল। ঋকের সময় সরল-চিত্ত আর্য্যগণ প্রাণের আবেগে গাইতেন. প্রাণের গান কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া তাহাতে সুর, লয় না থাকিলেও তাহা বড়ই প্রাণে লাগিত, কিন্তু পরে ব্রাহ্মণগণ কেবল মাত্র মুখস্থ করিয়া সেই সকল গান গাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহা আর তত ভাল লাগে না। যে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারে না তাহার কণ্ঠে এ গান তত মধুর হইবে কেন? ব্রাহ্মণগণ এই অভাব পূরাইবার জন্য সামবেদের গান সকল সুর লয় সংযোগে মধুর করিয়া গাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইহাই ইহার শেষ নহে, পরবর্ত্তী সময়ে ব্রাহ্মণগণ এই সকল গানে নানাবিধ প্রকার শব্দ সংযোগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ফল ও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে বলিয়া প্রকাশ করিলেন। প্রথমে বেদের গান, গান মাত্র ছিল; পরে স্তব হইয়াছিল, শেষাংশে প্রায় মন্ত্ররূপে পরিণত হইল।

ভগবানের এ পর্য্যন্ত একটা স্থির নিশ্চিত নাম হয় নাই। যাহার প্রাণে যে নাম আসিত, তিনি তাঁহাকে সেই নামেই ডাকিতেন; কিন্তু এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ ভগবানের একটী সাধারণ

নাম প্রদান করিলেন। এটী একটী শব্দ মাত্র, এই "ওঁ" শব্দ ভারতের কেনা জানেন? তাঁহারা বলিলেন, "ওঁই ব্রহ্ম, ইহাই তাঁহার পার্থিক বিকাশ।"

দর্শন।

ঋষিগণ উপনিষদ রচনা করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন না। দিন দিন তাঁহাদের মধ্যে গবেষণা ও চিন্তার বিস্তৃতি হইল, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানালোক চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। বেদে যে ভগবানের বিকাশ হইয়াছিল, উপনিষদে সেই বিকাশ জ্ঞান সাহায্যে প্রমাণিত করিবার চেষ্টা হইল, কিন্তু ইহাই ইহার শেষ নহে। পরে আরও জ্ঞানের বৃদ্ধি হইল এবং এই সকল গুঢ় তত্ত্বের পরিস্ফুটন ও মিমাংসা হইল। বহু ঋষি এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া গ্রন্থ রচনা করিলেন, এই সকল গ্রন্থ দর্শন নামে অভিহিত হইল।

ক্রমে দর্শন প্রধান ছয়টী ভাগে বিভক্ত হইল। ছয়টী প্রধান মত ভারতে প্রচারিত হইল; জগতের কারণ সম্বন্ধে যত তর্ক বিতর্ক হইল, তাহার ছয় প্রকার মিমাংসা ভারতে ঘটিল, অপরে অপর নানারূপ মিমাংসা করিলেও এই ছয় প্রকার মতই প্রাধান্য লাভ করিল। এই ছয় প্রকার দর্শন "ষড় দর্শন" নামে ভারতে বিদিত।

বেদে বলিলেন "এক ভগবানই জগতের জীবন!" উপনিষদে স্থির হইল,—"তিনি পরমাত্মা, মানব মানবআত্মা মাত্র। তিনিই সত্য, আর জগতের সকলই মিথ্যা। পরমানন্দ ও জীবন্মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাতে মিশিয়া যাওয়া ভিন্ন আর

উপায় নাই। তিনি সত্য, জগত মিথ্যা, কিন্তু আমার আত্মা তাঁহার অংশ, সুতরাং আমার আত্মা তাঁহা হইতে পৃথক হইলেও তাঁহার আত্মা ও আমার আত্মা এ উভয়ই এক। এই জন্য তাঁহার সহিত আমার সম্মিলন সম্ভব,—এই মিলন না হইলেই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয় এবং সংসারে দুঃখ ভোগ ঘটে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া উপনিষদ নিরস্ত হইলেন, তখন এই সমস্যা পুরনের জন্য দর্শন আসিলেন। ক্রমে ক্রমে ছয়খানি দর্শন রচিত হইল, ইহাদের নাম,—

১। কপিল প্রণীত সাংখ্য।

২। পতঞ্জলী প্রণীত যোগ (এখানি সাংখ্যের উপসংহার ভাগ।)

৩। গৌতম প্রণীত ন্যায়।

৪। কনাদ প্রণীত বৈশেষিক (এখানি ন্যায়ের উপসংহার)

৫। জৈমেনি প্রণীত পূর্ব্ব মিমাংসা।

৬। জৈমেনি প্রণীত উত্তর মিমাংসা বা বেদান্ত।

উপনিষদে যাহা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ আমাদের আত্মা কিরূপে পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইতে পারে,—অথবা কিরূপে আমরা জগতের দুঃখ ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি,—ইহাতে তাহারই উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা হইয়াছে। কিসে মানবের দুঃখ কষ্ট যায়, কিসে মানবের আর পুনর্জ্জন্ম না হয়, কিসে তাহার কৈবল্যমুক্তি লাভ হয়, তাহারই উপায় এই ষড় দর্শনে আলোচিত হইয়াছে।

এরূপ গভীর গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ সংসারে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ সব বিষয়ে আর্য্য ঋষিগণ কত চিন্তা

করিয়াছিলেন.—তাহা এই সকল দর্শন পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তা শক্তি যতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, তাঁহারা যত উচ্চে উঠিয়াছিলেন, তত এ পর্য্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দির জ্ঞানের দিনেও হয় নাই।

সাংখ্য দর্শন।

সাংখ্য দর্শনে কপিল বলেন, "সম্পূর্ণরূপে দুঃখ কষ্ট নিবারণ ও দূর করাই মানবাত্মার মুখ্য উদ্দেশ্য।" তৎপরে তিনি বলিয়াছেন,—"দুঃখ তিন প্রকার, আপন হইতে যে দুঃখ জন্মে, অপর জীবগণ হইতে যে দুঃখ জন্মে ও প্রাকৃতিক কারণে যে দুঃখ হয়,—এই তিন প্রকার দুঃখ ভিন্ন আর দুঃখ নাই।"

এক্ষণে স্বভাবতঃই প্রশ্ন হয়,—এই তিন প্রকার দুঃখ দূর করাই যদি মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে এই দুঃখ দূর করিবার উপায় কি? কপিল ঋষি সাংখ্য দর্শনে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, "পঞ্চবিংশ তত্ত্বের জ্ঞানে এই দুঃখ দূর হয়।" এই পঞ্চবিংশ তত্ত্বই সকল প্রকার অস্তিত্বের মূল। নিম্নে আমরা এই পঞ্চবিংশ তত্ত্বের নাম লিখিতেছি।

১। প্রকৃতি,—যে শক্তির দ্বারা এই সমস্ত জগতে সৃষ্ট, সেই শক্তির নাম প্রকৃতি। ইহা অনন্ত, উৎপাদিনী, কিন্তু নিজে উৎপন্ন নহে। অচৈতন্য ও সমস্ত জগতের জড়ের কারণ।

২। প্রকৃতি হইতে বুদ্ধির উৎপত্তি। বুদ্ধির ফল চৈতন্য।

৩। চৈতন্ত হইতে অহঙ্কার বা আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান অর্থে আমিত্ব জ্ঞান বুঝিতে হইবে।

৪। অহঙ্কার হইতে পঞ্চগুণের উৎপত্তি. জড়ের সহিত এই পাঁচ বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই।

৫। অহঙ্কার হইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়,—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক।

৬। পঞ্চ অঙ্গ, যথা,—হস্ত, পদ, কণ্ঠ, ও অন্ত দুই অঙ্গ।

৭। মন,—চিন্তা ও অনুভবের বৃত্তি :

৮। পঞ্চভূত, যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত ও ব্যোম।

৯। পুরুষ।

এই পঞ্চবিংশ তত্ত্বে মানুষ ঘটিত, ইহাদ্বারা মানুষকে দুইটী স্বভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এক স্থুল (জড়) শরীর বিশিষ্ট মানব, অন্ত সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট মানব। জড় বা স্থুল শরীর নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর অনশ্বর, ইহা নষ্ট হয় না, পুনঃ পুনঃ জড় শরীর ধারণ করিতে থাকে। এই জড় শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সংখ্যাকার এই সকল তত্ত্বের বিষয় দার্শনিক ভাবে বিশেষ আলোচনা [illegible]। মনুষ্য লইয়াই তাঁহার সম্বন্ধ, মনুষ্য ব্যতীত আর কোন পরমাত্মা আছে কিনা, সে বিষয়ের তিনি কোনই উল্লেখ করেন নাই। তিনি আছেন কি নাই, সে সম্বন্ধে তিনি কোন কথা কহেন নাই। মনুষ্য যে পঞ্চবিংশ তত্ত্বে গঠিত তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি বিশদরূপে আলোচনা করিয়া তিনি শেষে বলিতেছেন, "জড় দেহ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই দুঃখ যায়। অহঙ্কার বা আমিত্ব জ্ঞানকে

একেবারে বিনষ্ট করিতে পারিলেই ইহা হয়। পঞ্চবিংশ তত্ত্বে বিশেষ জ্ঞান জন্মিলে তখন জড় জগতের অনিত্যজ্ঞান জন্মে। এ সংসার যে কিছুই নহে, এমন কি আমিও যে কিছুই নহি, এ জ্ঞান জ্ঞানালোচনায় ও পঞ্চবিংশ তত্ত্বে জ্ঞানী হইলে হইয়া থাকে।" মহর্ষী কপিল বলিতেছেন, "দুঃখের হস্ত হইতে মুক্তি লাভই তোমার প্রধান উদ্দেশ্য; যদি ইহা করিতে চাহ, তবে জ্ঞানালোচনা করিয়া অহঙ্কার বা আমিত্ব জ্ঞান নষ্ট কর।"

এই সকল গুড় তত্ত্ব অতি সুন্দর ভাবে সাংখ্যে আলোচিত হইয়াছে। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহোর্ষী কপিল নিজ চিন্তা শক্তির বলে যাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কেহ সে সকল তত্ত্বের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

যোগদর্শন।

মহোর্ষী পতঞ্জলী এই দর্শন প্রণেতা; এ খানিকে সাংখ্যের অন্তর্গত দর্শন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সাংখকার পরব্রহ্মের একেবারেই উল্লেখ করেন নাই, তাঁহাকে বাদ দিয়াই তিনি মানব-দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহর্ষী পতঞ্জলী পরব্রহ্মকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকেই প্রাধান্য দিয়া নিজ দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি সাংখ্যের সকল কথাই মানিয়াছেন; সংখ্যকার বলেন, "জড় দেহ হইতে বিভিন্ন হইতে পারিলেই দুঃখ ক্লেশ যায়; আমিত্ব নষ্ট করিতে পারিলেই মুক্তি হয়।" পতঞ্জলী বলিতেছেন, "এ সকলই ঠিক, কিন্তু সেই আমিত্ব নিত্য ও অনশ্বর, সুতরাং সে আমিত্ব কিরূপে বিস্মৃত হইতে পারা যায়? আত্মা পরমাত্মার অংশ,

সুতরাং আত্মাকে ভুলিতে হইলে পরমাত্মার সহিত যোগই ইহার একমাত্র উপায়।"

ইহা করিতে হইলে সাংখ্যকার বলেন, "পঞ্চবিংশ তত্ত্বজ্ঞানে ইহা সম্পন্ন হয়।" পাতঞ্জলী বলিতেছেন,"ব্রহ্মে নির্ভর করিলে ইহা হয়। ব্রহ্মে নির্ভর করিতে হইলে জ্ঞানে সেই নির্ভরতা জন্মে। চিন্তায় জ্ঞান আইসে, সুতরাং চিন্তা, ধ্যান, ধারনাই মুক্তির প্রথম সোপান।" মানব জীবনে এ কার্য্য করিতে হইলে অনেক বিপদাপদ আছে,—যথা রোগ, আলস্য, সন্দেহ প্রভৃতি। এই সকল বিপদ আপদ দূর করিতে পারিলে তবে জ্ঞান জন্মে, জ্ঞান হইতে নির্ভরতা আইসে, নির্ভরতা আসিলে ভগবানে মিশিয়া যাওয়া যায়। মহর্ষী পাতঞ্জলী এই কয়টী মূলতত্ত্ব স্থির করিয়া তৎপরে কিসে এই সকল বিপদাপদ না হয় ও কিসে জ্ঞানলাভ ঘটে তাহারই কতকগুলি উপায় তাঁহার যোগশাস্ত্রে লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল উপায় সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভাবে বিষদ রূপে লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "ইহার অষ্ট প্রকার সাধন, যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রতিহার, ধারণ, ধ্যান ও সমাধি।

১। যম অর্থে আত্ম সহিষ্ণুতা। সর্ব্ব প্রকার শরীরকে সকল সহ্য করান, অর্থাৎ শরীরকে বশে আনয়নের নামই যম।

২। নিয়ম অর্থে সমস্ত প্রকার ধর্ম্মাচরণ; পূজা, দান ব্রতপালন প্রভৃতি করার নামই নিয়ম।

৩। আসন অর্থে যে রূপ ভাবে বসিয়া চিন্তা করিতে হইবে সেই উপবিষ্ট হইবার প্রণালী সকল।

৪। প্রানায়াম অর্থে নিশ্বাস সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী আয়ত্ব করা।

৫। প্রতিহার অর্থে ইন্দ্রিয় সকলকে আত্মবশে আনয়ন।

৬। ধারণ অর্থে মনকে একনিবেশ করা। মন যাহাতে স্থিরচিত্ত হইতে পারে, তাহাই কারার নাম ধারণ।

৭। সমাধি অর্থে গভীরতম চিন্তা, সমস্ত বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া চিন্তার উন্নতি করা।

এইরূপ উপায়ে সাধনা করিলে আত্মমুক্তি ও ভগবান সম্মিলন ঘটে, মহর্ষী পতঞ্জলী এই বিশ্বাস করিয়া এই অষ্ট প্রকার সাধন কিরূপে করিতে হইবে তাহারই নিয়ম প্রাণালী পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যোগশাস্ত্র বলেন, "এই সকল সাধনে অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ হয়।" অর্থাৎ এই রূপ ভাবে যোগ সাধনা করিলে মানুষের অভূতপূর্ব্ব ক্ষমতা জন্মে; তখন মানুষ নিশ্বাস বন্দ করিয়া থাকিতে পারে, আহার না করিয়াও জীবিত রহে, শূন্যে বিচরণ করিতে পারে, জলের উপর দিয়া পদচারণ করিলেও জলমগ্ন হয় না। যোগে এইরূপ আরও বহুতর রূপ অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মে, কিন্তু যোগের উদ্দেশ্য ক্ষমতা লাভ নহে। পরমাত্মার সহিত সম্মিলন। অনেকে ক্ষমতা লাভে আত্মবিস্মৃত হইয়া যোগের মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া যায়, তৎপরে বাজিকরের ন্যায় লোককে অত্যাশ্চর্য্য কাজ দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকে।

কিরূপে যোগ সাধন করিতে হয়, তাহার পুঙ্খাণুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। পাতঞ্জল দর্শন

কি ও তাহাতে কি আছে, ইহাই দেখাইয়া একণে আমরা অন্য আর একখানি দর্শনের আলোচনা করিব।

ন্যায় দর্শন।

এই দর্শন মহোর্ষী গৌতম প্রণয়ন করিয়াছেন; ইনি সম্ভবমত সাংখ্যের মতে মত দিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, জ্ঞান লাভই প্রকৃত মুক্তির পদ। কিন্তু এই জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে কিরূপে লাভ হইতে পারে, তাহা সাংখ্যকার বা পাতঞ্জল-রচয়িতা বলেন নাই। সাংখ্য বলিলেন, "জ্ঞানে নির্ভরতা হয়, নির্ভরতায় মুক্তি হয়।" পতঞ্জলী বলিলেন, "এই জ্ঞান লাভের জন্য গভীরতম চিন্তা আবশ্যক।" এই গভীরতম চিন্তা কিসে হয় তাহারই তিনি উপায় বলিয়া দিলেন। এই সকল দেখিয়া মহোর্ষি গৌতম বলিলেন, "এ বেশ কথা, এ উভয় কথাই মানিলাম। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে হওয়া সম্ভব, কিরূপে বিশ্বাস জন্মিবে ও সেই সঙ্গে নির্ভরতা আসিবে? এ বিশ্বাস করিতে হইলে ইহার বিশেষ প্রমাণ চাই, নতুবা কথায় বলিলে বিশ্বাস হয় না।"

কিরূপে তর্ক বিতর্ক করিয়া এই জ্ঞান দৃঢ় হয়, তাহারই উপায় উদ্ভাবনের জন্য তিনি ন্যায় শাস্ত্র প্রণয়ণ করিলেন। প্রথমে প্রমাণ কাহাকে বলে তাহাই বলিয়া তিনি কি রূপ প্রমাণ এই জীবন্মুক্তি ও পরব্রহ্ম সম্বন্ধে আবশ্যক, তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। তৎপরে কি উপায় অবলম্বন করিলে সন্দেহ দূরীভূত হইয়া নিশ্চয়তা ও সত্যে বিশ্বাস জন্মে তাহাই বিষদ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই সকল উপায় এমনই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাবে লিখিত হইয়াছে যে দেখিলে বিস্মীত হইতে

হয়। আধুনিক ইয়োরোপিয় পণ্ডিতগণও এই ন্যায় শাস্ত্রকে লজিক (Logic) মনে করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে এখানি ঠিক "লজিক" নহে। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় ইহারও মুল উদ্দেশ্য পরব্রহ্মের তত্ত্বানুসন্ধান। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে বিশ্বাস জন্মে মহর্ষী গৌতম তাহারই বিষদ আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা আবশ্যক তাহার কিছুই তিনি বলিতে বাকি রাখেন নাই। তিনি বিশ্বাসের জন্য যে সকল উপায় ও তর্ক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারই সাহায্য অবলম্বন করিয়া যে বিশ্বাস জন্মিবে, সে জ্ঞানের বিশ্বাস ; সে বিশ্বাস কখনও যাইবার আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। ন্যায় দর্শনে গৌতম ঋষি বিশ্বাস জন্মিবার প্রকৃত উপায় ও পথ না দেখাইয়া দিলে, কপিলের সাংখ্যে ও পতঞ্জলীর যোগে লোকের কিরূপে বিশ্বাস জন্মিত তাহা আমরা জানি না।

বৈশষিক দর্শন।

মহর্ষী কনদ এই দর্শন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই দর্শন খানি দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হয় যে ইহা ন্যায় দর্শনের পরে রচিত, ন্যায় দর্শনে যাহা আছে তদ্ব্যতীতও অনেক বিষয় এই দর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে, বিশেষত পদার্থ বিদ্যা Physical science সম্বন্ধীয় অনেক কথাও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় অতি সুন্দর ভাবে এই দর্শনে আলোচিত হইয়াছে। আজ উনবিংশ শতাব্দির শেষে যে সকল সত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ও হইতেছে বহু সহস্র

বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষী কনদ অতি সুন্দর ভাবে সেই সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

তিনিও জগতের মূল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য শরীর, মন ও আত্মা কি ও ইহাতে কি কি ও কোন কোন বৃত্তি আছে তাহাই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "জগতের মূল পরমানু। ইহা অনশ্বর, ইহার আকার নাই, পরিবর্ত্তনও নাই। অঙ্ক শাস্ত্রের বিন্দুর সহিত মহোর্ষী কনদের পরমানুর তুলনা করিতে পারা যায়। তবি তিনি এই সকল পরমানুর বিশেষত্ব আছে বলিয়া স্বীকার করেন, এই বিশেষ কথা হইতেই তাঁহার দর্শনের নাম বৈশষিক হইয়াছে। তিনি বলেন, "এই সকল পরমানুর পরস্পর সম্মিলনেই এ জগত সৃষ্ট হইয়াছে।" তিনি প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, "প্রকৃতিরই উৎপাদিকা বা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে। দুঃখ কষ্ট সকলই ভ্রম, জ্ঞানে এই ভ্রম দূরিভূত হয়, সুতরাং জ্ঞানই দুঃখ কষ্ট দূর করিবার একমাত্র উপায়।"

ন্যায় দর্শনের ন্যায় এ দর্শন খানিতেও পরমাত্মার বিষয় আলোচিত না হইয়া বরং মানবাত্মার গঠন প্রণালী প্রভৃতির অধিক আলোচনা করা হইয়াছে। এই দর্শনে পার্থিব বিষয়ের যেরূপ আলোচনা হইয়াছে, অন্য দর্শনে তেমন হয় নাই। জগতে প্রকৃতির রাজ্যে যে সকল বিষয় দেখা যায়, তাহারই স্থির মিমাংসার জন্য গৌতম ও কনদ উভয়েই চেষ্টিত হইয়াছেন। কোনটী সত্য ইহা প্রমাণ করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন, যেরূপ ভাবে তর্ক করিয়া সন্দেহ দূর করা আবশ্যক এবং যে সকল প্রমাণ সহোযোগ এই সত্য প্রকৃত নির্দ্ধারিত হইতে পারে,

স্থায় ও বৈশেষিক এ উভয় দর্শনেরই এই মূল উদ্দেশ্য। বেদ যে বাক্য বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য কিনা তাহারই বিশেষ আলোচনা এই দুই দর্শনে হইয়াছে। জগতের মধ্যে প্রকৃত সত্য কি, তাহারই বাদানুবাদ এই দর্শনে ও স্থায় দর্শনে বিশেষ পরিষ্কার রূপে করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

মিমাংশা দর্শন।

মিমাংশা দর্শন দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। একখানির নাম পূর্ব্ব মিমাংসা, অপর খানির নাম উত্তর মিমাংসা। এই উত্তর মিমাংশাই বেদান্ত বলিয়া পরিচিত। মহর্ষী জৈমিনী এই দুই দর্শন প্রণয়ণ করিয়াছেন।

বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যে সকল যাগ যজ্ঞ ক্রীয়া কলাপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদিগের সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করাই পূর্ব্ব মিমাংসার কার্য্য; আর আরণ্যক ও উপনিষদে যে ভগবানের ও পরমাত্মার ভাব প্রকাশ হইয়াছে; তাহারই সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ বেদান্তের বা উত্তর মিমাংসা দর্শনের কার্য্য।

পূর্ব্ব মিমাংশ দর্শন দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হয় যে, ভারতে আরণ্যক ও উপনিষদ, তৎপরে দর্শন শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাবে যাগ যজ্ঞ ক্রমে হতাদৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা করিলে যে মুক্তি হইবে, এ কথা উপনিষদকারগণ ও পরে দার্শনিকগণ বলেন না; কাজেই লোকেরও মন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে বেদ লইয়াও বিবাদ বাধিয়াছে, বেদের স্তবস্তুতির কোনটী সত্য ও গ্রহনীয় ইহা লইয়া বিশেষ বাদানুবাদ চলিতেছে, অতি কঠিনতর বাদানুবাদ বাধিয়াছে, নানাবিধ

মত ভেদ ঘটিয়া বৈদিক ধর্ম্ম ভারত হইতে যায় যায় হইয়াছে। পণ্ডিতগণের বেদ বিহিত কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে যে মত ভেদ ঘটিয়াছিল, তাহারই মিমাংসা করিবার জন্য মহোর্ষী জৈমিনী এই দর্শন প্রণয়ন করেন। বেদ বিহিত কার্য্য কলাপ গুলিকে শ্রেষ্ঠ ও যে মতভেদ ঘটিয়াছে তাহা যে মুল সম্বন্ধে মতভেদ নহে, পূর্ব্ব মিমাংসায় তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। এখানি দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, দেশে জ্ঞানলোচনার প্রাদুর্ভাবে, অরণ্যস্থ ফলমুলাহারী ঋষিগণের জ্ঞান বিস্তারে গৃহী ব্রাহ্মণগণের অন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ভাব আর্য্য সমাজে প্রবল হওয়ায় লোকের মনে যাগ যজ্ঞের প্রতি আর তত মমতা নাই। এক্ষণে লোকে তত আর যাগ যজ্ঞ করে না, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগণের অর্থেরও অসচ্ছলতা জন্মিয়াছে। বনের ব্রাহ্মণগনই সর্ব্বত্র পূজিত, তাঁহাদের জ্ঞানময় বাক্য সকলই সর্ব্বত্র গ্রাহ্য, রাজাধিরাজ মহারাজগণ বনের ফলমুলাহারী ঋষীগণের পদানত। যে সকল ব্রাহ্মণ গৃহে থাকিয়া অর্থের জন্য অপরের যাগ যজ্ঞ সমাধা করেন, তাঁহারা সমাজে ক্রমে ধীরে ধীরে হেয় ও হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। জ্ঞানালোচনা ও বিদ্যার জয় সর্ব্বত্র হইয়াছে।

ইহাতে ক্ষতিও হইতেছে। সাংসারিকগণ ধর্ম্মভাব আর কিছুই ভাল বুঝিতে পারেন না, গভীর ভাবপূর্ণ ও দার্শনিক স্বভাব বিশিষ্ট ঋষিধর্ম্ম বুঝিতে পারা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে। পূর্ব্বে যাগ যজ্ঞ ও নানাবিধ ধর্ম্মাচরণ তাঁহারা করিতেন, কিন্তু ঋষিগণের উপনিষদ ও দর্শনের ছায়া দূর হইতে তাঁহাদের হৃদয়ে পতিত হওয়ায় তাঁহারাও যাগ যজ্ঞ

প্রায় পরিত্যাগ করিতেছেন। দেশে ক্রমে বেদান্তের ভাবই প্রবল হইয়াছে, বনে গিয়া জ্ঞানালোচনা, চিন্তা, যোগসাধনা প্রভৃতির দিকে সকলের মন আকৃষ্ট হইয়াছে। ভাল লোক সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেছেন, কুলোক পাপাচারণে মন দিয়াছে।

সকলে যোগী হইয়া অরণ্যে গেলে সংসার চলে না, তাহা মহর্ষী জৈমেনী আর্য্য সমাজে পুনরায় যাগ যজ্ঞের আদর বৃদ্ধি করিবার জন্য এই পূর্ব্ব মিমাংসা নামক দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। বৈদিক যাগ যজ্ঞ ক্রীয়া কলাপ যে সত্য ও প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ, এই সকল ক্রীয়া কলাপ সম্বন্ধে ঋষিগণের মধ্যে যে মতভেদ ঘটিয়াছে, তাহা নিতান্তই কেবল বাক্যের পার্থকতা, তিনি তাহাই বিশদরূপে নানা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্ত একবার যে গতি মানব জাতিতে ঘটিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন স্বয়ং ভগবান ব্যতিত আর কেহ করিতে সক্ষম নহেন।

ম র্ষী জৈমেনী নিজ দর্শনে কেবল মাত্র যাগ যজ্ঞের সাপক্ষতা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; দেশে যে গুড়-তত্ত্বের আলোচনার তরঙ্গ ছুটিয়াছিল, তিনিও সেই তরঙ্গে ঝম্প প্রদান করিলেন। মহর্ষী কপিল, পতঞ্জলী, গৌতম ও কনদ যে বিষয় সকল চিন্তা করিয়াছিলেন ও যে সকল অপূর্ব্ব শক্তির প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, তিনিও সেই সকল বিষয়েই চিন্তা করিলেন। জগতের মূল কারণ কে, ব্রহ্ম কি, আমাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি, মহোর্ষী জৈমিনীও এই সকল বিষয়ে চিন্তা করিলেন। তাঁহার এই চিন্তার ফল বেদান্ত দর্শন।

বোধ হয় অন্যান্য সকল দর্শনে যাহা হইয়াছিল, বেদান্ত দর্শনে তাহাপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। অন্যান্য দর্শনে যে টুকু বাকি ছিল, বেদান্ত দর্শনে সেই অভাব পূর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞানের যে টুক প্রকাশ করিতে পারেন নাই, মহোর্ষী জৈমিনী তাহাই প্রকাশ করিলেন। বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্মজ্ঞান জগতের মূল কারণ সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার খণ্ডন করিতে এ পর্য্যন্ত কি এ দেশে কি ইয়োরোপে কোথায়ও কেহ পারেন নাই। এ সকল সম্বন্ধে আর নূতন কথাও কেহ কিছু বলিতে সক্ষম হন নাই। আমরা অতি সংক্ষেপে বেদান্তের মত নিয়ে লিপিবদ্ধ করিব।

মহোর্ষী জৈমিনি বলেন,—"ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, নিত্য ও নির্গুণ; তাঁহার দুইটী বিকাশ,—একটী পুরুষ, অপর প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ে সর্ব্বদা সম্মিলিত হইয়া থাকেন, কখন তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হয়েন না। এই প্রকৃতি পুরুষ সম্মিলিত যে ব্রহ্ম তাঁহারই নাম ঈশ্বর; ইনি সর্ব্বগুণ বিশিষ্ট, সর্ব্ব শক্তিমান, দয়াময়, ইচ্ছাময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ম্মময়,—তাঁহার গুণের সীমা নাই, তাঁহার ভাবের সীমা নাই, তাঁহার বিকাশের সীমা নাই।"

যেমন বিস্তৃত অনন্ত অসীম সমুদ্র ও তরঙ্গ, তেমনি ঈশ্বর ও এই জগত। তিনি ব্যতিত এ সৃষ্টিতে আর কিছুই নাই, "এক"ই বিরাজ করিতেছেন; "এক" ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। এক হইতেই সহস্র; সহস্র বিকাশ মাত্র, সহস্র ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নহে।

বেদান্ত এই ঈশ্বরকে পরমাত্মা নাম প্রদান করিয়াছেন। মহোর্ষী বলেন, "মানবাত্মা পরমাত্মার অংশ মাত্র, যেমন অগ্নি

ও সেই আগ্ন হইতে সমুত্থিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ঠিক সেইরূপ পরমাত্মা ও মানবাত্মা। তিনিই মহান অগ্নি, আমরা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাত্র।"

স্যাংখ্যকার যেরূপ বলেন, বেদান্ত রচয়িতাও ঠিক সেইরূপ বলেন। তাঁহারা বলেন, "এই মানবাত্মার সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ আছে; ইহাতে মানবের কয়েকটী বিশেষ গুণ বর্ত্তায়, ইহার মধ্যে আমিত্ব জ্ঞান প্রধান।" বেদান্ত বলেন, "জগত মিথ্যা, কেবল তিনিই সত্য।" যদি তাহা হয়, তবে আমি তুমি সকলেই মিথ্যা, কেবল অহঙ্কার বশতঃ মানবের আমিত্ব জ্ঞান জন্মে। আর এই আমিত্ব জ্ঞান জন্মে বলিয়াই মানব বহুবিধ দুঃখ বোধ করিতে থাকে।

এই সুখ দুঃখ দর করিবার কোন উপায় আছে কিনা, বেদান্ত দর্শন তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। মহর্ষী জৈমিনী বলেন, "এই আমিত্ব জ্ঞান নষ্ট না করিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবার কোন উপায় নাই। এ কার্য্য ধর্ম্মাচরণ, সংসার পরিত্যাগ, মায়া বিসর্জ্জন, তপ, ধ্যান ও সাধনা দ্বারা হয়। কেবলই যদি মূল সত্বের উপর মনোনিবেশ করা হয়,—তিনিই সত্য, আমিই তিনি,—সোহং—এই জ্ঞান যদি হৃদয়ে দৃঢ় হয় ও এই চিন্তাই যদি হৃদয়ের হৃদয়ে আমুল বদ্ধ হয়, তাহা হইলে মায়া কাটিয়া যায়, পূর্ণ জ্ঞান আইসে, সেই জ্ঞানে তখন ঈশ্বরে ও নিজে কোন ভেদ জ্ঞান থাকে না। তখন "এক" ভিন্ন দুইয়ের অস্তিত্ব বোধ একেবারেই রহে না। সোহং জ্ঞান পূর্ণ হইলেই কৈবল্য মুক্তি লাভ ঘটে।"

ইহাই বেদান্তের মূল। বলিতে গেলে সকল দর্শনেরই মূল এক, তবে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই সকলের

আলোচনা করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁহারা মানব জীবনের দুঃখ দূর করিবার উপায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এই মাত্র। অনেকে মনে করেন, ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সকল দর্শনের মূল এক, সকলেই মানব জীবনের দুঃখ ক্লেশ দূর করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন, এ কার্য্য কি কি উপায়ে হইতে পারে তাঁহারা তাহারই বিষদ অলোচনা করিয়াছেন। তবে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে, জগতের সৃষ্টি স্থিতি সম্বন্ধে, মানবাত্মা সম্বন্ধে, সকলে সমমত প্রচার করেন নাই, ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন মত হইলেও এই সকল মত এত উচ্চ, এত গভীর, এত মনোহর, যে তাহার তুলনা ও বর্ণনা হয় না।

অন্যান্য দর্শন অপেক্ষা ভারতবর্ষে বেদান্ত দর্শনের অধিক আদর হইয়াছিল ও এবং এখনও আছে। আজও যে সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৈদান্তিক। প্রকৃতই ঈশ্বরের স্বরূপ, পরমাত্মা, মানবাত্মা ও জগতের কারণ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বেদান্ত দর্শন যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তেমন সুন্দর, গভীর ও উচ্চ মত এখনও কোথায়ও প্রচারিত হয় নাই। একজন বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"বেদান্ত দর্শন হিন্দুদর্শন শাস্ত্রের ধর্ম্ম; কেবল ইহাই কেন,—ইহাকে দার্শনিক মাত্রেরই ধর্ম্ম বলা যায়।" ইহা অপেক্ষা বেদান্ত দর্শনের আর অধিক প্রশংসা কি হইতে পারে? ইহাপেক্ষা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দর্শন আর নাই, আর হইবে কিনা তাহাও আমরা বলিতে পারি না, হইবে যে ইহারও কোন আশা নাই।

ব্রহ্মজ্ঞানরূপ যে আগুণ বেদ প্রজ্জ্বলিত করিয়া গিয়াছিলেন আরণ্যক ও উপনিষদ সেই অগ্নিকে আরও প্রজ্জ্বলিত করেন; পরে মহর্ষীগণ নিজ নিজ গবেষণা ও চিন্তারূপ ঘৃত সেই উজ্জ্বল অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া এই অগ্নিকে ভারতময় ব্যপ্ত করিয়া গিয়াছেন। বেদের আগুণ বেদান্ত দর্শনের ঘৃত সংযোগে জগতে ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার করিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্মের ন্যায় দার্শনিক ধর্ম্ম আর নাই, কখনও কোথায়ও আর হইবেও না।

আরও একটী কথা এই স্থানে বলা আবশ্যক। বেদান্ত দর্শনের প্রথমে "মায়াবাদ" ছিল না। বেদান্ত বলিতেন, "ঈশ্বরই কেবল এক মাত্র সত্য।" জগত যে মিথ্যা এ কথা বেদান্ত বলেন নাই, কিন্তু ক্রমে এই মতই ইহাতে সংযুক্ত হইল। বেদান্ত বলিলেন, "এ জগত মিথ্যা, কেবলই মায়া। এই মায়া কাটিলেই মুক্তি।"

এতদ্ব্যতীত আর একটী মত বেদান্তে পরবর্ত্তীকালে সংযুক্ত হয়; ইহাকে "ভক্তিবাদ" বলা যায়। বেদান্তের মূল বিষয় জ্ঞান, কিন্তু পরে "ভক্তিবাদ" সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে বলা হয়, "ভক্তিতেও মুক্তি হয়, ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা হইলে মুক্তি লাভ ঘটে।" দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হয়,—এই দুইটী মত পরবর্ত্তী সময়ে বেদান্ত দর্শনে সংযুক্ত হইয়াছে।

এই বেদান্ত ধর্ম্ম আরও একটী বিশেষ কারণে অতিশয় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য ভারতে আবির্ভূত হইয়া বেদান্ত ধর্ম্ম আরও অধিকতর প্রচলিত করিলেন। এ পর্য্যন্ত ভারতে যত হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন,

তাহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মহা পণ্ডিত, মহাজ্ঞানী, মহা শাস্ত্রজ্ঞ, মহামনিষী ব্যক্তি আর কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব না হইলে বেদান্ত ধর্ম্মের এত প্রাদুর্ভাব ও প্রাধান্য এদেশে হইত না; তাঁহার ন্যায় মহাত্মার হস্তে বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচারের ভার পতিত হওয়ায় এক সময়ে বেদান্ত ধর্ম্ম সমস্ত ভারতের গৃহে গৃহে ব্যপ্ত হইয়াছিল।

এই সকল কারণে বেদান্ত ধর্ম্মের প্রদুর্ভাব হওয়ায় আর্য্য সমাজে দিন দিন সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যাঁহারা অরণ্যে গমন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন না, যাঁহারা গৃহে রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও এই অপূর্ব্ব দার্শনিক ধর্ম্মের ছায়া পতিত হইল। পূর্ব্বে এদেশে যেরূপ নীতিজ্ঞান ছিল, সে সময়ে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। লোকে ন্যায় অন্যায় কার্য্য বুঝিয়া সর্ব্বদা ন্যায় ও ভাল কার্য্য করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এক-দিকে যেরূপ এই ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অপর দিকে আবার কুলোক বেদান্তের অর্থ কুভাবে লইয়া কুকার্য্যে বিলীন হইতে লাগিল! তখন বেদান্তের ভাব গৃহীকে বুঝাইবার আবশ্যক হইল; পূর্ব্বে যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অরণ্যে যাইতেন, তাঁহারাই বেদান্ত পাঠ করিতেন ও বেদান্তের পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সাধন করিতেন। ঋষিগণ এ ধর্ম্মকে কঠিন বুঝিয়া জন সাধারণকে এ ধর্ম্ম বলিতেন না, কিন্তু ইহাতে সমাজে পাপের বৃদ্ধি ও সন্ন্যাস বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া এই ধর্ম্ম গৃহীকে শিক্ষা দেওয়ারও প্রয়োজন হইল। তাই ভগবদ্গীতা রচিত ও প্রচারিত হইল।

যে বৈরাগ্য ভাব আর্য্য সমাজে ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হইতেছিল, বেদান্ত দর্শন প্রাচারিত হইলে সেই বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস ভাব আর্য্য সমাজে আরও অধিক প্রাদুর্ভাব লাভ করিল। অনেকেই বেদান্ত মতে উন্মত্ত হইয়া গৃহ সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যে যাইয়া সাধনায় নিযুক্ত হইলেন; এই ধর্ম্মভাব আর্য্য সমাজে দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিল। তাহাই গীতা রচিত হইল।

ভগবদ্গীতা।

এরূপ ধর্ম্ম পুস্তক জগতে আর নাই। এরূপ জ্ঞানময়, ধর্ম্মময়, ভাবময় পুস্তক আর কোন দেশে কখনও লিখিত ও প্রচারিত হয় নাই। পুস্তকের মধ্যে গীতা প্রধান পুস্তক, ধর্ম্ম জগতে আলোকদায়ী পূর্ণ চন্দ্র। এখানি মহাভারতের অংশ কিনা তাহা নিশ্চিত বলা যায় না, সম্ভবমত তাহা নহে। যাহাই হউক, বেদান্ত দর্শনের বহু পরে, মহাভারত প্রচারের সমসম কালে অথবা পরে, যে এই মহা পুস্তক রচিত হইয়াছিল সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই।

গৃহীকে বেদান্ত ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই গীতার উদ্দেশ্য, যদিও এ খানি বহু পরবর্ত্তী সময়ে রচিত ও প্রকাশিত, তত্রাচ বেদান্ত দর্শনের একরূপ অংশ বলিয়াই আমরা এখানির আলোচনা এই খানেই করিব।

গীতায় সংসার ও সন্ন্যাস একত্র সম্মিলিত করা হইয়াছে গীতায় সাধকের জ্ঞান ও ভক্তের প্রেম একত্রিত হইয়াছে, গীতায় জ্ঞান মার্গ ও ভক্তি মার্গের সংযোজন ঘটিয়াছে,

গীতায় নগর ও অরণ্যের বিবাহ হইয়াছে, গীতায় অরণ্যের জ্ঞান ও সংসারের প্রেম পূর্ণ ভাবে আখ্যাত হইয়াছে; এমন সুন্দর, এমন মনোহর, এমন অতুলনীয় গ্রন্থ এ সংসারে আর নাই। যিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তিনি ধন্য। গ্রন্থকার নিজ নাম প্রচার করেন নাই, স্বয়ং জনার্দ্দন, যিনি ভগবানের পূর্ণ অবতার বলিয়া বিদিত, তিনিই এই গীতার মধুময় উপদেশ সকল প্রদান করিতেছেন। সত্যই একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, এ রূপ উচ্চ, এরূপ সুন্দর, এরূপ কল্পনাতিত উপদেশ স্বয়ং ভগবান ব্যতিত আর কাহারও মুখ হইতে প্রকাশিত হইতে পারে না। মানুষের কণ্ঠ হইতে কি এ রূপ উপদেশ কখনও প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। মানব জীবনের মূল ধর্ম্ম মানব যদি স্বয়ং বুঝিতে পারিবে, তবে মানবে ও ভগবানে পার্থক্য কি? মানবের দ্বারা এরূপ উপদেশ প্রদান সম্ভব নহে; বিশেষতঃ এ পর্যান্ত অনেকানেক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অনেকানেক উচ্চ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু গীতার ন্যায় উপদেশ এবং গীতায় যে রূপ মানবাত্মার উদ্ধারের ও মুক্তির উপায় বিষদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তেমন তাঁহাদের কেহই পারেন নাই। যদি ইহাই হয়, তবে ভগবান ব্যতিত গীতা আর কে বিবৃত করিতে সক্ষম?

এক্ষণে আমরা গীতার মুল বিষয়টী অতি সঙ্ক্ষেপে বলিব। মহা বিস্তৃত কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর;—অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী উভয় দিকে সমর সজ্জায় দণ্ডায়মান। এক দিকে পিতা, অপর দিকে পুত্র; একদিকে জ্যেষ্ঠ, অপর দিকে কনিষ্ঠ; একদিকে গুরু, অপর দিকে শিষ্য; আত্ম-বিগ্রহে কুরু পাণ্ডব আত্মজ্ঞান হারাইয়া

পরস্পরে পরস্পরের রক্ত পাত করিবার জন্য ব্যগ্র। এই সময়ে সেনাপতি অর্জ্জুন, তাঁহার সারথি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুন যুদ্ধ ক্ষেত্রে গুরুজনকে দেখিয়া তাঁহাদের রক্তপাত করিতে হইবে ভাবিয়া গাণ্ডিব পরিত্যাগ করিলেন; বলিলেন, "সখে, আমার যুদ্ধে কাজ নাই। আমার রাজ্য সিংহাসনেও কাজ নাই। আমি গুরুজনকে হত্যা করিয়া, শত সহস্র রমণীকে পিতা পুত্র স্বামী ভ্রাতা শূন্যা করিয়া, অনাথিনী করিতে পারিব না; ইহাপেক্ষা অন্যায় কাজ কি হইতে পারে?" তখন স্বয়ং জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। বেদান্তের মূল মন্ত্র সকল অগ্রে বলিলেন; বলিলেন, "এ সংসারে কেহ মরে না। কেহ বাঁচে না, সংসারে বাঁচা মরা দুই নাই। তবে জীবন মৃত্যু কি? তোমার যে কর্ত্তব্য কাজ তাহাই তুমি কর। তুমিও কাহাকে মারিতে পার না, অপর কেহই তোমাকে মারিতে পারে না। তবে আর এ সকল ভাবিতেছ কেন, নিজ কর্ত্তব্য কাজ কর।"

কিন্তু এ কথায় অর্জ্জুনের প্রাণে সন্তোষ জন্মিল না, তিনি বলিলেন, "সখে, এ জ্ঞান কিসে হইতে পারে? সাধারণ লোকের মনে এ ব্রহ্মজ্ঞান নাই। মানব জীবন মায়াময়, তাহাই সকলে ভেদাভেদ দেখে। এ জ্ঞান হয় কিরূপে তাহাই আমাকে বল।" তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান বিষদরূপে বুঝাইয়া দিয়া এই জ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ পাতঞ্জলের অষ্ট সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে তো সেই অরণ্যে গিয়া যোগ সাধনা করিতে হয়, সংসারে থাকিয়া কি রূপে এ জ্ঞানলাভ সম্ভব, তাহা হইলেতো অর্জ্জুনের পক্ষে

যুদ্ধাদি না করিয়া তৎক্ষণাৎ কুরুক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া নৈমিশারণ্যে প্রবেশ কর্ত্তব্য! তাহাই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি কর্ত্তব্য কাজ কর, কিন্তু কার্য্যে কামনা করিও না অর্থাৎ যাহা করিবে, নিষ্কাম ভাবে কর।" ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আমিত্ব জ্ঞান একেবারে থাকে না, আমিত্ব জ্ঞান না থাকিলে কোন বিষয়েই কোন কামনা একেবারে রহে না, রহিতে পারে না। আমিত্ব জ্ঞানে কামনার জন্ম; যদি আমিত্ব জ্ঞানই না থাকিল, তবে কামনা কোথা হইতে আসিবে? ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে এই নিষ্কাম ভাব আইসে। সুতরাং গৃহীর পক্ষে যোগসাধনা অসম্ভব বলিয়া প্রথম হইতে নিষ্কাম ভাবে সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে চেষ্টায় ও যত্নে সকল কার্য্যে নিষ্কাম ভাব আসিবে। একবার নিষ্কাম ভাব আসিলে তখন আর কোন কার্য্যেই ভাল মন্দ জ্ঞান থাকিবে না। তখন কোন কাজই আর মন্দ নহে, কোন কাজই আর ভাল নহে। তাহাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, "তুমি কামনা শূন্য হইয়া সকল কার্য্য কর; যদি এই কামনাশূন্য-ভাব তোমার হৃদয়ে আইসে, তবে আর তোমার কৈবল্য মুক্তি লাভ হইতে বিলম্ব হইবে না।"

কেবল মাত্র নিষ্কাম হইতে চেষ্টা করিলে কি নিষ্কাম হওয়া যায়? আমিত্ব জ্ঞান সম্পূর্ণ না লোপ পাইলে কোন মতেই নিষ্কাম হওয়া যায় না, ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে নিষ্কাম হইতে পারা যায় না। কিন্তু সংসারীর পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সহজ নহে, ইহার উপায়ও নাই; তাহাই "ভক্তিবাদ"। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "ভক্তি হইতে নির্ভরতা জন্মে, সম্পূর্ণ নির্ভরতা হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই নিষ্কাম জ্ঞান আইসে।" গীতার

মন্ত্র এই।—এই সকল বিষয় গীতারচয়িতা অতি সুন্দর, অতি সুললিত, অতি মনোহর, অতি জ্ঞানময় ভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। এখানির কবিত্ব ভাবও অতি মনোরমা,—অর্জুন ব্রহ্ম দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণ বিরাট মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখা দিলেন; তাহাতে ভয়ানক ভাব ও মধুরতা সকলই আছে। সেই বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া অর্জুন সভয়ে বলিলেন, "সখে, তোমার ও রূপ দেখিয়া আমার কিছু নাই, তুমি তোমার সেই সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ কর।" তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার তাঁহার সেই অপরূপ বৃন্দাবন-গোপিনী-মোহন, রাধার মন-প্রাণ-হরণ শ্যাম মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। জ্ঞানে পরমের বিরাট মূর্ত্তি দেখা যায়, ভক্তিতে তাঁহার সুন্দর কমনীয় মনপ্রাণহরণ মূর্ত্তি দেখা যায়। এমন সুন্দর ভাব আর কোথায়? এমন মনমোহন হৃদয়ানন্দদায়ক ভাব আর কোথায়? জ্ঞানেও ব্রহ্ম দর্শন হয়, ভক্তিতেও ব্রহ্ম দর্শন হয়; কিন্তু মন হও, নিষ্কাম হইলে ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না, তখন কেবলই সোহহং জ্ঞান জন্মে। কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, সকলেই এই মহান ধর্ম্মে দিক্ষিত হইয়া কৈবল্য মুক্তি লাভ করিতে পারেন।

আর কয়েকটী কথা এই স্থানে বলা আবশ্যক। বেদ হইতে বেদান্ত কালের মধ্যে কয়েকটী শব্দ ঈশ্বরবাচক বলিয়া সমাজে হইয়াছিল। ইহার মধ্যে "ওঁ" শব্দ প্রধান। উপনিষদ কালের প্রারম্ভে ভগবানের তিনটী প্রধান গুণ আছে বলিয়া ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। উপনিষদকার ও দার্শনিকগণ বলিয়া যান, "সত্ব, রজ ও তম" পরব্রহ্ম এই তিন গুণ বিশিষ্ট। এই তিন গুণে তিনি জগতে ব্যাপ্ত। "ওঁ" শব্দে এই তিন গুণ

ব্যক্ত হয়,—অতি সংক্ষেপে ভগবানের এরূপ সুন্দর নাম আর হইতে পারে না। পরে পুরাণকালে এই তিন গুণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নামে বিদিত হয়েন। বেদান্ত এই তিন গুণ স্বীকার করিলেও বেদান্ত ভগবানকে প্রধান দুইটী বিভাগ করিয়াছেন, ইহার একটী প্রকৃতি, অপরটী পুরুষ। এই প্রকৃতি পুরুষ-ব্যঞ্জক চিহ্ন ই পরে শিবলিঙ্গরূপে ভারতে পূজিত হয়েন।

যত প্রকারে ও যত ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া মানবের পক্ষে সম্ভব, যত প্রকারে ও যে ভাবে মানবের দুঃখ যাইয়া চির আনন্দ লাভের সম্ভাবনা, হিন্দু শাস্ত্রকারগণ নিজ নিজ অসীম গবেষণার বলে তাহার সমস্তই একরূপ স্থির করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের জন্য কোন দেশে এত মহা মহা পণ্ডিত নিজ নিজ মস্তিষ্ক আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্য মধ্যে বাস করিয়া আলোচিত করেন। তাহাই ভারতে যাহা হইয়াছে, আর কোথায়ও তাহা হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম

উপরে ভারতীয় জ্ঞানের উন্নতির ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে এই জ্ঞানের যে আর উন্নতি হইতে পারে, তাহা আমাদের হৃদয়ে একেবারেই আইসে না। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তা যতদূর উচ্চতম হওয়া সম্ভব, তাহার সমস্তই দর্শনে, বিশেষতঃ বেদান্ত দর্শনে, হইয়া গিয়াছে; ইহাপেক্ষা আর অধিক কিছু হইতে পারে, তাহা মানব বুদ্ধিতে আইসে না।

কিন্তু পুণ্যভূমি ভারত—ভারতের মৃত্তিকা ধন্য, ভারতের ঋষিগণ ধন্য, ভারতীয় শাস্ত্র ধন্য, আর আমরা যে এই পুণ্যবতী ভারতে জন্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, তাহার জন্য আমরা ধন্য!

ভারতে ব্রহ্মজ্ঞানের শেষ বেদান্ত ও গীতায় হইল না। ভারতে এই সময়ে এক মহাত্মা জন্মিলেন, এ পর্য্যন্ত ভারতে যে জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। উপনিষদ, দর্শন, বেদান্ত, মানব দুঃখের অপনয়ন করিবার উপায় যাহা যাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি দেখিলেন,—উপনিষদ ও দর্শন বহু চেষ্টায়ও মানবজাতির দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হয়েন নাই, আর যে কখনও হইবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই। উপনিষদ ও দর্শনে পূর্ব্বে যে ভাব ছিল, সংসারে যে দুঃখ কষ্ট ছিল, তিনি যে সময়ে জন্মিলেন, সে সময়েও ঠিক তেমনই সেইরূপ দুঃখ কষ্ট রহিয়াছে।

কপিলবস্তুর রাজকুমার শাক্য সিংহ রাজ পথে ভিখারী দেখিয়া, রোগী দেখিয়া ও মৃতদেহ দেখিয়া, সংসার দুঃখময় ভাবিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। সংসারে যে সুখ নাই, সংসার যে দুঃখের অগ্নিতে দগ্ধিভূত হইতেছে, গৃহে গৃহে যে হাহাকার উঠিতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ও প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল, তিনি এই দুঃখ দূর করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য রাজ প্রাসাদের অতুলনীয় সুখ, ঐশ্বর্য্য, ধন, জন, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রথমে উপনিষদ, দর্শন প্রভৃতি মহর্ষীগণের নিকট পাঠ করিলেন,

জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত যে চেষ্টা হইয়াছে তাহা কি, বিশেষরূপে এ সকল অবগত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সন্তোষ জন্মিল না। তিনি বুঝিলেন যে এ পর্য্যন্ত যে যে উপায় এ সম্বন্ধে উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নহে, এতদ্ব্যতীত আর কিছু না হইলে মানবের দুঃখ দূর হইবার কোনই উপায় নাই। তখন শাক্য সিংহ গভীর বন হইতে গভীরতম অরণ্যে প্রবিষ্ঠ হইয়া এই জগতের দুঃখ নিবারণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কত বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এই চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? বৃহৎ বৃক্ষের নিম্নে একাসনে বসিয়া গভীরতম চিন্তায় তিনি মগ্ন হইয়া রহিলেন,—বহু বৎসর পরে তিনি সেই মহা সমাধি হইতে উঠিলেন। এতদিনে তিনি সেই "আলোক" পাইয়াছেন। যে জ্ঞান লাভ করিলে মানবজাতি দুঃখের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, এত দিনে তিনি সেই আলোক দেখিয়াছেন। যে উপায়ে মানবজাতি জগতের অসহনীয় ক্লেশ হইতে মুক্ত হয়, এত দিনে তিনি সেই অপূর্ব্ব উপায় জানিয়াছেন। তখন তিনি মানব জাতিকে এই মহান উপায় জানাইবার জন্য প্রচারে বহির্গত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার ধর্ম্মে দিক্ষিত হইল, বুদ্ধ নাম গ্রামে গ্রামে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম সমস্ত ভারত প্লাবিত করিয়া পূর্ব্বে চিন জাপান, পশ্চিমে পারস্য তাতার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইল। এখনও বৌদ্ধধর্ম্ম জগতের তৃতীয়াংশ লোক অবলম্বন করিয়া আছে।

মহা চিন্তায় তিনি কি আবিষ্কার করিলেন? তিনি দুইটী মাত্র বিষয় জগতে প্রচার করিয়াছেন,—একটী "নির্ব্বান", অপরটী

"অহিংসা পরম ধর্ম্ম।" একটী অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীর জন্ত, অপরটী সংসারবাসী গৃহীর জন্ত। একটী ক্রীয়া, অপরটী ক্রীয়াশূণ্যতা। সংসারে থাকিলে ক্রীয়া কর। কিন্তু ক্রীয়া করিলেও সেই ক্রীয়ার মূলমন্ত্র হউক,—"অহিংসা পরম ধর্ম্ম।" ইহার অর্থ কেবল প্রাণীহত্যা নহে,—যাহাতে নিজের ও পরের হিংসা অর্থাৎ ক্ষতি হয়, এরূপ যাহাতে না হয় তাহাই কর, কেবল সেইরূপ ক্রীয়াই কর। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই করিও না। ইহাই গৃহীর ধর্ম্মের সার। বেদ, উপনিষদ, দর্শন সমস্ত গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দেও। আর যদি কৈবল্য মুক্তির অভিলাসী হও, তবে চিন্তা কর, ধ্যান কর, সাধনা কর; ক্রমে এই সকল করিলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইবে। কিন্তু তাহাও মুক্তি নহে, কারণ তাহাতেও অস্তিত্ব জ্ঞান থাকিতেছে; তোমার অস্তিত্ব থাকিলে ক্রীয়া থাকা সম্ভব, ক্রীয়া থাকিলে সুখ দুঃখ থাকা সম্ভব, তাহাই বুদ্ধ বলিলেন, "একেবারে অস্তিত্ব নষ্ট করিবা ফেল। যখন কোন জ্ঞানই থাকিবে না, যখন না ব্রহ্ম না আমিত্ব রহিবে, তখনই মুক্তি; তখনই নির্ব্বান; এতদ্ব্যতীত একেবারে উদ্ধারের আর উপায় নাই।"

বলিতে ইচ্ছা হয়, ইহাকে নাস্তিকতা বলুন, বলিতে ইচ্ছা হয়, ইহাকে "কিছুই নহে" বলুন, কিন্তু জ্ঞানের এই চরম, জ্ঞানের এই শেষ; ইহাপেক্ষা আর কিছু হয় না, হইতেও পারে না।

এই অতি উন্নত, এই অসীম জ্ঞান-ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়া প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিল,

কিন্তু এ ধর্ম্ম কি সকলের উপযুক্ত, এ ধর্ম্মে কি সকলের মুক্তি হওয়া সম্ভব? জ্ঞান দুর্ল্লভ পদার্থ, জ্ঞান সহজে মিলে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই বৌদ্ধ ধর্ম্মে নানা শাখা প্রশাখা জন্মিল, কত লতা গুল্ম বেড়িল, দেশে অনাচার অত্যাচার আসিল। তাহাই আবার মানব জাতিকে রক্ষা ও উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি পুনরায় দেশে হিন্দুধর্ম্মের পূর্ব্ব ক্রীয়া কলাপ সংস্থাপন করিলেন; জ্ঞান সকলের জন্য নহে জানিয়া তিনি ভারতে কল্পনার ও ভক্তির তরঙ্গ তুলিলেন,—তাহার ফল পুরাণ। আমরা এক্ষণে দ্বিতীয়াংশে এই পুরাণের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

প্রথমাংশ সমাপ্ত।

পৌরাণিক কাল।

শাস্ত্র মহিমা

(দ্বিতীয়াংশ।)

পুরাণ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পুরাণই আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি। কেবল ধর্ম্মের কেন, পুরাণই হিন্দুর আচার ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি সাংসারিক জীবনের মূল। কেবল ইহাই নহে, পুরাণই হিন্দুর প্রাচীন ভারতের এক মাত্র ইতিহাস। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমরা যে কোন কাজ করি; জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমরা যে কোন উৎসব বা ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকি; তাহার সকলই আমরা পুরাণ হইতে শিখিয়াছি; কিন্তু কেবল ইহাই নহে, আজও যে হিন্দুজাতি দয়া, মায়া, আতিথ্য, সতিত্ব, সাহস, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সকল প্রকার সদ্‌গুণের জন্য জগতে বিখ্যাত, তাহাও আমরা এই পুরাণ হইতে শিখিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা পুরাণের সুশীতল সমীরণ সেবন করিয়াই জীবন ধারণ করিতেছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পুরাণ আমাদের জীবনের একরূপ মূলভিত্তি হইলেও এই পুরাণ কি, তাহা আমরা কেহই জানি

না। পুরাণ পাঠ করা দূরে থাকুক, এমনকি পুরাণের আকার কিরূপ তাহা দেখা পর্য্যন্ত দূরে থাকুক, ভারতে কয় খানি পুরাণ আছে ও তাহাদের নাম কি, তাহাও আমরা কেহ জানি না। সকলের পক্ষে সকল পাঠ করিবার সময় ও সুবিধা হয় না, কিন্তু এই পুরাণ ব্যাপারটী যে কি, তাহা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

সংখ্যা।

সকলেই বোধ হয় শুনিয়াছেন যে পুরাণ "অষ্টাদশ" অর্থাৎ আঠার খানি। পুরাণ প্রধানতঃ আঠার খানি, এরূপ বলা যাইতে পারে; কিন্তু আঠার খানির অধিক আর যে পুরাণ নাই, ইহা যেন কেহ ভাবিবেন না। পুরাণ ও উপপুরাণ সংখ্যায় এত অধিক যে একত্র করিয়া একস্থানে রাখিলে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় হইয়া পড়ে। তবে দুঃখের বিষয়, ভারতে মুদ্রন যন্ত্রের প্রচলন না থাকায় বহু সংখ্যক পুরাণ ও উপপুরাণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে নিম্ন লিখিত পুরাণ ও উপপুরাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) বিষ্ণু (২) ভাগবত (৩) নারদীয় (৪) গরুড় (৫) পদ্ম (৬) বরাহ (৭) ব্রাহ্ম (৮) ব্রাহ্মাণ্ড (৯) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত (১০) মার্কণ্ডেয় (১১) ভবিষ্য (১২) বামন (১৩) শিব (১৪) লিঙ্গ (১৫) স্কন্দ (১৬)-অগ্নি (১৭) মৎস্য (১৮) কূর্ম্ম (১৯) দেবী ভাগবত (২০) বহ্নি (২১) আদি (২২) মুদ্গল (২৩) কল্কি (২৪) ভবিষ্যোত্তর (২৫) বৃহদ্ধর্ম্ম প্রভৃতি।

এতব্যতীত আরও কতক গুলি পুস্তক পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়; কিন্ত প্রকৃত পক্ষে ইহারা কখনও পুরাণের অন্তর্গত ছিল না। সম্ভবমত এই সকল পুস্তক বহু পরবর্ত্তী সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। তবে এই সকল গ্রন্থকার স্বর পুস্তকের আদর বৃদ্ধি হইবে আশায়, ইহাদিগকেও পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

কাশী খণ্ড, উৎকল খণ্ড, কুমারিকা খণ্ড, ভীম খণ্ড, বেরা-খণ্ড প্রভৃতি পুস্তক স্কন্দ পুরাণের খণ্ডবিশেষ বলিয়া বিদিত আছে। কিন্ত একটু বিশেষ করিয়া এই সকল পুস্তক দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা পুরাণের অন্তর্গত পুস্তক নহে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার এই সকল পুস্তক রচনা করিয়া ইহা-দিগকে পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন, অথবা সময়ে লোকে এ গুলিকেও পুরাণ অন্তর্গত কলিয়া বিবেচনা করিয়াছে।

দেব, দেবী, তীর্থ ও ধর্ম্মাচরণ প্রভৃতির মাহাত্ম্য প্রকাশক বহু সংখ্যক "মাহাত্ম্য" নামধেয় পুস্তক এদেশে প্রচারিত আছে। ইহারাও ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে ইহারা পুরাণ নহে। অগ্নিস্বর মাহাত্ম্য, অঞ্জ-নাদ্রি মাহাত্ম্য, অনন্তশয়ন মাহাত্ম্য, অঙ্গিপুর মাহাত্ম্য, অর্জ্জুন পুরাণ মাহাত্ম্য, কঠোর গিরি মাহাত্ম্য, ও তুঙ্গভদ্রা মাহাত্ম্য অগ্নি পুরাণের অন্তর্ভূত বলিয়া বিবেচিত হয়। এই রূপে অর্জ্জুন পুরাণ মাহাত্ম্য ও কাবেরী মাহাত্ম্য স্কন্দ পুরাণের অংশ বিশেষ বলিয়া, ইন্দ্রাবতার ক্ষেত্র মাহাত্ম্য, কদম্বল মাহাত্ম্য, কমলায়ল মাহাত্ম্য,

কলনক্ষেত্র মাহাত্ম্য, কাণ্ডেশ্বর মাহাত্ম্য, কার্ত্তিক মাহাত্ম্য, কুমারক্ষেত্র মাহাত্ম্য, কুঞ্জ মাহাত্ম্য, গোকর্ণ মাহাত্ম্য, চিদীশ্বর মাহাত্ম্য, ঐরাবত ক্ষেত্র মাহাত্ম্য, এবং ক্ষীরিজীবন মাহাত্ম্য, ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের অন্তর্ভূত বলিয়া খ্যাত। এইরূপ আরও বহু সংখ্যক পুস্তক পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত হইয়াছে মাত্র, পুরাণের সহিত ইহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই।

পুরাণ।

এই পুস্তকসমুদ্র মধ্য হইতে কেবল মাত্র আঠার খানি বাছিয়া লইয়া এই কয় খানিকে প্রধান পুরাণ বলিয়া গণিত করা হইয়াছে। তবে এ বিষয়েও মত ভেদ আছে। সকল পুরাণের প্রথমেই প্রধান অষ্টাদশ পুরাণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এক পুরাণে যে অষ্টাদশ খানির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, অপর খানিতে তাহা হয় নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শিব পুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কিন্তু নারদীয় পুরাণ প্রভৃতিতে শিব পুরাণ পরিত্যাগ করিয়া বায়ু পুরাণকে অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত করা হইয়াছে। যাহাই হউক, এক্ষণে নিম্ন লিখিত আঠার খানি পুরাণই "অষ্টাদশ পুরাণ" বলিয়া খ্যাত। যথাঃ—

(১) ব্রহ্ম (২) পদ্ম (৩) বিষ্ণু (৪) শিব (৫) ভাগবত (৫) নারদ (৭) মার্কণ্ড (৮) অগ্নি (৯) ভবিষ্য (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত (১১) লিঙ্গ

(১২) বরাহ (১৩) স্কন্দ (১৪) বামন (১৫) কূর্ম্ম (১৬) মৎস্য (১৭) গরুড় (১৮) ব্রহ্মাণ্ড।

"ব্রহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ বায়বীয়ং তথৈবচ।
ভাগবতং নারদীয়ং মার্কণ্ডেয়ঞ্চ কীর্ত্তিতে॥
আগ্নেয়ঞ্চ ভবিষ্যঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত লিঙ্গকে।
বরাহঞ্চ তথা স্কন্দং বামনং কূর্ম্ম সাংজ্ঞিকং॥
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ং তদ্বদ্ব্রহ্মাণ্ডাখ্য মিতি ত্রিষট॥"

মহাভারত।

মহাভারতকে কেহ কেহ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত এক খানি পুরাণ বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মহাভারত পুরাণের অন্তর্ভূত পুস্তক নহে। এ খানিকে মহাকাব্য বলিয়া শাস্ত্রকারগণ গণনা করিয়া গিয়াছেন মহাভারতের সহিত পুরাণের বিশেষ সাদৃশ্য থাকিলেও এখানি পুরাণ নহে।

আকার।

অনেকের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষে অধিক পুস্তক রচিত হয় নাই; এই অষ্টাদশ পুরাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহাদের এ ভ্রম দূরীভূত হইবে। উপপুরাণ ও খণ্ডপুরাণ অথবা পুরাণের অন্তর্গত পুস্তক সকলের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল এই অষ্টাদশ খানি পুরাণ একত্র করিলে একটী বৃহৎ স্তূপ হয়। এই অষ্টাদশ পুরাণের কোন খানিতে কত শ্লোক আছে, তাহাই আমরা নিম্নে লিখিতেছি।

নাম			শ্লোক সংখ্যা।
(১) ব্রহ্ম পুরাণ	...	..	দশ সহস্র।
(২) পদ্ম পুরাণ	...	...	পঞ্চান্ন সহস্র।
(৩) বিষ্ণু পুরাণ	..	..	তেত্রিশ সহস্র।
(৪) বায়ু পুরাণ	...	..	চব্বিশ সহস্র।
(৫) ভাগবত পুরাণ	..	...	আঠার হাজার।
(৬) নারদ পুরাণ	..	..	পঁচিশ সহস্র।
(৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণ	..	..	নয় সহস্র।
(৮) অগ্নি পুরাণ	..	..	পনের সহস্র।
(৯) ভবিষ্য পুরাণ	...	..	চোদ্দ সহস্র।
(১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ	...	...	আঠার হাজার।
(১১) লিঙ্গ পুরাণ	..	...	এগার সহস্র।
(১২) বরাহ পুরাণ	...	..	চোদ্দ সহস্র।
(১৩) স্কন্দ পুরাণ	...	...	একাশি হাজার।
(১৪) বামন পুরাণ	...	..	দশ সহস্র।
(১৫) কুর্ম্ম পুরাণ	...	..	সতের হাজার।
(১৬) মৎস্য পুরাণ	..	...	চোদ্দ হাজার।
(১৭) গরুড় পুরাণ	...	...	উনিশ হাজার।
(১৮) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ	..	...	বার হাজার।

মোট তিন লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার শ্লোক এই আঠার খানি পুরাণে আছে। সাধারণতঃ আঠার খানি পুরাণে ৪ লক্ষ শ্লোক আছে বলিয়াই বিশ্বাস। যদি গড়ে দশটী করিয়া শ্লোক এক এক পৃষ্ঠায় ছাপা যায়, তাহা হইলে সমস্ত শ্লোক গুলি ছাপিতে চৌত্রিশ হাজার নয় শত পৃষ্ঠা প্রয়োজন হয়। পাঁচ

শত পৃষ্ঠা করিয়া যদি এই পুস্তকের এক এক খণ্ড করা যায়, তাহা হইলে বড় বড় ৭০ খানি পুস্তক হয়; এবং এই একখানি অষ্টাদশ পুরাণের মূল গ্রন্থ রাখিতে দুইটী বড় বড় আলমারির আবশ্যক হয়। আর যদি এই অষ্টাদশ পুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে হয়, তবে ইহার আকার মূলের চতুর্গুণের কম হয় না। তাহা হইলে বড়বড় পাঁচশত পৃষ্ঠার ২৮০ খানা পুস্তক হয় ও ৮টী বড় বড় আলমারি এই পুস্তক রাখিবার জন্য প্রয়োজন হয়। যদি মূল গ্রন্থ ও অনুবাদ এক ব্যক্তি পড়িতে আরম্ভ করেন ও প্রত্যহ পঞ্চাশ পৃষ্ঠা করিয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহার এই পুস্তক পাঠ করিয়া শেষ করিতে নয় বৎসর আট মাস দশ দিন লাগিবে। সুতরাং ভারতবর্ষে যে বহু পুস্তক রচিত হয় নাই, ইহা যেন কেহ মনে করিবেন না। ভারতে যত পুস্তক রচিত হইয়াছে জগতের আর কোন প্রদেশেই তত পুস্তক রচিত হয় নাই। উপপুরাণ সংখ্যায় ও আকারে অষ্টাদশ পুরাণের চতুর্গুণ হইবে। সুতরাং এক পুরাণ লইয়াই ভারতে কি ভয়াবহ পর্ব্বত প্রমাণ পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন। কি কারণে যে এই সকল পুস্তক আজও মুদ্রিত হয় নাই, তাহাও ইহাদের আকার দেখিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। কেবল অষ্টাদশ পুরাণ মুদ্রিত করিতেই সহস্র সহস্র মুদ্রার আবশ্যক।

কেহ যেন মনে করিবেন না যে পুরাণের শ্লোক সংখ্যা আমরা স্বইচ্ছায় বৃদ্ধি করিয়া পাঠকদিগকে বিস্মিত করিতেছি; প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। শ্রীমদ্ভাগবতীয় দ্বাদশ স্কন্ধে পুরাণের শ্লোক সংখ্যা বিবৃত আছে, যথা—

"ব্রহ্মং দশসহস্রানি পদ্মং পঞ্চোনা ষষ্টব।
শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশচ্চতুর্বিংশতি শৈবকং॥
দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চ বিংশতি।
মার্কণ্ডং নববাহ্নস্তু দশপঞ্চ চতুঃ শতং॥
চতুর্দ্দশং ভবিষ্যং স্যাত্তথা পঞ্চ শতানিচ।
দশাষ্টৌ ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গ মেকাদ শৈবতু॥
চতুর্বিংশতি বারাহ মেকাশিতি সহস্রকং।
স্কান্দং শতং তথচৈকং বামনং দশ কীর্ত্তিতং॥
কৌর্ম্মংশস্তু দশাখ্যাতং মাৎস্যং তচ্চ চতুর্দ্দশ।
একোনবিংশ সৌপর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশৈবতু॥

সময়।

কোন সময়ে কোন পুরাণ রচিত হইয়াছে, তাহা স্থির করা এক্ষণে প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তবে এ সম্বন্ধে যত দূর অবগত হইতে পারা গিয়াছে, তাহাই আমরা নিম্নে লিখিতেছি। ব্রহ্ম পুরাণে শিব, সূর্য্য ও জগন্নাথের মন্দিরের উল্লেখ আছে। এই সকল মন্দির কোন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা এই সকল মন্দিরে খোদিত আছে। ইহাদ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, শিব মন্দির খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দিতে, জগন্নাথের মন্দির দ্বাদশ শতাব্দিতে ও সূর্য্য মন্দির ত্রয়োদশ শতাব্দিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ব্রহ্ম পুরাণে যখন এই তিন মন্দিরেরই উল্লেখ আছে, তখন নিশ্চয়ই এই পুরাণ ত্রয়োদশ শতাব্দিতে বা উহার পরে রচিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য ত্রয়োদশ শতা-

ব্দির প্রারম্ভে মুসলমানগণ ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত লুণ্ঠন করিতেছিলেন।

পদ্ম পুরাণে আমরা রামানুজ সম্প্রদায়ের বিবরণ দেখিতে পাই। রামানুজ খৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দিতে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং এই পুরাণ নিশ্চয়ই তাঁহার জন্মের পরে রচিত হইয়াছিল। তাহা হইলে এ পুরাণও মুসলমানদিগের ভারতে আগমনের পরে বা অব্যবহিত পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার বর্ণনা আছে। পাঠক গণ বোধ হয় অবগত আছেন যে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলারূপ পৌরাণিক বৃত্তান্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক সৃষ্টি। ভাগবতে রাধার নাম নাই, মহাভারতেও রাধার নাম নাই। যদি ভাগবত বা মহাভারতের সময় রাধা কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার গল্প প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই দুই পুস্তকে রাধার নামও দেখিতে পাওয়া যাইত। যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বল্লভাচার্য্য রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা ও শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পূজা পদ্ধতি প্রচার করেন। বল্লভাচারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই অতি যত্ন সহকারে ভারতবর্ষে এই মত প্রচার করিয়া ছিলেন। আমরা অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছি, খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দির মধ্যভাগে বল্লভাচার্য্য নিজ মত প্রচার করেন। তাহা হইলে এই ব্রহ্মবৈব্যর্ত্ত পুরাণ নিশ্চয়ই পঞ্চদশ শতাব্দির শেষ ভাগে অথবা ইহারও পরে রচিত হইয়াছিল। এই পুরাণের কৃষ্ণ জন্ম খণ্ডের ১২৭ অধ্যায়ে ভবিষ্যত কথনচ্ছলে ম্লেচ্ছ রাজার অধিকার, লোকের ম্লেচ্ছাচার

গ্রহণ প্রভৃতি কথারও উল্লেখ আছে। খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দির শেষ ভাগে মোগলগণ দিল্লিতে রাজত্ব করিতেছিলেন। এবং প্রায় সমস্ত ভারত মুসলমানগনের কর কবলিত হইয়াছিল।

স্কন্দ পুরাণে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের বর্ণনা আছে, সুতরাং এ পুরাণও খৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দির পরে রচিত হইয়াছে; কূর্ম্ম পুরাণে কয়েক খানি তন্ত্রের উল্লেখ আছে; তন্ত্র শাস্ত্র মুসলমানগণের ভারতে আগমনের বহু পরে রচিত, সুতরাং এ পুরাণও যে নিতান্ত অধুনিক পুরাণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ভাগবতে যবন কর্ত্তৃক সিন্ধুতট, চন্দ্রভাগ ও কাশ্মীর মণ্ড-লাধিকার প্রভৃতির উল্লেখ আছে, খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দির শেষ ভাগে মুসলমানগণ ভারত আক্রমন করেন, সুতরাং ভাগবত এই সময়ের পরে রচিত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

এই রূপে প্রায় সকল পুরাণ গুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারা যায় যে কোন খানেই ছয় শাত শত বৎসরের অধিক পুরা-তন নহে; তবে কোন কোন পুরাণের কোন কোন অংশ যে অতি প্রাচীণ তাহারও কোন সন্দেহ নাই। এই সকল পুরাণ কখন মুদ্রিত হয় নাই; পূর্ব্বে পণ্ডিতগণের মুখেমুখে ছিল, যখন ইহারা লিখিত হয়, তখন সম্ভবমত লেখক ও সম্পাদকগণ মধ্যে মধ্যে স্বকপোল কল্পিত দুই দশটী শ্লোক বাড়াইয়া দিতে ক্রুটী করেন নাই। এই রূপ বাজে শ্লোক সংযুক্ত হওয়ায় কোন পুরাণ খানি কত পুরাতন, তাহা আর এক্ষণে জানিবার কোনই উপায় নাই।

বেদব্যাস।

কথিত আছে বেদব্যাস্ অষ্টাদশ মহাপুরাণ রচিত করেন। ব্যাস ঋষি বেদ সঙ্কলন করিয়া বেদব্যাস উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বেদ সঙ্কলন ও অষ্টাদশ মহাপুরাণ রচনা একই ব্যক্তির দ্বারা কখনই সম্ভব নহে। তবে ব্যাসদেব যেরূপ নানা স্থান হইতে বেদ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া ছিলেন, সম্ভবমত অষ্টাদশ পুরাণ সম্বন্ধেও তিনি তাহাই ব্যতিত তাহার অধিক আর কিছুই করেন নাই। নানা লোকে নানা সময়ে নানা পুরাণ রচনা করিয়া ছিলেন, ব্যাসদেব সেই গুলিকে একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। হয়তো তিনি ইহা না করিলে, আজ ভারতে পুরাণেরও নাম ব্যতিত আর কিছুই থাকিত না।

পুরাণ শাস্ত্র।

এক্ষণে পুরাণ শাস্ত্র রূপে ভারতে বিদিত ও পূজিত। ইহার সত্যাসত্যের কোন প্রমাণ নাই, পুরাণের পুরাণই প্রমাণ বলিয়া হিন্দু দিগের বিশ্বাস। এই পুরাণ শ্রবন করিলে সকল শাস্ত্র শ্রবনের ফল লাভ হয় এবং ইহার ধর্ম্ম জানিলে সকল কর্ত্তাব্যাকর্ত্তব্য জানা যায়। শাস্ত্র বলেন,—

"যস্মিন শ্রুতে শ্রুতং সর্ব্বং জ্ঞাতে জ্ঞাতং কৃতে কৃতং।
বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্ম সাক্ষাৎ কারত্ব মেবাতি" ॥

এই পর্ব্বত বিশেষ অষ্টাদশ পুরাণ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করা গৃহস্থের পক্ষে এক জনেরও সম্ভব নহে; অথচ আমরা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পুরাণ আমাদের ধর্ম্মের মূল ও সামাজিক জীবনের মূলভিত্তি। কোন পুরাণে কি আছে অন্তত আমাদের সকলেরই ইহা অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। দেশের এই অভাব দূর করিবার জন্ত আমরা নিম্নে অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশ করিতেছি। এই অষ্টাদশ পুরাণের কোন খানিতে কি আছে, তাহাই লিখিত ও আলোচিত হইবে। পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহারা পুরাণ কখন পাঠ বা দর্শন না করিয়াও পুরাণোক্ত বিষয় সকলের মূল বিষয়গুলি প্রায়ই লোকমুখে শুনিয়া শুনিয়া অবগত আছেন।

ব্রহ্ম পুরাণ।

সূত ও শৌনক ঋষির কথোপকথনচ্ছলে এই পুরাণ রচিত। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত ও দশ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ।

এই দুই ভাগের নাম, (১) পূর্ব্ব ভাগ (২) উত্তর ভাগ। পূর্ব্ব ভাগে দেবতা ও অসুরগণের জন্ম ও উন্নতি বর্ণিত হইয়াছে। কিরূপে দেব ও দানবের জন্ম হইল এবং তৎপরে তাঁহারা কি করিলেন, তাহাই বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তৎপরে দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ কিরূপে জন্মিলেন, তাহাও লিখিত হইয়াছে। ইহার পর চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের বর্ণনা আছে। চন্দ্রবংশ বর্ণনাকালে শ্রীকৃষ্ণের ও সূর্য্যবংশ বর্ণনাকালে রামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে গ্রন্থকার দ্বীপ, বর্ষ, পাতাল, স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণের স্তুতিও আছে। তৎপরে পার্ব্বতীর জন্ম ও বিবাহ,

দক্ষযজ্ঞের শেষ অভিনয়ও বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কয়েকটী তীর্থ মাহাত্ম্যও লিখিত আছে, সুতরাং ব্রহ্ম পুরাণের পূর্ব্বভাগে যাহা, যাহা আছে, তাহার বোধ হয় কোনটীই পাঠকদিগের নিকট নূতন বা অবিদিত বলিয়া বোধ হইবে না। এমনকি এইটুকু অবগত থাকিলে এই পুরাণ পাঠের বিশেষ আবশ্যকতাও দেখা যায় না।

এই পুরাণের পূর্ব্বভাগ যেমন বর্ণনামূলক ও ইতিহাস-মূলক, উত্তর ভাগ সেরূপ নহে। উত্তর ভাগে ধর্ম্ম ও দর্শনের কথা আলোচিত হইয়াছে। প্রথমেই পুরুষোত্তম তীর্থের বিস্তৃত বর্ণনা, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও গুণানুবাদ। মৃত্যু, যোমরাজ্য ও পিতৃশ্রাদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কথাও লিখিত হইয়াছে। পরে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নিরূপণ, বিষ্ণু ধর্ম্মের বর্ণনা, যুগাখ্যান প্রভৃতিও আলোচিত হইয়াছে। প্রলয়েরও উল্লেখ হইয়াছে, তৎপরে যোগ, সাংখ্য, ব্রহ্মবাদ, প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের গভীর দার্শনিক ভাব সকলও বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে; ইহার মধ্যেও এমন কিছুই নাই, যাহা হিন্দুগণ জানেন না। এ সকল কথা তাঁহারা অতি শৈশব হইতেই শুনিয়া আসিতেছেন।

পদ্ম পুরাণ।

পদ্ম পুরাণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত এবং ৫৫ হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ। এই পাঁচ খণ্ডের নাম যথাঃ—(১) সৃষ্টিখণ্ড (২) ভূমি-খণ্ড (৩) স্বর্গখণ্ড (৪) পাতাল খণ্ড (৫) উত্তর খণ্ড।

স্বর্গখণ্ড।—পুলস্ত ঋষি ভীষ্মকে বলিতেছেন, এইরূপ ভাবে এই খণ্ড লিখিত। ইহাতে নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম,—পুষ্কর তীর্থের বিস্তৃত বর্ণনা ও মাহাত্ম। দ্বিতীয়,—ব্রহ্ম যজ্ঞ কিরূপে করিতে হয় তাহারই বিধি। তৃতীয়,—বেদ পাঠাদির নিয়ম ও দান সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা। চতুর্থ,—বহুবিধ ব্রতের বর্ণনা। পঞ্চম,—শৈল-জায়ার বিবাহ বর্ণনা। ষষ্ঠ,—তারকার উপাখ্যান। সপ্তম,—গো মাহাত্ম বর্ণনা। নবম,—কালকেয় প্রভৃতি দৈত্য বিনাশের বিস্তৃত বর্ণনা এবং সর্ব্বশেষে গ্রহগণের পূজা প্রভৃতির নিয়মাদি লিখিত হইয়াছে। ১।

ভূমিখণ্ড।—সুত ও শৌনক ঋষির কথোপকথনচ্ছলে এই খণ্ড রচিত। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে। (১) পিতৃ মাতৃ পূজা (২) শিবশর্ম্মার কথা (৩) সুব্রতের চরিত্র (৪) বৃত্রাসুর বধ (৫) পৃথু বর্ণের উপাখ্যান (৬) ধর্ম্মের আলোচনা (৭) পিতৃ শ্রবণ বর্ণনা (৮) নহুষের উপাখ্যান (৯) যযাতি উপাখ্যান (১০) রাজার সহিত জৈমিনীর কথোপকথন (১১) অশোক সুন্দরীর উপাখ্যান (১২) হুণ্ড দৈত্য বধ (১৩) কামোদ উপাখ্যান (১৪) বিহুণ্ড বধ (১৫) চ্যবন ও কুঞ্জলের কথোপকথন (১৬) সিন্ধুর উপাখ্যান। গল্প রচনা ছলে ধর্ম্ম উপদেশ প্রদানই এই সকল পুরাণের উদ্দেশ্য। ইহা কিরূপে রচিত ও লিখিত, তাহা হিন্দুকে আর বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না; কারণ যিনি মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অনায়াসে অন্যান্য পুরাণ কিভাবে লিখিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

স্বর্গখণ্ড।—বহু ঋষির সহিত সৌতির কথোপকথনচ্ছলে এই খণ্ড বিরচিত। ইহাতে প্রথমেই সৃষ্টি প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে; তৎপরে তীর্থের মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে। পরে নর্ম্মদার উৎপত্তি, নর্ম্মদা তীর্থের উপাখ্যান, ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থের বর্ণনা ও মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে। কাশির উপাখ্যান বর্ণিত হইয়া কাশি, গয়া, প্রয়াগ ভিন্ন প্রধান তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে ধর্ম্মের আলোচনা হইয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, যোগধর্ম্ম ও ব্যাস ও জৈমিনীর ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথোপকথন লিখিত হইয়াছে। সমুদ্র মন্থনের বর্ণনা, ব্রতাদির আলোচনা ও স্তোত্রও ইহাতে আছে।

পাতালখণ্ড।—এই খণ্ডকে রামায়ণের অংশ বিশেষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রামের রাজ্যাভিষেক ও অশ্বমেধ যজ্ঞ বর্ণনা হইতে এই খণ্ডের আরম্ভ। তৎপরে অগস্ত ঋষির আগমন, পৌলস্তের উপাখ্যান, প্রভৃতি রামায়ণোল্লিখিত বিষয়ের বর্ণনা হইয়াছে। অশ্বমেধের অশ্বের নানা দেশে প্রস্থান ও সেই উপলক্ষে বহু রাজার বর্ণনা; তৎপরে সুকৌশলে গ্রন্থকার নিম্নলিখিত কয়টী স্বতন্ত্র বিষয় এই স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন,—যথা (১) জগন্নাথ দেবের বর্ণনা (২) বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য (৩) রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা (৪) বৈশাখ মাসে স্নান দান প্রভৃতির মাহাত্ম্য (৫) ধরা ও বরাহের কথোপকথন (৬) যম ও ব্রাহ্মণের উপাখ্যান (৭) রাজার আচরণ (৮) শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র (৯) শিব শম্ভু মিলন (১০) দধিচীর উপাখ্যান (১১) শিব মাহাত্ম্য (১২) ইন্দ্র পুত্রের উপাখ্যান (১৩) শিব গীতা।

রামায়ণের অশ্বমেদ যজ্ঞ বর্ণনা উপলক্ষ মাত্র করিয়া গ্রন্থকার নানা উপাখ্যান ও ধর্ম্ম কথার আলোচনা করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যে পুরাণকর্ত্তাগণ জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম কথা সকল নানারূপ সুমিষ্ট গল্পের সহিত মিশাইয়া জনসাধারণকে শুনাইবার এবং শিক্ষাদিবার প্রয়াশ পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যতদূর সফল হইয়াছে, তাহা পাঠকদিগের বিচার্য্য।

উত্তর খণ্ড।—শিব ও পার্ব্বতীর কথোপকথনচ্ছলে এই খণ্ড রচিত; ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টী আছে। যথা,—(১) পর্ব্বতের উপাখ্যান (২) জালন্ধরের উপাখ্যান (৩) শ্রীশৈলাদির বিবরণ (৪) সগর রাজার উপাখ্যান ও গঙ্গার আবির্ভাব (৫) গঙ্গা, প্রয়াগ, কাশী ও গয়া তীর্থের মাহাত্ম (৬) মহা দ্বাদশী ব্রতের বর্ণনা (৭) চতুর্বিংশতি একাদশী মাহাত্ম, (৮) বিষ্ণু ধর্ম্ম বর্ণনা (৯) বিষ্ণুর সহস্র নাম। (১০) কার্ত্তিক ব্রতের ফল (১১) মাঘ মাসে স্নান ফল (১২) জম্বুদ্বীপের তীর্থ সকলের মাহাত্ম (১৩) সাভ্রমতীর মহিমা (১৪) নৃসিংহ অবতার বর্ণনা (১৫) দেব শর্ম্মার উপাখ্যান (১৬) গীতা মাহাত্ম (১৭) ভক্তি মাহাত্ম (১৮) শ্রীভাগবত মাহাত্ম (১৯) ইন্দ্রপ্রস্থের মহিমা (২০) নানা তীর্থের কথা (২১) মন্ত্ররত্ন, ত্রিপাদ, বিভূতি প্রভৃতির বর্ণনা (২২) মৎস্য প্রভৃতি অবতারের বর্ণনা (২৩) শ্রীরামের শত নাম (২৪) ভৃগুর বিষ্ণু বিভব পরীক্ষা।

যদিও এই পুরাণ ৫৫ হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ, তত্রাচ আমাদের উপরের লিখিত কয়েক লাইন পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে এই পদ্মপুরাণ কি এবং ইহাতে কিই বা আছে।

এই বৃহৎ পুরাণেও এমন কিছু নূতন বিষয়ের আলোচনা বা নূতন উপাখ্যানের উল্লেখ নাই, যাহা আমরা অনেকেই জানি না।

এই পুরাণের পাঁচ খণ্ডে বিশেষ বিশেষ ও ভিন্ন ভিন্ন লোকের কথোপকথন দেখিয়া বোধ হয় যে, এই পুরাণ খানি একজনের দ্বারা বা এক সময়ে লিখিত নহে। বিশেষতঃ, ইহাতেও এতই সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ ও আলোচনা হইয়াছে ও পুস্তকের বিষয় সকল পরস্পরে এতই প্রভেদ যে দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যেন বহু লোক এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। বোধ হয়, যখন যিনি পারিয়াছেন তিনিই এই পুরাণে একটী বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

বিষ্ণু পুরাণ।

এই পুরাণ দুই খণ্ডে বিভক্ত ও ছয় সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড যে সম্পূর্ণ অপর আর এক ব্যক্তির রচনা তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তবে ইহার প্রথম ভাগটী একই লোকের লেখা ও একই সময়ের লেখা বলিয়া বোধ হয়। অন্যান্য পুরাণাপেক্ষা বিষ্ণু পুরাণের রচনা প্রণালির ধারাবাহিকতা আছে; এমন কি ইহাকে একখানি রামায়ণ প্রভৃতির ন্যায় কাব্য বলিলেও নিতান্ত অন্যায় হয় না।

পাঠকগণের মধ্যে হয়তো কেহই বিষ্ণু পুরাণ পাঠ করেন নাই; হয়তো ইহার আকার পর্য্যন্ত তাঁহারা কেহ কখনও দেখেন নাই; অথচ হিন্দু জাতির অস্থিমজ্জায় এই সকল পুরাণ এতই মিশিয়া গিয়াছে যে এই পুরাণ পাঠ না করিয়াও তাঁহারা এই

পুরাণোল্লিখিত সকল বিষয়ই অবগত আছেন। এতই তাল-রূপে অবগত আছেন যে, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তক পুনরায় পাঠ করিবার আর বিশেষ আবশ্যক হয় না। এই পুরাণে কি আছে, তাহা দেখিলেই পাঠকগণ আমাদের কথার সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে সক্ষম হইবেন।

এই পুরাণের প্রথম ভাগ ছয় অংশে বিভক্ত ও মৈত্রেয় ও পরাশর কথোপকথনচ্ছলে লিখিত।

১। প্রথম ভাগের প্রথমাংশে সৃষ্টির আদি কারণ, সৃষ্টি প্রকরণ, দেবতাদির জন্ম, সমুদ্র মন্থন, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি গণের জন্ম, ধ্রুব চরিত্র, পৃথু চরিত্র, প্রচেতার উপাখ্যান ও প্রহ্লাদ চরিত্র, বিষদ ভাবে পল্লব ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং এ অংশ আমরা কখন পাঠ না করিয়াও ইহার সকলই জানি।

২। দ্বিতীয় অংশে প্রিয়ব্রতের উপাখ্যান, দ্বীপ, বর্ষ, পাতাল, নরক ও স্বর্গের বিবরণ, সূর্য্যাদির সঞ্চার, ভারত রাজার উপাখ্যান, মুক্তিমার্গ নিরূপণ প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে।

৩। তৃতীয়াংশে মন্বন্তরের কথা, বেদব্যাসের, নরকের উদ্ধার ও কর্ম্ম, ধর্ম্ম নিরূপন, বর্ণাশ্রম নিরূপন, সদাচার, পিতৃ মায়া মোহ প্রভৃতি হিন্দুর চির বিশ্বাসের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

৪। চতুর্থ অংশে সূর্য্য ও চন্দ্র বংশের বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে। সূর্য্য ও চন্দ্র বংশের কথা রামায়ণে ও মহাভারতের কল্যাণে ভারতের আবাল বৃদ্ধ সকলেই অবগত আছেন।

৫। পঞ্চমাংশে বহু রাজার বর্ণনা, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বাল্য লীলা, পূতানা বধ, অঘাসুরাদি বধ, কংসবধ, মথুরা লীলা, বৃন্দাবন লীলা, শ্রীকৃষ্ণের ভূভার হরণ, অষ্টাবক্রের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণ কোন কালে না পড়িয়াও ভারতের ক্ষুদ্র বালকবালিকা পর্য্যন্ত এ সকল বিষয় বিশেষরূপ অবগত আছেন।।

৬। ষষ্ঠ অংশে উপাখ্যানের ভাগ অল্প; ধর্ম্মালোচনায়ই অধিক;—ইহাতে কলিযুগ চরিত্র, চতুর্বিধ লয়, আত্মজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সম্ভবমত বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় ভাগ কোন ব্যক্তি পরে ইহাতে সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম ভাগের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। ইহাতে সুত ও শৌনক কথোপকথনচ্ছলে বিষ্ণু ধর্ম্ম, নানা ধর্ম্মালোচনা, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থ শাস্ত্র, বেদান্ত শাস্ত্র, জ্যোতিঃ শাস্ত্র, স্তব প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণের প্রথমাংশ যেরূপ বর্ণনামূলক ও সুমিষ্ট গল্পে পূর্ণ, দ্বিতীয় ভাগ তেমনই নিরস ধর্ম্মের আলোচনায় পূর্ণ। যাহা হউক, ইহাতেও এমন কিছুই নাই যাহা আমরা জানি না।

বায়ু পুরাণ।

এই পুরাণ শিব পুরাণ নামেও খ্যাত। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত এবং ২৪ হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ। ইহাতে উপাখ্যানের ভাগ অল্প; হিন্দুদিগের চির প্রচলিত আচার পদ্ধতির বর্ণনাই

অধিক। প্রথম বা পূর্ব্ব ভাগে নিম্ন লিখিত বিষয় কয়টী আলোচিত হইয়াছে। (১) স্বর্গাদি লক্ষণ (২) মন্বন্তরের রাজগণের বংশ কথন (২) গয়াসুর বধ (৪) মাস সকলের মহিমা (৫) দান [illegible] ও [illegible] ধর্ম্ম (৬) ভূচর, পাতালচর, দিকচর ও আকাশচরগণের বিবরণ (৭) ব্রত সকলের বর্ণনা। সুতরাং এ পুরাণের এ অংশে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা অন্যান্য পুরাণের বহু স্থলে লিখিত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি [illegible] [illegible] এই সকল বিষয়ের বর্ণনা ২৪ হাজার [illegible] [illegible] হইয়াছে, তখন বলা বাহুল্য যে ইহারও [illegible] [illegible] [illegible] ও অনর্থক কথায় পূর্ণ। ইহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নর্ম্মদা তীর্থ বর্ণনা ও মাহাত্ম্য ও শিবসংহিতা আছে। সংসারে মানবকে কিরূপে বাস করিতে হইবে এবং কোন পাপের কিইবা দণ্ড এবং কিইবা প্রায়শ্চিত্ত, ইহাতে তাহাই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এক পুরাণে এক বিষয়ের যেরূপ বর্ণনা বা মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, সকল পুরাণে সেই বিষয়ের সেইরূপ বর্ণনা বা মাহাত্ম্য বর্ণিত নাই। তবে যে টুকু [illegible] বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ, একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রচিত হইয়াছে ও রচয়িতাগণের রুচি অনুসারে যাহা কিছু পার্থক্য ঘটিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবৎ।

পুরাণের মধ্যে কোনখানি শ্রেষ্ঠ, তাহা বলা বড়ই কঠিন, তবে শ্রীমদ্ভাগবৎ যে একখানি উৎকৃষ্ট পুরাণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ পূর্ণ অথচ সুমিষ্ট উপাখ্যান রূপী পুস্তক জগতে আর আছে কিনা তাহা আমরা জানি না।

এই পুরাণ খানি একই ব্যক্তির রচনা বলিয়া বলিয়া বোধ হয়। অন্যান্য পুরাণে যে রূপ অনেকেই স্ব স্ব রচিত শ্লোক সংযুক্ত করিয়া দিয়ে [illegible] সম্ভবমতঃ ভাগবতে কেহই ইহা [illegible] ইহার রচনা মাধুরী এতই সুন্দর [illegible] রচনা তাহার সহিত মিশিবার কোনই [illegible] নাই। বিশেষতঃ; ইহার ভাব এতই উচ্চ যে অপর [illegible] সে ভাব করিতে সক্ষম নহেন, বর্ণনা তো

বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রকা[illegible] ধর্ম্মভাব উদ্রেক করাই এই পুস্তকের মুখ্য [illegible] ভক্তি ও প্রেম ধর্ম্ম প্রচারই এই পুরাণের প্রধান কার্য্য [illegible] ইহার কৃষ্ণ লীলাই প্রধান অঙ্গ। এই সকল [illegible] এই পুরাণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। প্রেম ধর্ম্ম প্রকাশক ভাগবতের ন্যায় গ্রন্থ জগতে আর কোন দেশে কখনও রচিত হয় নাই। দুঃখের বিষয়, এই পুস্তক যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তাহা সহজ নহে। বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম ভিন্ন পণ্ডিতেরাও সহজে ইহার ভাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়েন না। তবে হিন্দু সন্তানের অস্থিমজ্জার সহিত এই সকল বিষয়

যেখানে গিয়াছে, তাহাই আমরা ভাগবত না পড়িয়াও ভাগবতে বর্ণিত সকল বিষয়ই অবগত আছি।

এই পুরাণ দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত ও অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। এই পুরাণখানি বিষ্ণু পুরাণ অপেক্ষাও কাব্যের ধরণে লিখিত। এমন কি, কাব্যের সকল লক্ষণই ইহাতে আছে। যদি সহজ ও সরল ভাষায় এই পুরাণ লিখিত হইত, তাহা হইলে ইহা কাব্যরূপে রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় গৃহে গৃহে পঠিত, গীত ও আবৃত্ত হইত। কিন্তু ইহাতে উপাখ্যান থাকিলেও সেই সকল উপাখ্যান এতই নিরস ধর্ম্মের কথা ও কঠিন দার্শনিক কথায় সংযুক্ত যে সাধারণ লোকে কিছুতেই তাহার আস্বাদ করিতে সক্ষম হয়েন না।

এই পুরাণের কোন খণ্ডে কি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, তাহাই একণে দেখা যাউক।

প্রথম স্কন্ধ।—পুরাণের প্রথমেই সূত ও অপর ঋষিগণ সম্মিলিত হইয়াছেন; তৎপরে ব্যাসদেবের চরিত্র, পাণ্ডব দিগের চরিত্র ও পরিক্ষীতের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতেই প্রথম স্কন্ধ শেষ হইয়াছে।

দ্বিতীয় স্কন্ধ।—পরিক্ষিত ও শুকদেবের কথোপকথনে ধর্ম্মের আলোচনা; ব্রহ্ম নারদ কথোপকথনে অবতার সকলের বর্ণনা, পুরাণের লক্ষণ ও সৃষ্টি প্রকরণ, এই কয়টী বিষয় এই খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় স্কন্ধ।—বিদুরের চরিত্র ও তাঁহার সহিত মৈত্রেয়ের সাক্ষাৎ, ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রকরণ, কপিলের সাংখ্য আলোচনা, এই তিনটী বিষয় মাত্র এই খণ্ডে লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থ স্কন্দ।—এই অংশ হইতেই উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, স্কন্ধকে পুস্তকের অনুসূচনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না; প্রকৃত পক্ষে পুস্তক এই চতুর্থ স্কন্দ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে সতীর উপাখ্যান, ধ্রুব চরিত্র, পৃথু চরিত্র ও প্রাচীন বর্হির উপাখ্যান, এই চারিটী বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয় পাঠকগণের সকলেই এই চারিটী উপাখ্যান অবগত আছেন।

পঞ্চম স্কন্দ।—এই অংশে প্রিয়ব্রতের চরিত্র, এবং তাঁহার বংশ বিবরণ, ব্রহ্মাণ্ড[illegible] বৃত্তান্ত এবং নরক স্থিতি তিনটী বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে।

ষষ্ঠ স্কন্দ।—ইহাতে [illegible] চরিত্র বর্ণন, দক্ষের সৃষ্টি নিরূপন, বৃত্রাসুরের [illegible] ও মরুতের জন্ম বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

সপ্তম স্কন্দ।—এই স্কন্দে প্র[illegible] চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে; সেই উপলক্ষে বর্ণাশ্রম, বাসনা, কর্ম্ম ও কর্ম্ম বাসনা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে।

অষ্টম স্কন্দ।—গজেন্দ্র [illegible] মন্বন্তর নিরূপণ, সমুদ্র মন্থন, বলিরাজার উপাখ্যান, মৎস্য অবতার প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এ সকল উপাখ্যান হিন্দুর গৃহে গৃহে বিদিত আছে।

নবম স্কন্দ।—চন্দ্র বংশ ও সূর্য্য বংশের বিস্তৃত বিবরণ এই স্কন্দে লিখিত হইয়াছে। এ বর্ণনা মহাভারতে আছে, রামায়ণেও আছে, অধিকাংশ পুরাণেও আছে। বোধ হয়, যে সময়ে এই সকল পুরাণ রচিত হইয়াছিল, সেই সময়ে ভারতবর্ষে

এই দুই রাজবংশ প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন; ভয়েই হউক আর ভক্তিতেই হউক, পুরাণ রচয়িতাগণ নিজ নিজ পুস্তকে এই দুই বংশের গুণ কীর্ত্তন করিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাদের অনুগ্রহে এখন হিন্দু কেহই নাই, যিনি চন্দ্র বংশের ও সূর্য্য বংশের ইতিহাস না জানেন।

দশম স্কন্ধ।—এই স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার [illegible] বাল্য চরিত্র, কৌমার চরিত্র, ব্রজে স্থিতি, কৈশোর লীলা, মথুরা [illegible] যৌবন লীলা, দ্বারকায় স্থিতি, ভূভার [illegible] জীবন চরিত লিখিত হইয়াছে। [illegible] অধিকন্তু ভাগবতে যাহা নাই, [illegible] ভারতে তাহার উল্লেখ নাই, এ কথা আমরা [illegible]

একাদশ স্কন্ধ।—এই স্কন্ধে কেবলই ধর্ম্মালোচনা। প্রথমে নারদ ও বসুদেবের [illegible], তৎপরে যদু ও দত্তাত্রেয়ে কথোপকথন, [illegible] সহিত উদ্ধবের কথোপকথন, পরে যদুবংশীয়গণের পরস্পর [illegible] উপায় সম্বন্ধে কথোপকথন—এই [illegible] স্কন্ধে লিখিত হইয়াছে।

দ্বাদশ স্কন্ধে [illegible] স্কন্ধের [illegible] ভাব [illegible] আলোচনা হইয়াছে। ভবিষ্যতে কি হইবে, কলিতে সংসার কিসে পরিণত হইবে, এই সকল বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে পরিক্ষিতের মোক্ষ, বেদ শাখা, মার্কণ্ডের তপস্যা, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে।

এই পুরাণ খানি আদ্যপান্ত বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে ইহা মহাভারত রচনার অনেক

পরে রচিত হইয়াছিল। বোধ হয় ভাগবত রচয়িতা মহাভারতের অনুকরণে নিজ পুস্তক রচনার প্রয়াস পাইয়া ছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি নিজ পুস্তক মহাভারতের ন্যায় সর্ব্বজন প্রিয় করিতে পারেন নাই। মহাভারতাপেক্ষা অনেকাংশে, বিশেষতঃ ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি অংশে, যে ভাগবত শ্রেষ্ঠ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, ইহাকে মহাভারতের সমুন্নত শাখা বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য।

আমরা পুনঃ পুনঃ মহাভারতের নাম করায় পাঠকগণ হয়তো জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি সকল গুলিই প্রায় মহাভারতের অনুকরণে লিখিত হইল, তবে অন্যগুলিকে পুরাণ ও মহাভারতকে কাব্য বলেন কেন? [illegible] এই সন্দেহ এই স্থানেই দূর করা কর্ত্তব্য। পুরাণ ধর্ম্মগ্রন্থ, কাব্য তাহা নহে। কাব্যের প্রতি পৃষ্ঠায় ধর্ম্মোপদেশ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ ধর্ম্ম প্রচার করা হয় না এবং তাহাতে ভগবানকে নায়ক রূপে পাঠক দিগের সম্মুখে আনয়ন করা হয় না; কিন্তু পুরাণে তাহাই করা হয়। ধর্ম্ম ও ঈশ্বরমাহাত্ম্য বর্ণনাই পুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য, কাব্যের উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন। পুরাণের নায়ক স্বয়ং ভগবান্, কাব্যের নায়ক মনুষ্য। ভাগবতে ও মহাভারতে সাদৃশ্য থাকিলেও দুই খানির উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। একখানির উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন, অপরের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম প্রচার। মহাভারতে কোন ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা হয় নাই, কিন্তু ভাগবতের পাতায় পাতায় প্রেম ও ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের বিশিষ্ট যত্ন করা হইয়াছে। এই জন্য ভাগবত—পুরাণ, মহাভারত পুরাণ নহে,—কাব্য।

ভাগবতে উপাখ্যানাংশ যাহা আছে, তাহার সকলই আমরা জানি, কিন্তু ইহার উপাখ্যানাংশ অপেক্ষা ইহার ভাবাংশ শ্রেষ্ঠ। এমন ভাবপূর্ণ পুস্তক আর নাই, এই জন্য অন্য কোন পুরাণ না পড়িলেও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। অন্যান্য পুরাণে উপাখ্যান ব্যতীত অন্য সার বিষয় অল্পই আছে, সুতরাং সেগুলি পড়িয়া সময় নষ্ট করিবার তত আবশ্যকতা দেখা যায় না। কিন্তু ভাগবতের ভাবাংশই সার; ইহার উপাখ্যানাংশ বাদ দিলেও পুস্তকের গুণের কোনই ব্যতিক্রম হয় না। এইজন্য এই সুন্দর পুস্তকের ভাবগ্রহণ ও হৃদয়ে ধারণ জন্য এই পুরাণ সকলের এক এক বার পাঠ করা কর্ত্তব্য।

নারদ পুরাণ।

এই পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত ও ২৫সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রথম ভাগে চারিটী পাদ বা বিভাগ আছে।

পূর্ব্ব ভাগের প্রথম পাদে সৃষ্টি বর্ণনা ও বহুবিধ ধর্ম্মকথার আলোচনা হইয়াছে; দ্বিতীয় পাদে নিম্ন লিখিত বিষয় কয়টী আছে;—যথা, মোক্ষধর্ম্ম, মোক্ষোপায়, বেদাঙ্গ আলোচনা, শুকোৎপত্তি, মহাতন্ত্রে পশুপাশ বিমোচন, মন্ত্র শোধন, দীক্ষা, মন্ত্রোদ্ধার পূজা প্রয়োগ কবচ, বিষ্ণুর সহস্র নাম এবং স্তোত্র, গণেশার্চ্চা, বিষ্ণু, শিব ও শক্তির বিবরণ।

পূর্ব্বে আমরা যে কয়খানি পুরাণের আলোচনা করিয়াছি তাহাতে যাহা আছে, এই পুরাণে তাহাপেক্ষা অনেক স্বতন্ত্র বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে আমরা তন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই; মন্ত্র, দীক্ষা, কবচ প্রভৃতি তান্ত্রিক বিষয়েরও বিবরণ দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত প্রাচীনতম কোন পুরাণেই শক্তির পূজাপদ্ধতি দেখিতে পাই না; কিন্তু এই পুরাণে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিবের সহিত শক্তিরও নামোল্লেখ হইয়াছে। পূর্ব্বে ভারতে গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব ও শৈব এই চারি সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। নারদ পুরাণে শাক্তগণের উল্লেখও দেখা যায়; বিশেষতঃ, এই পুরাণখানির সহিত, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণের সাদৃশ্য অতি অল্পই, বরং অনেক তন্ত্রের সহিত, বিশেষতঃ তন্ত্র রচনা প্রণালীর সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই সকল কারণে স্পষ্ট বোধ হয়, যে এই পুরাণ আধুনিক এবং তান্ত্রিক ধর্ম্ম ও তন্ত্র গ্রন্থ প্রচারের পর লিখিত। তাহা হইলে সম্ভবতঃ ইহা দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বভাগে তৃতীয় পাদে নারদ ও সনৎকুমারের কথোপকথন-চ্ছলে পুরাণের লক্ষণ, দানকালের বর্ণনা, চৈত্র প্রভৃতি মাসের প্রতিপদাদি দিনে ব্রতের বিস্তৃত বর্ণনা প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। চতুর্থ পাদে সনাতন নারদকে বহু উপাখ্যান বলিতেছেন।

উত্তরভাগে একাদশী ব্রতের বিবরণ, বশিষ্ঠ ও মান্ধাতার কথোপকথন, মোহিনী উপাখ্যান, এবং কাশী ও পুরুষোত্তম, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, বদরী, কামাখ্যা, প্রভাস, প্রভৃতি

তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কামোদা, পুরাণ ও গৌতম উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তৎপরে গোকর্ণক্ষেত্র মাহাত্ম্য, সেতু মাহাত্ম্য, নর্ম্মদা মাহাত্ম্য, অবন্তী মাহাত্ম্য, মথুরা মাহাত্ম্য, বৃন্দাবন মাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণনা উপলক্ষে লক্ষণের উপাখ্যান প্রভৃতি উপাখ্যানও লিখিত হইয়াছে। এই সকল তীর্থ মাহাত্ম্য লোক সমাজে প্রচার করিবার জন্যই যেন গ্রন্থকার মোহিনীর সুমিষ্ট উপাখ্যানটী রচনা করিয়া তাহারই মধ্যে এই সকল তীর্থ মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভাগবদাদি পুরাণে আমরা এত তীর্থের নাম দেখিতে পাই না, কিন্তু নারদ পুরাণে আধুনিক সকল তীর্থের নামই দেখিতে পাই। ইহাও নারদ পুরাণের আধুনিকতার একটী প্রমাণ, বিশেষতঃ, ইহাতে কামাখ্যা তীর্থের নাম উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রচারের সময় হইতেই কামাখ্যা তীর্থ রূপে বিদিত; প্রাচীন ধর্ম্ম গ্রন্থে ইহার কোনই উল্লেখ নাই।

এই পুরাণ খানি দেখিলে আরও একটী কথা মনে হয়। মনে হয়, যখন এই নারদ পুরাণ রচিত হইয়াছিল, তখন ভারতে তান্ত্রিক ধর্ম্ম নিশ্চয়ই বিশেষ প্রবল হইয়াছিল, তাহাই গ্রন্থকার, তাঁহার পুস্তক কেহ পাঠ করিবেনা এই ভয়ে, পুস্তকের প্রথমাংশ প্রায় তন্ত্রের মতন করিয়া ও তন্ত্রের হাবভাব গ্রহণ করিয়া রচনা করিয়াছেন; তৎপরে শেষাংশ পুরাণের ধরণে লিখিয়াছেন। বোধহয় তান্ত্রিক দিগকে তন্ত্রের আভাস দিয়া ভুলাইয়া, ক্রমে তাহাদিগকে পুরাণধর্ম্মে আনয়নই তাঁহার

উদ্দেশ্য ছিল। ইহাতে আরও একটী বিষয় প্রমাণ হয় যে, তন্ত্র বাঙ্গালা দেশেই প্রবল হইয়াছিল, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তান্ত্রিকধর্ম্ম প্রচলিত হইলেও তাহা প্রবল হইতে পারে নাই। ইহাতে বোধহয়, সম্ভবমত এই নারদ পুরাণখানি বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর দ্বারা রচিত হইয়াছিল।

নারদ পুরাণে এমন কিছুই নাই যাহা আমরা জানি না, আমরা শৈশব হইতেই তীর্থ মাহাত্ম্য শুনিয়া আসিতেছি, তবে যাঁহারা মোহিনীর উপা খ্যান অবগত নহেন, তাঁহারা একবার এই পুরাণ পড়িয়া দে[illegible]।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

এই পুরাণেও বহুতর [illegible] ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। [illegible] অনেকটা রূপক ভাবে লিখিত। প্রথমেই মার্কণ্ডেয় দেব জৈমিনি ঋষিকে ধর্ম্ম পক্ষীদিগের নিকট প্রেরণ করিতেছেন, তৎপরে ধর্ম্ম পক্ষী সকলের জন্মবৃত্তান্তও কথিত হইয়াছে; কেবল এই সকল পক্ষীদিগের জন্মের কথা বলা হইয়াছে তাহা নহে, তাহাদের পূর্ব্ব জন্মের বিধানও উক্ত হইয়াছে। তৎপরে বলদেবের তীর্থযাত্রা, দ্রৌপদের উপাখ্যান, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, আড়িবক যুদ্ধ উপাখ্যান, পিতাপুত্রের উপাখ্যান, দত্তাত্রেয়ের উপাখ্যান, হৈহের উপাখ্যান, চরিত্র ও মাহাত্ম্য, মঙ্গলময়

উপাখ্যান, অলকের চরিত্র, ষষ্ঠী সংকীর্ত্তন, নয় প্রকার পুণ্যের কথা, কতিপয় অন্তকাল নির্দ্দেশ, পত্নী সৃষ্টি নিরূপন, রুদ্রাদি সৃষ্টি নিরূপণ, রুদ্রাদি সৃষ্টি, দ্বীপও বর্ষের কথা, মনুদিগের বিবরণ, অষ্টম মন্বন্তরের দেবী মাহাত্ম্য, প্রাণোৎপত্তির বিবরণ, বেদ প্রভৃতির জন্ম, মার্কণ্ডের জন্ম ও মাহাত্ম্য, বৈবস্বতের ও বৎসমীর চরিত্র, খানিত্যের উপাখ্যান, অবক্ষতের চরিত্র, কিমিচ্ছ ব্রতের বিবরণ, অবিনার চরিত্র, ইক্ষাকু চরিত্র, তুলসীর চরিত্র, রামচন্দ্রের বিবরণ, কুশবংশ আখ্যান, সোমবংশ বিবরণ, পুরুরবার উপাখ্যান, নহুষের উপাখ্যান, যযাতি উপাখ্যান, যদুবংশের বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বাণ চরিত্র, মথুরাবাস, দ্বারকা গমন, অন্যান্য অবতারের বিবরণ, সাংখ্যমত, প্রপঞ্চ ও অসত্য বর্ণনা, মার্কণ্ডের চরিত্র প্রভৃতি নয় সহস্র শ্লোকে এই পুরাণ বিবৃত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় দেবের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই এই পুরাণ রচিত; অন্যান্য নানা উপাখ্যান দ্বারা মার্কণ্ডের দেবের মাহাত্ম্য প্রকাশেরই চেষ্টা হইয়াছে। তবে যেমন সকল পুরাণেই আছে, ইহাতেও সেইরূপ অন্যান্য অবতারের বর্ণনা হইয়াছে, এবং অপরাপর পুরাণের ন্যায় ইহারও শেষ ভাগে দর্শনের গম্ভীরতম ভাবের আলোচনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এ পুরাণেরও অধিকাংশ ব্যাপার আমরা সকলই অবগত আছি।

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই বোধহয় কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন। চণ্ডীখানি বাঙ্গালায় লিখিত বলিয়াই বোধহয় কেহ ইহাকে পুরাণ বলেন না, নতুবা সংস্কৃতে লিখিত হইলে নিশ্চয়ই চণ্ডী পুরাণ বা উপাখ্যান

বলিয়া গণিত হইত। যাঁহারা চণ্ডী দেখিয়াছেন, তাঁহারা পুরাণ কি ভাবে লিখিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। যেমন চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার জন্যই কবিকঙ্কণ নিজ পুস্তকে শ্রীমন্তসদাগরের জীবন চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে পুরাণে নানাবিধ উপাখ্যান দ্বারা কোন দেবতা বিশেষের মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হইয়াছে; এবং এই সকল বর্ণনা কালে নানাবিধ নীতি, ধর্ম্মের ও জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণও ঠিক এই ভাবে লিখিত, তবে বিষ্ণু পুরাণ বা শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় ইহাতে একটা ঘটনাবিশেষের ধারাবাহিকতা নাই। রামায়ণে কেবলই রাম রাবণের বিবরণ, কিন্তু মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের বিবরণ বলিতে বলিতে কবি আরও বহুবিধ বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। পুরাণ সকল মহাভারত অপেক্ষা এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইহাতে মূল বিষয় একটা থাকিলেও তাহাপেক্ষা অন্যান্য বিষয় অধিক আলোচিত হইয়াছে।

অগ্নি পুরাণ।

হিন্দুধর্ম্ম ব্যাপরটা কি, এই প্রশ্নই সকল পুরাণের মূল। কোন রাজা কোন ঋষিকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অথবা শিষ্যগণ গুরুকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই প্রশ্নের উত্তরেই এক এক খানি পুরাণ হইয়াছে। সেই সকল প্রশ্ন কর্ত্তা

ও উত্তরদাতার নাম প্রত্যেক পুরাণের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই যে প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরদাতা, তাহা বোধ হয় না। সম্ভবমত, গ্রন্থকার পুস্তকের আদর বৃদ্ধি করিবার জন্য বড় বড় ঋষি পুরাণ বলিতেছেন বলিয়াই উল্লিখিত করিয়া গিয়াছেন। এই অগ্নিপুরাণ বশিষ্ঠ ঋষি নলরাজাকে বলিতেছেন। নলরাজা পুরাণ কি, ও পুরাণের লক্ষণ কি, এই প্রশ্ন করায় ঋষি তাঁহাকে এই অগ্নিপুরাণ শ্রবণ করাইয়া ছিলেন। এটুকু যে সম্পূর্ণই কল্পিত কথা, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, ইহাতে যাহা আছে, তাহা আমরা নিম্নে লিখিতেছি; বিষয়গুলি দেখিলেই পাঠকগণ অগ্নিপুরাণ ব্যাপারটী কি, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন।

এই পুরাণ পঞ্চদশ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ এবং ইহাতে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি আছে; যথা:—(১) পুরাণের প্রশ্ন (২) সকল অবতারের বিবরণ (৩) [illegible] (৪) বিষ্ণুপূজা পদ্ধতি (৫) অগ্নি পূজার মন্ত্র (৬) দীক্ষা [illegible] অভিষেক বিবরণ (৮) মণ্ডন করণ, কুশ মার্জ্জন, পবিত্র [illegible], দেবালয় নির্ম্মাণ, শালগ্রাম পূজা, দেব প্রতিষ্ঠা বিধি [illegible] বিবরণ (৯) তীর্থ মাহাত্ম্য (১০) জ্যোতিষ শাস্ত্র (১১) যুদ্ধশাস্ত্র (১২) মন্ত্র যন্ত্র ঔষধ প্রকরণ (১৩) কুব্জিকাদির অর্চ্চনা (১৪) ছয় প্রকার ন্যাস (১৫) কোটী হোম বিবরণ (১৬) ব্রহ্মচর্য্য-ধর্ম্ম (১৭) শ্রাদ্ধ বিধি (১৮) গ্রহযজ্ঞ (১৯) বেদোক্ত স্মৃতি উক্তি বিধি সকল (২০) প্রায়শ্চিত্ত বিবরণ (২১) তিথি দান ও ব্রত বিবরণ (২২) নাড়ীচক্র বিবরণ (২৩) সন্ধ্যাবিধি (২৪) গায়ত্রী অর্থ (২৫) শিব লিঙ্গের স্তোত্র (২৬) রাজাভিষেক মন্ত্র (২৭) রাজ-ধর্ম্ম, রাজকার্য্য (২৮) রাজার অধ্যয়ন (২৯) শাকুন

শাস্ত্র (৩০) রণদীক্ষা বিধি ও এই উপলক্ষে শ্রীরামোক্ত নীতি বর্ণনা (৩১) দেবাসুর বিমর্দ্দনের উপাখ্যান (৩২) আয়ুর্ব্বেদ ও চিকিৎসা শাস্ত্র (৩৩) গো অশ্বাদির চিকিৎসা (৩৪) নানা পূজা প্রকরণ ও বিবিধ শান্তি ব্যবস্থা (৩৫) ছান্দশাস্ত্র, শিষ্টানুশাসন প্রভৃতি (৩৬) প্রলয়ের লক্ষণ (৩৭) নরক বর্ণনা (৩৮) যোগশাস্ত্র (৩৯) ব্রহ্মজ্ঞান।

উপরিল্লিখিত বিষয় গুলি দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে এই পুরাণে কি আছে। এই পুরাণের প্রথমাংশে বেদের মত প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে। অথচ অগ্নি পুরাণ রচিত হইবার সময় বেদের কাল ভারতে ছিল না, তাহাই গ্রন্থকার বেদোক্ত পূজাবিধি পৌত্তলিকতার আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া দেখাইয়াছেন। পুরাণের সময় ভারতবর্ষে অগ্নিপূজা প্রচলিত ছিল না; কিন্তু এই পুরাণ খানিতে অগ্নিপূজা প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। অথচ এই পুরাণকে প্রাচীন বলিতে পারা যায় না, কারণ ইহাতে মন্ত্র যন্ত্র ঔষধ প্রকরণ প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত বিষয়ও উল্লিখিত হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে এই পুরাণের মধ্যভাগ অনেকটা তন্ত্রের ধরণে লিখিত। তন্ত্রের ন্যায় ইহাতে জ্যোতিষ শাস্ত্র, শাকুন শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনা হইয়াছে। অন্যান্য প্রাচীন পুরাণে এ সকল বিষয়ের কোনই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; প্রকৃতপক্ষে এই সকল বিষয়ের সহিত ধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই।

পুরাণকার প্রথমেই বলিয়াছেন যে এই পুরাণ নলরাজাকে বলা হইয়াছিল, সুতরাং তিনি ইহাতে রাজধর্ম্মের ও যুদ্ধ প্রভৃতির বিশিষ্ট আলোচনা করিয়াছেন এবং উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে

পুরাণের ধর্ম্মশিক্ষা, (অর্থাৎ দেব দেবীর পূজা, তীর্থে ভক্তি প্রভৃতি) আছে,—শেষাংশে দর্শনের গভীর বিষয়েরও আলোচনা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাজনীতি, জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি সংসারিক প্রয়োজনীয় বিদ্যার আলোচনাও হইয়াছে, সুতরাং এই পুস্তকে কোনই ধারাবাহিকতা নাই। পাঠকদিগের কেহ কোন হিন্দু পণ্ডিতকে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দু বিদ্যালোচনার প্রশ্ন করিলে তিনি যাহা যাহা এখনও বলেন, অগ্নিপুরাণ রচয়িতা তাহাই তাঁহার পুস্তকে ১৫ হাজার শ্লোকে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।

বোধ হয় পাঠকগণ এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে পুরাণ রচনা করিবার কোন নিয়ম ছিল না। হিন্দুধর্ম্মের ভাব যিনি যেরূপ বুঝিয়া গিয়াছেন ও ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও বিদ্যার যে যে অংশ যিনি যেমন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছেন,—তিনি তাহাই স্ব স্ব পুরাণে লীপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে এরূপ হয় নাই; প্রথমে বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতিতে যেমন ধারাবাহিক রূপে অতি সুন্দর ভাবে উপাখ্যানের সহিত ধর্ম্মোপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, পরে তাহা হয় নাই। যতই দেশে ধর্ম্মভাব শিথিল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, যতই দেশের দিন দিন অধঃপতন হইতেছিল, ততই পশ্চাৎবর্ত্তী পুরাণকারগণ স্ব স্ব পুরাণে বহুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের সময় কেবল দেশে দেব দেবীর পূজার অভাব হইতেছিল, তাহাই বিষ্ণুপুরাণে কেবল তাহারই আদর বৃদ্ধির চেষ্টা হইয়াছে। ভাগবতের সময় লোক ধর্ম্মহীন, ভক্তিবিহান নীরস হইয়া পড়িতেছিল, তাহাই ভাগবতে ভক্তি ও প্রেম ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা,

হইয়াছে। অগ্নিপুরাণ দেখিয়া আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, এই সময়ে ভারতবাসী কেবল যে ধর্ম্মবিহীন হইয়াছিল তাহা নহে, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতিতেও তাহাদের একেবারেই তাচ্ছিল্য ঘটিয়াছিল; জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি একেবারেই হতশ্রদ্ধ হইতেছিল, নতুবা কেন অগ্নিপুরাণকার নিজ পুরাণে এ সকলের উপদেশ প্রদান করিবেন?

ভবিষ্য পুরাণ।

মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন আধুনিক ধর্ম্ম সকলের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়া "নব বিধান" ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কেহ যেন ভাবিবেন না যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সকলের সমন্বয় করিবার চেষ্টা তিনিই প্রথমে করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মিবার বহুশত বৎসর পূর্ব্বে ভবিষ্য পুরাণকার এই কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকালে যে কয়টী ধর্ম্মসম্প্রদায় ভারতবর্ষে ছিল, সেই গুলির বিবাদ ভঞ্জনের জন্যই বোধ হয় তিনি ভবিষ্য পুরাণ প্রণয়ন করেন। ধর্ম্মসম্প্রদায় ভিন্ন হইলেও ব্রহ্ম এক, ও ভিন্ন ভিন্ন দেবতা তাঁহার রূপ ভেদ মাত্র—ইহাই জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্ম ভবিষ্য পুরাণের সৃষ্টি।

এই পুরাণ ১৪ হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার পাঁচটী ভাগ; এই ভাগ সকলকে পর্ব্ব বলে। প্রথম পর্ব্বের নাম "ব্রাহ্ম পর্ব্ব";—অন্যান্য পর্ব্বের কোন বিশেষ নাম নাই।

ব্রহ্মা চিরকাল জগত রচয়িতা বলিয়া পরিগণিত হইলেও তিনি কখনও ভারতবর্ষে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা হইতে পারেন নাই; ভবিষ্য পুরাণে গ্রন্থকার সকল দেবতা অপেক্ষা ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। প্রথম পর্ব্বের নাম এই জন্যই "ব্রাহ্ম" হইয়াছে। এই পর্ব্বে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলির আলোচনা হইয়াছে, যথাঃ—

(১) নানা উপাখ্যান সহ সূর্য্যের চরিত্র (২) সৃষ্টির লক্ষণ (৩) সকল প্রকার সংস্কারের বিবরণ (৪) তিথি প্রভৃতির মাহাত্ম্য (৫) বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্য পূজা পদ্ধতির বিবরণ। এই পর্ব্বে বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্যের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইলেও গ্রন্থকার ব্রহ্মার মাহাত্ম্যাধিক্য দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

ইহার দ্বিতীয় পর্ব্বে শিবমাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে, এবং সংসার ও ভোগের বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় পর্ব্বে মোক্ষ বিষয়ে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ পর্ব্বে চতুর্ব্বর্গ বিষয়ে সূর্য্যের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম পর্ব্বে স্বর্গের বর্ণনা আছে। এই সকল দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনাকালে পুরাণ রচয়িতা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের গুণ ও তাঁহারই রূপ ভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে এবং এই সকল দেবতায় যে কোনই বিভিন্নতা নাই, তাহাই দেখাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, যে তাঁহার চেষ্টা কোনই কার্য্যকারী হয় নাই; ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মর্ম্মান্তিক বিবাদ আজিও ভারতে প্রবল রহিয়াছে।

এই পুরাণখানিকে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়া বোধ হইবার অনেক কারণ আছে। ইহাতে আমরা কেবল মাত্র তিনটী

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নাম দেখিতে পাই, যথা,—শৈব, বৈষ্ণব, ও সৌর, অর্থাৎ শিব, বিষ্ণু ও সূর্য্য উপাসক। যখন এই পুরাণ লিখিত হইয়াছিল, সেই সময়ে গাণপত্য ও শাক্ত সম্প্রদায় থাকিলে অবশ্যই এ পুস্তকে তাহাদিগেরও উল্লেখ হইত। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, তখন এই পুরাণ এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবার বহুপূর্ব্বে যে রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। মুসলমানগণ ভারতে আসিয়া অনেক গণেশের মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেই ভারতে গাণপত্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল; এই হেতু ইহাও বলিতে হইবে যে, এই পুরাণ মুসলমানদিগের ভারতে আগমনের বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ ব্যতীত অন্য সকল পুরাণ অপেক্ষা এই পুরাণ প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

অন্য কোনও পুরাণে ধর্ম্মসমন্বয় করিবার চেষ্টা হয় নাই। যখন সমন্বয় করিবার আর আশা থাকে না, যখন বিবাদ বহুদিন হইতে চলিয়া বিদ্বেষভাব দৃঢ় হইয়া যায়, তখন আর কেহ তাহা মিটাইবার চেষ্টা পান না; কিন্তু ভবিষ্য পুরাণকার তাহাই করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয়, যে যখন ভারতে ক্রমে ধর্ম্মসম্প্রদায় বৃদ্ধি হইতেছিল, সেই সময়ের প্রারম্ভেই এই পুরাণ রচিত হইয়াছিল। তাহা যদি হয়, তবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দিতে এই পুরাণ লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই স্থির করিতে হয়; কারণ সেই সময়েই ভারতে এই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হইতেছিল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ

এই পুরাণ চারিভাগে বিভক্ত ও ১৮ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। সুত ঋষিগণকে এই পুরাণ বলিতেছেন, ইহা এই ভাবে লিখিত; নারদকে এই পুরাণের প্রধান অভিনেতা বলিলে অন্যায় হয় না।

প্রথম ব্রহ্মখণ্ডে সৃষ্টি প্রকরণ বর্ণনা করিয়া নারদের সহিত ব্রহ্মার বিবাদ বর্ণিত হইয়াছে; তৎপরে নারদের শিবলোকে গমন ও তথায় সঙ্গীত শিক্ষা, শিবের আজ্ঞায় মরীচির সহিত নারদের সিদ্ধাশ্রমে গমন, তাঁহার সাবর্ণীর সহিত নানাবিধ ধর্ম্মালোচনা, [illegible] উপলক্ষে নানা উপাখ্যান ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবগণে[illegible] পূজা ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় গণেশ খণ্ডে গণেশের জন্ম, কার্ত্তবীর্য্যের উপাখ্যান, পরশুরামের বিবরণ এবং জামদগ্নি ও গণেশের বিবাদ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে যে কয়খানি পুরাণের আলোচনা করিয়াছি, তাহার কোন খানিতেই গণেশের উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই প্রথম গণেশের উল্লেখ দেখিলাম; কেবল উল্লেখ নহে, গ্রন্থকার পুস্তকে গণেশের মাহাত্ম্য প্রকাশের যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছেন।

তৃতীয় শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে, কৃষ্ণলীলা বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, গোকুলে গমন, পুতনাবধ, বাল্য ও কৌমার লীলা, গোপিনীসহ রাসক্রীড়া, শ্রীরাধিকার সহিত

নির্জ্জন বিহার, অক্রুরের সহিত মথুরায় গমন, কংস বধ, কালযবন বধ, দ্বারকাগমন প্রভৃতি বিবরণ আমরা সকলেই যাহা জানি, তাহাই বিস্তৃতরূপে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষাংশে নরকাদির বর্ণনাও আছে।

এই পুস্তকখানি দেখিলেই বোধ হয় গ্রন্থকার গণেশ ও শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই এই পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এই পুরাণ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দির পূর্ব্বে লিখিত নহে, এই সময়েই ভারতে বৈষ্ণব ও গাণপত্য সম্প্রদায় দিন দিন প্রবল হইতেছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কিছুই নূতন কথা নাই।

লিঙ্গ পুরাণ।

এই পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত ও এগার হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ। বোধ হয় পাঠকগণ পুস্তকের নাম দেখিয়াই বুঝিয়াছেন, যে এই পুরাণে শিবমাহাত্ম্য প্রচার করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বভাগে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি আছে, যথাঃ—

(১) সৃষ্টি বিবরণ (২) যোগও কল্প বিবরণ (৩) লিঙ্গের উদ্ভব ও পূজা (৪) সনৎকুমার ও শৈলাদির কথোপকথন (৫) দধিচি উপাখ্যান (৬) যুগধর্ম্ম নিরূপণ (৭) ভুবনকোষ বিবরণ (৮) সূর্য্য-বংশ ও সোমবংশ (৯) সৃষ্টির বর্ণনা (১০) লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, শিবব্রত, সদাচার নিরূপণ ও প্রায়শ্চিত্ত কথা (১১) অন্ধকের উপাখ্যান

(১২) বরাহ চরিত্র (১৩) নৃসিংহ চরিত্র (১৪) জলন্ধর বধ (১৫) দক্ষযজ্ঞ (১৬) মদন ভস্ম (১৭) শিবের বিবাহ (১৮) বিনায়কের উপাখ্যান (১৯) উপমন্যুর উপাখ্যান।

উত্তরভাগে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টী আছে, যথা:— (১) বিষ্ণু মাহাত্ম্য (২) অম্বরীষ উপখ্যান (৩) সনৎ কুমার ও নন্দীশের কথোপকথন (৪) শিব মাহাত্ম্য (৫) স্নানাদি মাহাত্ম্য (৬) সূর্য্য পূজা ব্যবস্থা (৭) শিবপূজা (৮) দান ধ্যানাদি (৯) শ্রাদ্ধ বিধি (১০) মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা প্রকরণ (১১) গায়ত্রি মাহাত্ম্য (১২) শিব মাহাত্ম্য।

পাঠকগণ বোধ হয় লক্ষ করিয়াছেন যে এই পুরাণেই আমারা প্রথমে মূর্ত্তিপূজার উল্লেখ দেখিতে পাই। বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণে মূর্ত্তি পূজার কোন উল্লেখ দেখা যায না; তৎকালে ভারতবর্ষে যে মূর্ত্তি পূজা প্রচলিত ছিল, তাহাও বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বিশ্বাস, শিবলিঙ্গ গড়িয়া পূজা করা হইতেই ভারতবর্ষে মূর্ত্তি পূজার প্রচলন; লিঙ্গপূজার পূর্ব্বে ভারতে কোনরূপ মূর্ত্তিপূজার প্রচলন ছিল না। প্রথমে এই লিঙ্গমূর্ত্তিপূজাপদ্ধতি প্রচলিত হয়, তৎপরে ক্রমে নানাবিধ দেব দৈবীর মূর্ত্তি পূজা প্রচলিত হইয়াছিল; অতঃপর আমরা এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব। এ পুরাণেও নূতন বিষয় অতি অল্পই আছে।

বরাহ পুরাণ

এ পুরাণও দুই ভাগে বিভক্ত ও ১৪ হাজার শ্লোকে পূর্ণ; নানা উপাখ্যান উপলক্ষে বহুবিধ ধর্ম্মাচার শিক্ষা প্রদান করাই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত বিষয় গুলি দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, এই পুরাণে কি আছে। প্রথমে বভ্যের চরিত্র, মহাতপস্যার আখ্যান, গৌতমের জন্ম, বিনায়কের উপাখ্যান, নাগের উপাখ্যান, সেনানী ও আদিত্যের বিবরণ, দেবীগণের বিবরণ, কুবেরগণের বিবরণ, বৃষের বিবরণ, সত্যতাপসের বিবরণ, ব্রতের কথা, অগস্ত্যগীতা, রুদ্রগীতা, মহিষাসুর বধ, ও দানোপলক্ষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা, উপাখ্যান, গোদান, ব্রত ও তীর্থ ফল, বত্রিশ অপরাধের বিবরণ, প্রায়শ্চিত্তবিধি, তীর্থমহিমা, মথুরামাহাত্ম্য, যম লোকের বর্ণনা প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে তীর্থমাহাত্ম্য পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা যে পুরাতন পুরাণ নহে, তাহা গৌরির আবির্ভাবেই বুঝিতে পারা যায়। যে সময়ে বরাহ পুরাণ লিখিত হইয়াছিল, সে সময়ে ভারতে শক্তিও উপাস্যা দেবী হইয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে শাক্তধর্ম্ম মুসলমান দিগের রাজত্বকালে ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; সুতরাং বরাহ পুরাণও সেই সময়ের লেখা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

স্কন্দ পুরাণ

যত গুলি পুরাণ আছে, তাহার মধ্যে এই খানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই প্রকাণ্ড পুরাণ ছয় খণ্ডে বিভক্ত এবং ৮১ হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ, সুতরাং ইহা ভাগবত হইতে প্রায় পাঁচগুণ বৃহৎ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই পুরাণখানি একখানি পুস্তক নহে; ছয়খানি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক একত্র করিয়া তাহারই নাম যে স্কন্দ পুরাণ রাখা হইয়াছে, তাহা এই পুরাণ দর্শন করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ইহার ভিন্ন ভিন্ন ছয় খণ্ডে, সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনা; কোন খণ্ডের সহিত কোন খণ্ডের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। আমাদের যতদূর বোধ হয়, তাহাতে এই পুরাণ এক ব্যক্তির দ্বারা লিখিত নহে। কিন্ত ইহার ছয় খণ্ড যে ছয় ব্যক্তির দ্বারা লিখিত হইয়াছে, তাহাও বলিয়া বোধ হয় না। বহু লোকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই পুরাণ রচনা ও সঙ্কলন করিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

স্কন্দ পুরাণকে পুরাণের Encyclopedæa বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য পুরাণে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, প্রায় তাহার সকল বিষয়ই স্কন্দ পুরাণে লিখিত হইয়াছে। পুরাণোল্লিখিত এমন বিষয় কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহার আলোচনা ইহাতে হয় নাই; কাজে কাজেই স্কন্দ পুরাণ অতি বৃহৎ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহার ছয়টী খণ্ডের নাম, যথা:,—(১)মহেশ্বর খণ্ড (২) বৈষ্ণব খণ্ড (৩) ব্রহ্ম খণ্ড (৪) কাশী খণ্ড (৫) অবন্তি খণ্ড

(৬) প্রভাস খণ্ড। এই ছয় খণ্ডে সমস্ত আর্য্যধর্ম্মেরই আলোচনা হইয়াছে। মহাদেব কার্ত্তিককে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন, এই ভাবে সমস্ত পুরাণখানি লিখিত।

মহেশ্বর খণ্ড।—এই খণ্ডের নাম হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই খণ্ডে শিবের মাহাত্ম্যই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শিবের মাহাত্ম্যবর্ণন হইতেই পুরাণ আরম্ভ হইয়াছে, তৎপরে দক্ষযজ্ঞের উপাখ্যান, লিঙ্গ পূজা ফল, সমুদ্র মন্থন, দেবেন্দ্র চরিত্র, পার্ব্বতীর উপাখ্যান, গৌরির বিবাহ, কার্ত্তিকের জন্ম, তারকাসুরবধ, পাশুপতের উপাখ্যান, চণ্ডী বর্ণন, কার্ত্তিকের মাহাত্ম্য, পঞ্চ তীর্থ, ধর্ম্ম কর্ম্ম, রাজার উপাখ্যান, নদী ও সাগর মাহাত্ম্য, ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান, নারীবন্ধন উপাখ্যান, সৃষ্টি বর্ণনা, দমনকের উপাখ্যান, কুশাবেশ্বরের উপাখ্যান, এই সমস্ত এবং আরও বহুবিধ আখ্যান, সকলই তারকা সুরের সহিত কার্ত্তিকের যুদ্ধ উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে পঞ্চ লিঙ্গ নিবেশ, দ্বীপের উপাখ্যান, ঊর্দ্ধ লোকের স্থিতি, ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি, বর্করসের উপাখ্যান, মহাকালের জন্ম, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, তীর্থ বর্ণনা, পাণ্ডব দিগের মহিমা বর্ণন, মহাবিদ্যা সাধনা, গৌরির তপস্যা, মহিষাসুর পুত্রের উপাখ্যান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য শিব ও গৌরির জীবনাখ্যায়িকা বর্ণনা উপলক্ষে পুরাণকার আরও বহুতর বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছেন।

স্কন্দ পুরাণে আমরা প্রথম শিব গৌরির একত্র মহিমা কীর্ত্তন দেখিতে পাই; প্রাচীনতম পুরাণে কেবল শিবেরই

মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, এমনকি গৌরির নামও উল্লিখিত হয় নাই। কিরূপে ধীরে ধীরে হিন্দুধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল, তাহা বোধ হয় পাঠকগণ লক্ষ করিতেছেন; এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আমরা পরে করিব।

বৈষ্ণব খণ্ড।—বলা বাহুল্য এই খণ্ডে বিষ্ণুমাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলির আলোচনা হইয়াছে, যথাঃ—(১) রোবককুণ্ডের মাহাত্ম্য, (২) কমলার উপাখ্যান (৩) কুলালের উপাখ্যান (৪) সুবর্ণ মুয়রীর উপাখ্যান (৫) ভরদ্বাজ ঋষি ও নানা উপাখ্যান (৬) পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য (৭) মার্কণ্ডের উপাখ্যান (৮) অশ্বরীরের উপাখ্যান (৯) ইন্দ্রদ্যুম্নের উপাখ্যান (১০) বিদ্যাবতীর উপাখ্যান (১১) জৈমিনীর উপাখ্যান (১২) নারদের উপাখ্যান (১৩) নীলকণ্ঠের উপাখ্যান (১৪) নৃসিংহ উপাখ্যান (১৫) রথযাত্রা, (১৬) স্নানযাত্রা প্রভৃতির বর্ণনা (১৭) দক্ষিণামুর্ত্তির উপাখ্যান (১৮) চণ্ডির উপাখ্যান (১৯) শয়নোৎসব (২০) শ্বেত উপাখ্যান (২১) দনোৎসব (২২) ব্রতকথা (২৩) বিষ্ণুপূজা (২৪) নানাযোগ নিরূপণ (২৫) অবতার বর্ণনা (২৬) বদরিকা প্র.তি তীর্থমাহাত্ম্য (২৭) ধুম্রকোষের উপাখ্যান (২৮) ভীষ্মব্রত (২৯) ঘণ্টাবন্দনাদি ফল, পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন ফল, তুলসীদলে অর্চ্চন ফল, নৈবিদ্য মাহাত্ম্য প্রভৃতি (৩০) হরিবাসর প্রভৃতি (৩১) অখণ্ডৈকাদশী ও জাগরণ প্রভৃতি (৩২) নাম মাহাত্ম্য, ধ্যানাদি বর্ণনা (৩৩) ভাগবত মাহাত্ম্য (৩৪) মথুরা তীর্থ মাহাত্ম্য, বৈশাখ মাহাত্ম্য, জলদান, ফলদান, শয্যাদান ফল প্রভৃতি (৩৫) কামাখ্যা বর্ণন (৩৬) শ্রুতদেবের চরিত্র (৩৭) ব্যাধের উপাখ্যান (৩৮) অক্ষয় তৃতীয়াদি বর্ণন (৩৯) অযোধ্যা

মাহাত্ম্য উপলক্ষে অনেক উপাখ্যান।(৪০) সীতাকুণ্ড, সরযু, ঘর্ঘরা, গুরুকুণ্ড, প্রভৃতি পঞ্চ তীর্থের কথা এবং অন্যান্য নানা তীর্থের মহিমা।

পাঠকগণ বোধ হয় লক্ষ করিয়াছেন, যে কেবল এই পুরাণেই প্রথম ফল, ফুল' নৈবিদ্যসহ পূজাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুরাণ খানি দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হয়, এ খানি সম্পূর্ণ আধুনিক পুরাণ।"

ব্রহ্মখণ্ড।—এই খণ্ডে প্রথমেই সেতু নামক তীর্থের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে; পরে গালবের তপস্যা, রাক্ষসের উপাখ্যান প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে,—তৎপরে একাকুন্ড হনুমৎ কুণ্ড, আসর তীর্থ, রামতীর্থ প্রভৃতি নানা তীর্থ উপলক্ষে হিরণ্যাসঙ্গম, নগরার্ক, শ্রীকৃষ্ণ, সঙ্কর্ষণ, কুমারি, ক্ষেত্রপাল, ব্রহ্মাণেশ, পিঙ্গলা, সঙ্গমেশ্বর, শঙ্করার্ক, শশপান, পর্ণার্ক, অংশুমতী, বরাহ, ছহমি ছায়া লিঙ্গ, গলাক, কনকনন্দা, কটা, গণেশ, চপ, সোমেশ, বিদুর ও ত্রিলোকেশ, সবমেশ, ইন্দ্রপুরেশ, পূর্ণাপ্রাচী, ব্রাহ্মণ ও উমানাথ, ভূঙ্গার, মূলস্থল ও ব্যচনার্কেশ, অজাপনেশ, বালার্ক, কুবের স্থল, ঋষি ডোরা, সঙ্গমেশ্বর, নারদাদিত্য, কপর্দেশ্বর, গোপালস্বামী, বকুলস্বামী, এবং মরুতী, ক্ষেমার্কউন্নত, বিঘ্নেশ ও জলস্বামী, কালমেঘ, রুক্মিনী, উগ্রশীষর ও ভদ্রা, কর্ণাকুণ্ড, কপিলেশ্বর, জবদগর শিব, নল, হাটকেশ্বর, নারদেশ, মন্ত্র ভূষণ ও দুর্গকুট, এবং গণেশের উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে। তৎপরে ভগ্নতীর্থ, গুপ্ত সোমেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ মাহাত্ম্য উপলক্ষে স্বর্ণেশ, শৃঙ্গেশ এবং কোটীশ্বরের কথা, মার্কণ্ডেশ্বর, কোটীশ্বর এবং দামোদর গৃহের বিবরণ, কুন্তীশ্বর, স্বর্ণকুণ্ড, ভীমেশ্বরের কথা,

বিশ্লেশ, গঙ্গেশ, ও রৈবতের উপাখ্যান এবং অর্ব্বুদেশ্বর, প্রভৃতির উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। পরে নানা তীর্থ, বশিষ্ঠাশ্রম, ভদ্রাকর্ণের, ত্রিনেত্রের, কেদারের মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তীর্থাগমন ফল, কোটীশ্বর তীর্থ, রূপতীর্থ, সিদ্ধেশ, সক্রেশ্বর ও মনিকর্ণিশ কীর্ত্তন, শুচুবম ও বরাহ তীর্থ বর্ণন, চন্দ্র প্রভাস, নিস্তোদ, শ্রীমাতা, শুক্ল, কাত্যায়নী তীর্থ মাহাত্ম্য, পিণ্ডারক, কনখল, চক্র, মানুষ, কপিলাদি, বক্তানুবন্দ, গণেশ, পাণ্ডেশ্বর, মূলনাশক্তিস্থান, নাগোত্তব শিবকুণ্ড, প্রভৃতি বহু তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা এবং নানা উপাখ্যান উপলক্ষে ধর্ম্ম এবং নীতির আলোচনা হইয়াছে। তৎপরে মহেশ্বর, কামেশ্বর, ও মার্কণ্ডেয়ের উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে। গৌতম তীর্থ ও কুলশঙ্কর মাহাত্ম্য, রাম ও কোটী তীর্থের কথা, চন্দ্রোন্তেদ, ঈষাণ শৃঙ্গ, ব্রহ্ম ইন্দ্রেশ্বরাদির মাহাত্ম্য, দ্বারকাদি নিরূপণ, লোহাসুরের উপাখ্যান, গঙ্গাকূর্ম্ম নিরূপণ, শ্রীরাম চরিত্র, মন্দিরাদি রক্ষা ফল, জাতিভেদ বর্ণন, স্মৃতি-ধর্ম্ম নিরূপণ. বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিরূপণ, ও নানা উপাখ্যান; দান, ব্রত, তপস্যা, সত্র, প্রভৃতির বিবরণ ও ফল; শালগ্রাম নিরূপণ, তারকাসুর বধ, লক্ষ্মীর অর্চ্চনা. বিষ্ণুর শাপে বৃক্ষত্ব প্রাপ্তি, পার্ব্বতীর অনুনয়, মহাদেবের নৃত্য, হর লিঙ্গের পতন, যবনের বিবরণ, পার্ব্বতীর জন্ম, দক্ষযজ্ঞ বর্ণনা, জ্ঞান যোগের বিবরণ প্রভৃতি এই খণ্ডের পূর্ব্বভাগে লিখিত হইয়াছে। ইহার আরও একটী উত্তর ভাগ আছে; তাহাতে শিবের অদ্ভুত মাহাত্ম্য, পঞ্চাক্ষরের মাহাত্ম্য, গোকর্ণ মহিমা, শিবরাত্রের মহিমা, প্রভাস ব্রত কীর্ত্তন, সোমবার ব্রত, সিমন্তিনীর উপাখ্যান, ভদ্রায়ুর

উপাখ্যান, সদাচার ও শিবব্রত বর্ণন, শবরাখ্যান, উমামহেশ্বর ব্রত প্রভৃতি শিবমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

কাশীখণ্ড।—প্রকৃতপক্ষে এই খণ্ড কেবলই তীর্থ মহিমা বর্ণনায় পূর্ণ। পুরাণকার লোকের মনে তীর্থের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি উৎপাদনের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। সত্য-লোকের প্রভাব বর্ণনা হইতেই এই খণ্ড আরম্ভ হইয়াছে; তৎপরে অগস্ত্যাশ্রমে দেবতাগণ আগমন করিয়াছেন এবং তথায় ধর্ম্মালোচনা আরম্ভ হইয়াছে। তৎপরে পতিব্রতার চরিত্র বর্ণিত হইয়া তীর্থ যাত্রার যথোচিত প্রশংসা হইয়াছে এবং সপ্ত পুরির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। যমপুরি নিরূপণ, ধ্রুব-লোক, ইন্দ্রলোক, অগ্নিলোক প্রাপ্তি, অগ্নি বিবরণ, ঈশ্বরীর উদ্ভব, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, রবি প্রভৃতি লোকের উদ্ভব, সপ্তঋষি, তপোলোক ও ধ্রুব লোকের বর্ণনা, সত্য লোকের বিবরণ, মনিকর্ণিকা উদ্ভব, গঙ্গার সহস্র নাম ও মহিমা, বারাণসীর প্রশংসা, ভৈরবের আবির্ভাব, কলাবতীর আখ্যান, গৃহস্থ ও যোগীর ধর্ম্ম নিরূপণ, কালজ্ঞান, কাশীর বর্ণনা, যোগচর্চ্চা, শাম্বর্ক, সুপদার্থ, তাক্ষ্য তীর্থ বিবরণ, দশাশ্বমেধের উপাখ্যান, গণেশের মহিমা ও নানা উপাখ্যান, মায়ার বিবরণ প্রভৃতি, বৈষ্ণব তীর্থ বর্ণনা, মহাদেবের কাশী আগমন, শিবক্ষেত্র আখ্যান, কন্দুকেশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর, শৈলেশ্বর, কীর্ত্তিবাস, ওঁকারেশ্বর, ত্রিলোচন, কেদার, ধর্ম্মেশ্বর, বীরেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, সতীশ্বর, অমৃতেশ্বর প্রভৃতি কাশীস্থিত শিবের বিবরণ ও তদুপলক্ষে দুর্গাসুরের উপাখ্যান, এবং দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি নানা কথা লিখিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত বিশ্বেশ্বরেব মহিমা প্রভৃতিও বর্ণিত আছে। স্কন্দপুরাণের এই খণ্ড সম্পূর্ণই

কাশীর বর্ণনা, কাশীর পৌরাণিক ইতিহাস ও কাশীর মাহাত্ম্য ও মহিমা বর্ণনার পূর্ব্বে পুরাণকার স্পষ্টই কাশীর মহিমা জগতে প্রচার করিবার জন্য এই কাশীখণ্ড রচিত করিয়াছিলেন।

অবন্তি খণ্ড।—এই খণ্ডে বহু সংখ্যক তীর্থের বিবরণ ও মহিমা কীর্ত্তিত, তত্সম্বন্ধে বহুতর বিস্তারও উল্লেখ আছে। নিম্নলিখিত তীর্থ গুলির বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে, যথাঃ—কনকলেশ, অপ্সরাকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, ভদ্রভবেশ, মর্কটেশ্বর, স্বর্গদ্বার, চতুঃসিন্ধু, শঙ্করাক, গঙ্গাবতী, দশাশ্বমেধ, হনুমান, যমেশ্বর, মহাকালেশ্বর, [illegible], ভেষজাখ্য, শুক্র, অক্রুর, মন্দাকিনী, কপীদ, চন্দ্রার্ক, করভেশ, লম্ব্যকেশ, মার্কণ্ডেশ্বর, যজ্ঞবাপী, সোমেশ, নরকান্তক, কেদারেশ্বর, রামেশ্বর, সৌভাগ্যেশ্বর, নবার্ক, কেশার্ক, [illegible] মুখ, ওঁকারেশ্বর, স্বর্ণশৃঙ্গ, কুলস্থলী, অবন্তীশ্বর, উজ্জয়িনী, পদ্মাবতী, কুমুদ্বতী, রমাবতী, বিশালা, প্রতিকল্প, জরশান্তিক, শিপ্রা, সুন্দর খণ্ড, নীলগঙ্গা, পুষ্কর, বিষ্ণুবাসন, পুরুষোত্তম, অঘিনাশ, অন্ননাশন, গোমতি, বামন, কুণ্ড, কালভৈরব, বীরেশ্বর সরোবর, জয়ন্তিকা কুঠারেশ্বর, দেব সাধক, কর্করাজ, বিঘ্নেশন, রুদ্রকুণ্ড, অষ্টতীর্থ, রেবা, নর্ম্মদা, কাবেরীসঙ্গম, দারু, অগ্নি, রবি, মেঘনাথ, দ্বিদারুক দেব, মার্থদেশ্বর, কপিমালা, করঞ্জক, কুণ্ডলেশ্বর, পিঙ্গনাদ, বিলেশ্বর, ঋষ্যশৃঙ্গ, চিত্রসেন, পুষ্করিণ্যার্ক, তাপিতেশ্বর, শক্র, কব্যোটিক, কুমারেশ, অগস্ত্যেশ, মাতৃজ, লোকেশ, ধনদেশ, মঙ্গলেশ, কামেশ, গোপার গৌতম, শঙ্খচুড়জ, নর্মদেশ, নন্দিকেশ, বরুণেশ্বর, দধিলিঙ্গ, হনুমন্তেশ্বর, রামেশ্বর, সোমেশ, পিঙ্গলেশ্বর, ঋণমোক্ষ, কপিলেশ্বর, পূতকেশ্বর, জলেশ্বর, চন্দ্রার্ক, যম, কহ্লাড়ীকা, নাদিক

নারায়ণ, কোটীশ্বর, ব্যাস, প্রভাসিক, নাগেশ্বর, সঙ্কর্ষণ, মন্মথেশ্বর, অবন্তিসঙ্গম, সুবর্ণাশীল, করঞ্জ, কামদ, ভাণ্ডীর, বাহিনী, ভবচক্র, ধৌতপাপ, অঙ্গিরস, কোটি অয়োনী, অঙ্গার, ত্রিলোচন, ইন্দ্রেশ, কম্বুকেশ, সোমেশ, মোহনাশক, নার্ম্মাদ, আর্ক, আগ্নেয়, ভার্গবেশ্বর, ব্রাহ্ম, দেব, গণেশ, আদি বরাহ, রামেশ, সিদ্ধেশ, অহল্যা, কঙ্কটেশ্বর, শক্র, সৌম্য, নান্দেশ, তাপেশ, রুক্মিণীস্তব, যোজনেশ, বরাহেশ, দ্বাদশী শিব, সিদ্ধেশ, মঙ্গলেশ্বর, লিঙ্গ বরাহ, কুম্ভেশ, শ্বেত বরাহ, ভার্গবেশ, রবীশ্বর শুক্লাদি, পুষ্করস্বামী, নরকেশ, মোক্ষ, সার্প, গোপক, নাগ, সাব, সিদ্ধেশ, মার্কণ্ড, অক্রুর, কামদ, শূল, আরোগ্য, মাণ্ডব্য, গোপালেশ্বর, কপিলেশ, পিঙ্গলেশ, ভূতেশ, গঙ্গ, গৌতম, অশ্বমেধ, মৃহুকচ্ছ, কেদারেশ্বর, কপন্তলেশ্বর, জলেশ্বর, শালগ্রাম, বরাহ, চন্দ্রভাস, আদিত্য, শ্রীপতি, হংসক, শূলেশ, আগ্নেয়, শিখীশ্বর, কোটী, দশকন্য, সুবর্ণক, ঋণমোক্ষ, ভারভূতি, পুঙ্খ, মুণ্ডিও, আমলেশ্বর, কপালেশ্বর, লোটনেশ্বর প্রভৃতি শত শত তীর্থের বিবরণ, উপাখ্যান ও মহিমা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতেও পুরাণকার সন্তুষ্ট না হইয়া বলিতেছেন, সংসারে যে লক্ষতীর্থ আছে তাহার সকল গুলিরই মহিমা অপার। এই খণ্ডেও পুরাণোক্ত অধিকাংশ উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পুরাণে তীর্থকে এতই প্রাধান্য প্রদত্ত হইয়াছে যে দেখিলে বোধ হয় যেন পূজাদি অপেক্ষা তীর্থভ্রমণই এই সময়ে হিন্দুদিগের প্রধান কার্য্য হইয়াছিল।

প্রভাস খণ্ড।—পূর্ব্বোল্লিখিত খণ্ডে যে সকল তীর্থের নাম প্রদত্ত হইয়াছে, সেইগুলি এবং তদ্ব্যতীত আরও বহুতর তীর্থ প্রভৃতি এই খণ্ডে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সঙ্খেপতঃ বলিতে গেলে স্কন্দপুরাণ খানি তীর্থের পুরাণ। ইহাতে যেরূপ তীর্থের সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহাকে কখনই প্রাচীন পুরাণ বলা যাইতে পারে না। সম্ভবতঃ, কাশী হইতে এই পুরাণখানি প্রকাশিত হইয়াছিল, কারণ ইহাতে শিব মাহাত্ম্যই প্রাধান্য পাইয়াছে। ইহাতে অন্যান্য দেবতার উল্লেখ থাকিলেও এ খানিকে অনায়াসেই শৈবপুরাণ বলা যাইতে পারে।

বামণ পুরাণ।

এই পুরাণ দুইভাগে বিভক্ত ও দশ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। পূর্ব্বভাগে নিম্নলিখিত বিষয়কয়টী আছে, যথাঃ,—পুরাণ কি, ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ বিবরণ, কপাল মোচনের উপাখ্যান, দক্ষযজ্ঞ, মদনভস্ম, প্রহ্লাদ ও নারদের যুদ্ধ, দেবতা অসুরে যুদ্ধ, সুকেশী ও সূর্য্যের বিবরণ, কাম্যব্রত বিবরণ, দুর্গার চরিত্র, তপতির চরিত্র, কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা, পার্ব্বতীর জন্ম, তপস্যা ও বিবাহ, কার্ত্তিকের চরিত্র, অবজার উপাখ্যান, মরুতের জন্ম, বলির বিবরণ, লক্ষ্মীর চরিত্র, ত্রিবিক্রমের চরিত্র, প্রহ্লাদের তীর্থযাত্রা, ধুন্দুব চরিত্র, প্রেতের উপাখ্যান, সমস্ত পুরুষের আখ্যান, শ্রীদামের চরিত্র প্রভৃতি।

উত্তরভাগ "বৃহৎ বামন" নামে খ্যাত। ইহা চারিখানি সংহিতায় বিভক্ত; ১ম, মহেশ্বরী সংহিতায় শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তের কীর্ত্তন; ২য়, ভাগবতী সংহিতায় অবতার বিবরণ; ৩য়, সৌরী সংহিতায় সূর্য্যের মাহাত্ম্য; ৪র্থ, গাণেশ্বরী সংহিতায় গণেশের মহিমাদি বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে যে এই পুরাণ প্রথম পুলস্ত নারদকে বলেন, নারদ ব্যাস দেবকে বলেন, ব্যাস লোমহর্ষণকে বলেন এবং লোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যে ঋষিদিগকে বলেন। প্রধানতঃ, বিষ্ণুর মহিমা কীর্ত্তনই এই পুরাণের উদ্দেশ্য।

পুরাণ

ইহাও দুই ভাগে বিভক্ত ও ১৭ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রথম পূর্ব্বভাগে পুরাণসূচনা, তৎপরে লক্ষ্মী ও ইন্দ্রদ্যুম্নে কথোপকথন, কূর্ম্ম ঋষিগণের বিবরণ, সৃষ্টি প্রকরণ, স্বর্গ বিবরণ, শঙ্করের চরিত্র, পার্ব্বতীর সহস্র নাম, যোগনিরূপণ, ভৃগুবংশ বিবরণ, মায়াস্তব বর্ণন, দেবতাদির জন্ম, দক্ষযজ্ঞ, কশ্যপ বংশ, আত্রেয়বংশ, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র, মার্কণ্ডেয় কৃষ্ণসম্বাদ, যুগধর্ম্ম কথা, [illegible] বিবরণ, গয়ানদীর মাহাত্ম্য, প্রয়াগের মাহাত্ম্য প্রভৃতি লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় উত্তরভাগ পঞ্চ পাদে বিভক্ত। ১ম পাদে ব্রাহ্মণ দিগের সদাচার প্রভৃতির বিবরণ, ২য় পাদে ক্ষত্রিয়দিগের,

৩য় পাদে বৈশ্যদিগের, ৪র্থ পাদে শূদ্রের বৃত্তি ও ৫ম পাদে বর্ণশঙ্কর দিগের বৃত্তি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

মৎস্য পুরাণ।

এই পুরাণ চতুর্দ্দশ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহাতে আছে; যথা:—(১) নরসিংহ বর্ণনা (২) মনু ও মৎস্য বিবরণ (৩) সাকতের উৎপত্তি (৪) মদন দ্বাদশী বিবরণ (৫) লোকপাল পূজা (৬) নশ্বরত্বের বিবরণ (৭) সূর্য্য ও বৈবস্বতের উৎপত্তি (৮) বুধের উৎপত্তি (৯) পিতৃবংশ কথন (১০) শ্রাদ্ধকাল নিরূপণ (১১) চন্দ্রবংশ (১২) যযাতি উপাখ্যান (১৩) কার্ত্তবীর্য্য উপাখ্যান (১৪) সূর্য্যবংশ (১৫) ভৃগুর শাপ (১৬) বিষ্ণুর দশ মূর্ত্তিধারণ (১৭) কুরুবংশের বিবরণ (১৮) হুতাশন বংশের বিবরণ (১৯) ক্রীড়াযোগ (২০) কৃষ্ণাষ্টমীব্রত প্রভৃতির বিবরণ (২১) অনন্ত তৃতীয়া, সৌভাগ্য শয়ন, অগস্ত্য ব্রত, ভীমদ্বাদশী, অঙ্গারক প্রভৃতি বহুবিধ ব্রতের বিবরণ (২২) প্রয়াগ প্রভৃতি বহু তীর্থমাহাত্ম্য (২৩) চতুর্যুগের বিববণ (২৪) তারকাসুরের জন্ম (২৫) পার্ব্বতীর জন্ম, মদনভস্ম, বিবাহ, কার্ত্তিকের জন্ম (২৬) তারকাসুর বধ (২৭) নরসিংহের বর্ণনা (২৮) বারানসী মাহাত্ম্য, নর্ম্মদা মাহাত্ম্য প্রভৃতি তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণন (২৯) সাবিত্রী উপাখ্যান (৩০) রাজধর্ম্ম (৩১) নানা উৎপাত (৩২) গ্রহ শনির শুভাশুভ যাত্রা ও ফল (৩৩)

বরাহ মাহাত্ম্য, (৩৪) প্রতিমালক্ষণ (৩৫) দেবতা স্থাপন (৩৬) দেবমণ্ডপ লক্ষণ (৩৭) ভবিষ্য রাজাসকলের বিবরণ (৩৮) কল্পের কথা।

বিষয় গুলি দেখিলেই এখানিকে সম্পূর্ণ আধুনিক পুরাণ বলিয়া বোধ হয়।

গরুড় পুরাণ।

এই পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত ও ১৯ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। পূর্ব্বভাগে পুরাণসূচনা লিখিত হইয়া স্বর্গবর্ণন, সূর্য্যাদি পূজা বিধি, লক্ষ্মী পূজা, বিষ্ণু পূজা, শিব পূজা, গণপূজা, গোপাল পূজা, সন্ধ্যাদি উপাসনা, দুর্গার্চ্চন, সুবার্চ্চন, মূর্ত্তিধ্যান, প্রসাদের লক্ষণ, সকল দেবতা প্রতিষ্ঠা, সকল দেবের প্রথম পূজা, অষ্টাঙ্গ যোগ, দানধর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত বিধি, দ্বীপ, ঈশ্বর ও নরক বর্ণনা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, সামুদ্রিক শাস্ত্র, তীর্থের মাহাত্ম্য, গয়ার মাহাত্ম্য, শ্রাদ্ধ বিবরণ প্রভৃতি উপলক্ষে নানাবিধ উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে। তৎপরে চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ, অবতার বর্ণনা, রামায়ণ, হরিবংশ, ভারত উপাখ্যান, আয়ুর্ব্বেদ নিদান, চিকিৎসা, দ্রব্যগুণ, রোগঘ্ন বিষ্ণু কবচ, গরুড়ের কবচ, প্রশ্ন চূড়ামণি, অশ্ব চিকিৎসা, ব্যাকরণ শাস্ত্র, ছন্দ শাস্ত্র, সদাচার, নিত্যশাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র, যোগ শাস্ত্র, বিষ্ণুভক্তি, বৈষ্ণব মাহাত্ম্য, বিষ্ণুর অর্চ্চনা, বেদান্তসার, সাংখ্য, ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, গীতাসার প্রভৃতি বিষয় লিখিত হইয়াছে।

এই পুরাণের এই অংশ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যে এই পুরাণ অন্যান্য পুরাণের অনুপরে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে যে কেবল ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হইয়াছে এরূপ নহে, একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া লোকে যাহাতে সমস্ত বিদ্যা ও শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, গরুড় পুরাণরচয়িতা সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহার পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এ খানিকে একখানি Reference এর পুরাণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

উত্তরপর্ব্বে কেবল মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার বিবরণ আলোচিত হইয়াছে। ধর্ম্ম কি, পূর্ব্ব জন্ম বিবরণ, যমলোক বর্ণনা, শ্রাদ্ধের ফল, ধর্ম্ম রাজের বিবরণ, প্রেত পীড়া, প্রেতচিহ্ন, প্রেতের কারণ, প্রেতের কৃত্য, বিচার, সপিণ্ড করণ, প্রেতত্ব মোক্ষন বিবরণ, বিমুক্তিকরণ দান, প্রেতের মুক্তিকর আবশ্যকীয় দান, মৃত্যুর পূর্ব্ব ক্রীয়া, বৃষোৎসর্গ কথন, অপমৃত্যু ক্রিয়া, মনুষ্যের কর্ম্মবিপাক, কৃত্যাকৃত্য বিষয়, মুক্তির জন্য বিষ্ণুর ধ্যান, স্বর্গসুখ নিরূপণ, সপ্তলোক বর্ণন প্রভৃতি বিষয় আছে; সুতরাং এখানিকে শ্রাদ্ধের পুস্তক বলিতে পারা যায়।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

আঠার খানি পুরাণের মধ্যে এই খানিই শেষ পুরাণ। ইহা চারি পাদে বিভক্ত ও দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রথম পাদের নাম প্রক্রিয়া পাদ, দ্বিতীয় পাদের নাম অনুষঙ্গ পাদ, তৃতীয় পাদের নাম উপোদ্ঘাত পাদ ও চতুর্থ পাদের নাম

উপসংহার পাদ। প্রধানতঃ, ভবিষ্যৎ বিষয়ের আলোচনাই এই পুরাণে করা হইয়াছে।

প্রক্রিয়া পাদ।—নৈমিষ উপাখ্যান, হিরণ্য গর্ভোৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে পুরাণের সূচনা হইয়াছে।

অনুষঙ্গ পাদ।—ইহাতে মনুগণের কথা, সৃষ্টি বিবরণ, মহাদেবের বিভূতি বর্ণন, অগ্নির বিচার বিবরণ, পৃথিবীর আকার বর্ণন, ভারতবর্ষ বর্ণন, অন্যান্য দেশ বর্ণন, জম্বুদ্বীপ বর্ণন, অধঃ ও ঊর্দ্ধ লোক বর্ণন, গ্রহাচার, দেব গ্রহের বিবরণ, নীলকণ্ঠ উপাখ্যান, মহাদেবের বৈভব, যুগতত্ত্ব, যজ্ঞ প্রবর্ত্তন প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

উপোদ্ঘাত পাদ।—ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে, যথা ঃ—সপ্ত ঋষির বিবরণ, প্রজাপতির কথা, দেবাদির উদ্ভব, জয় ও ক্রীড়া, মরুদুৎপত্তি, কশ্যপের বিবরণ, ঋষিবংশ নিরূপণ, পিতৃকল্প কথা, শ্রাদ্ধ কল্প কথা, বৈবস্বতোৎপত্তি, মনুপুত্র নির্ণয়, গন্ধর্ব্বের নিরূপণ, ইক্ষাকুবংশ, অত্রিয়বংশ, রাজীব চরিত্র, যযাতির চরিত্র, যদুবংশ, কার্ত্তবীর্য্য চরিত্র, জামদাগ্নির বিবরণ, বৃষ্ণিবংশ, সগর রাজার উপাখ্যান, ভার্গবের চরিত্র, কংশবধ, দেবাসুরের যুদ্ধ, বিষ্ণু মাহাত্ম্য, কলিযুগের ভবিষ্য রাজাগণের চরিত্র বর্ণন।

উপসংহার পাদে।—মন্বন্তরের বিবরণ, ভবিষ্য মনুর কর্ম্ম চরিত্র, কল্প প্রলয় নির্দ্দেশ, কাল পরিমাণ, চতুর্দ্দশ লোক বিবরণ, নরক বর্ণন, প্রাকৃতিক লয়ের বিবরণ, সৌরপুরের বর্ণন প্রভৃতি বিষয় এই খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।

পুরাণের সমালোচনা।

প্রকৃতি।

হিন্দুর চির আদরের অষ্টাদশ পুরাণে কি কি আছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা উপরে লীপিবদ্ধ করিলাম, এক্ষণে দেখা যাউক,—এই সকলের প্রকৃতি কিরূপ।

এই সমস্ত পুরাণকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা:—প্রথম তামসিক অর্থাৎ শৈবভাবপ্রাধান্য পুরাণ, দ্বিতীয় সাত্বিক অর্থাৎ বৈষ্ণবভাবপ্রাধান্য পুরাণ, তৃতীয় সাধারণ অর্থাৎ কোন বিশেষভাবপ্রাধান্য পুরাণ নহে। আমরা আঠার খানি পুরাণকে এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া নিম্নে লীপিবদ্ধ করিতেছি।

সাত্বিক।	তামসিক।	সাধারণ।
বিষ্ণুপুরাণ	বরাহ	নারদীয়
ভাগবত	ব্রহ্ম	গরুড়
পদ্ম	লিঙ্গ	ব্রহ্মাণ্ড
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	মৎস্য	ভবিষ্য
মার্কণ্ডেয়		স্কন্দ
		অগ্নি
		কূর্ম্ম
		বরাহ
		বায়ু

ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যায়, যে শ্রীকৃষ্ণ অবলম্বনে বিষ্ণু ও তাঁহার অবতার সম্বন্ধীয় পাঁচখানি পুরাণ রচিত হইয়াছে, শিব সম্বন্ধে চারিখানি লিখিত হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট সকল গুলিতে সকল দেবদেবী ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রাচীন পুরাণ।

বিষ্ণুপুরাণকে সকল পুরাণাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। আমরা দেখাইয়াছি ব্রাহ্মপুরাণ ত্রয়োদশ শতাব্দিতে লিখিত হইয়াছে; পদ্মপুরাণ দ্বাদশ শতাব্দির শেষভাগে লিখিত হইয়াছে; ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ পঞ্চদশ শতাব্দির শেষভাগে লিখিত হইয়াছে; স্কন্দপুরাণ চতুর্দ্দশ শতাব্দির পরে লিখিত হইয়াছে; কুর্ম্ম পুরাণ ষোড়শ শতাব্দির শেষভাগে লিখিত হইয়াছে এবং ভাগবত নবম শতাব্দিতে লিখিত হইয়াছে। সময়ানুসারে পুরাণ গুলিকে নিম্নরূপ শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারা যায়।

১। বিষ্ণুপুরাণ	২। লিঙ্গপুরাণ
৩। ভাগবতপুরাণ	৪। মার্কণ্ডেয় পুরাণ
৫। ভবিষ্য পুরাণ	৬। পদ্মপুরাণ
৭। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ	৮। বামন পুরাণ
৯। স্কন্দপুরাণ	১০। কুর্ম্মপুরাণ
১১। ব্রহ্ম পুরাণ	১২। বায়ু পুরাণ

১৩। বরাহ পুরাণ	১৪। নারদ পুরাণ
১৫। অগ্নি পুরাণ	১৬। মৎস্য পুরাণ
১৭। গরুড় পুরাণ	১৮। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

উপরি উক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে বিষ্ণু পুরাণ ও লিঙ্গ পুরাণ ব্যতীত আর কোন পুরাণ মুসলমানদিগের ভারতে আগমনের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই; তবে সম্ভবমত অন্যান্য পুরাণের কোন কোন স্থল প্রাচীন হইলেও হইতে পারে। মুসলমানগণ খ্রীষ্টিয় অষ্ট শতাব্দির প্রারম্ভে প্রথমে ভারতে আগমন করেন, তৎপরে তাঁহারা দশম শতাব্দিতে দিল্লীতে সম্রাজ্য সংস্থাপন করেন। তাঁহারা ভারতে আসিয়া শৈব ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব দেখিতে পান; এই সময়ে হিন্দুর প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে শিবলিঙ্গ পূজিত হইতেছিল।

কোন পুরাণ প্রকাশের পর হইতে যে সেই সম্প্রদায় বিশেষের স্থষ্টি হইয়াছে, তাহা কোন মতেই বোধ হয় না। প্রথমে পূজা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তৎপরে কেহ সেই পূজা পদ্ধতির মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন। পুস্তকে কোন ধর্ম্ম বিশেষের কথা লিখিয়া প্রকাশ করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ কোন ধর্ম্ম বিশেষ প্রচলিত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। বিষ্ণুর পূজা ও শিবের পূজা বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল, পরে সেই সকল দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই এই সকল পুরাণ লিখিত হয়।

এই সকল পুরাণের পূর্ব্বে অতি প্রাচীনকালে মহাভারত রচিত হয়। আর ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত যে মহাভারতের

বহু পূর্ব্বে রামায়ণ হইয়াছে। রামায়ণে আমরা শিবের পূজা ও বিষ্ণুর পূজার উল্লেখ দেখিতে পাই; কিন্তু যে সময়ে শিবের লিঙ্গপূজা পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল কিনা তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। এ সময়েও শক্তি পূজার পদ্ধতি ছিল বলিয়া বোধ হয়, কারণ রাম শক্তির পূজা করিয়া ছিলেন। তবে শাক্ত বলিয়া তৎকালে যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল না, তাহা নিশ্চয়। মহাভারতের সময়ে বিষ্ণু ও শিবের পূজা ব্যতীত আর কোন পূজাপদ্ধতি ভারতে প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না, তবে এই সময়ে শিবলিঙ্গ পূজাপদ্ধতি যে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

পূজা পদ্ধতি।

আমরা দেখিলাম যে পুরাণের প্রথমকালে কেবল মাত্র বিষ্ণু ও শিবের পূজাপদ্ধতি এদেশে প্রচলিত ছিল। এই দুই দেবতার কোনরূপ প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। সময়ে শৈবধর্ম্মের প্রাবল্য হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে শিবলিঙ্গ পূজা পদ্ধতিও প্রচলিত হইল। এমন কি আমাদের বোধ হয় এই সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভারতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়েই শ্রীমৎভাগবত প্রচারিত হয়; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছিল। লোকে প্রেমভক্তির আদর্শ কৃষ্ণকে পাইয়া বিষ্ণুকে একবারে ভুলিয়া গেল। মহাভারত হইতেই শ্রীকৃষ্ণের আদর এদেশে বৃদ্ধি হইতেছিল, ভাগবতের প্রচারে কৃষ্ণের ধর্ম্ম ভারতময় ব্যাপ্ত

হইয়া পড়িল ; বিষ্ণুও সিংহাসন চ্যুত হইলেন। যতই শ্রীকৃষ্ণের জীবনীবর্ণিত পুরাণ সকল প্রকাশ হইতে লাগিল, কৃষ্ণধর্ম্মের আদরও তেমনই দেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পূর্ব্বে লোকে কেবল গভীর দার্শনিক ভাবে কল্পনার পরিচ্ছদ পরাইয়া পূজা করিত। দার্শনিকগণ বলিয়াছেন,—ভগবান তিন গুণে বিভক্ত. সত্ব, রজ, তম ; একটিতে তিনি সৃষ্টি করেন, একটিতে তিনি রক্ষা করেন, অপরটিতে তিনি ধ্বংস করেন। হিন্দুগণ এই দার্শনিক মতে বিশ্বাস করিয়া এই গুণত্রয়ের দুইটাতে মূর্ত্তি আরোপিত করিয়া সত্বগুণস্বরূপ রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু ও তমগুণস্বরূপ ধ্বংসকর্ত্তা শিবের পূজা করিতে থাকেন। সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করিয়াই নিশ্চিন্ত, সুতরাং তাঁহার সহিত মানুষের সম্বন্ধ কি?—এই ভাবিয়া তাঁহারা কখন ব্রহ্মার পূজায় ব্যগ্র হয়েন নাই। এইরূপে ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত চলিতেছিল। ক্রমে দিন দিন শৈবধর্ম্মের আদর বৃদ্ধি হইতে লাগিল ; কারণ ইহা তামসিক ধর্ম্ম। ইহার পূজাপদ্ধতি, ক্রীয়াকলাপ সমস্তই তামসিক। বিশেষতঃ, এই ধর্ম্মের কার্য্যকলাপের সহিত বৈদিক কার্য্যকলাপের সাদৃশ্য ছিল ; সুতরাং তৎকালের তামসিক প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট এই ধর্ম্ম বড়ই প্রিয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে শৈবধর্ম্মের আদর বৃদ্ধি হইবার আরও একটা কারণ ঘটিল। আরও একটা দার্শনিক মত ইহার সপক্ষতাচরণ করিল। দার্শনিক বলিলেন,— এজগতের মূলীভূত কারণ, প্রকৃতি ও পুরুষ ; তাঁহাদের সম্মিলনেই সৃষ্টি হয়, রক্ষাপায় ও ধ্বংস হয়। শৈবগণ

শিবকেই দর্শনোল্লিখিত "পুরুষ" বিবেচনা করিয়া লইলেন, ও পৌরাণিকগণ সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিস্বরূপা দুর্গার সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে বৈষ্ণবধর্ম্মাপেক্ষা শৈবধর্ম্ম আয়তনে পূর্ণতা লাভ করিল। বিষ্ণু ভগবানের কেবল একটী গুণ-বিশেষের বিকাশ মাত্র; বিষ্ণুকে ভগবানের অর্দ্ধ মূর্ত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু শিব,—এক্ষণে দার্শনিকগণের "পুরুষ" ব্যঞ্জক যে শিব হইলেন,—তিনি ভগবানের পূর্ণমূর্ত্তি; কারণ প্রকৃতি ও পুরুষই ভগবান, শিব ও সতীই প্রকৃতি পুরুষ। কাজে কাজেই বৈষ্ণবধর্ম্মাপেক্ষা শৈবধর্ম্ম পূর্ণতালাভ করিল ও লোকের নিকট অধিকতর আদরণীয় হইল। পূর্ব্বে শিবকে যে ভাবে লোকে পূজা করিত, এক্ষণে তাহারা তাঁহাকে অন্যভাবে পূজা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে শিব তমগুণের বিকাশ ছিলেন, এক্ষণে তিনি প্রকৃত পুরুষব্যঞ্জক হইলেন; কিন্তু লোকে শিবকে পূর্ব্বে যে ভাবে পূজা করিতেছিল, এক্ষণে সে ভাব তাহারা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। শিবকে তাহারা তামসিক গুণের আধার বলিয়া এখনও বিবেচনা করিতে লাগিল।

পুরুষ ও স্ত্রী সাধনার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সহজেই লিঙ্গ পূজার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়া পড়িল। ইহাতে শৈবধর্ম্ম আরও প্রবল হইল। লিঙ্গ পূজার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির স্থাপন হইলে তথায় শিবের পূজাদি হওয়ায় সাধারণলোকের নিকট সহজেই এই পূজা বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে তীর্থ পদ্ধতি ছিল না; মন্দির হওয়ায় তীর্থমহিমা প্রচারিত হইল ও তীর্থদর্শন একটী পুণ্যের মধ্যে পরিগণিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির পর হর্ষের জয় সম সম কালে, প্রাচীন ভারতে ঠিক এইরূপ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। শৈবগণ মন্দিরে শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন, তীর্থ দর্শন করিতেন, ব্রতাদি পালন করিতেন, পূর্ব্বজন্ম মানিয়া শ্রাদ্ধাদি ক্রীয়া কলাপ করিতেন। বৈদিক ক্রীয়াকলাপও কতকগুলি প্রচলিত ছিল; রাজারা অশ্বমেদ প্রভৃতি যজ্ঞ করিতেন, গৃহস্থগণ গৃহে গৃহে অগ্নি রাখিবার প্রয়াস পাইতেন।

দ্বিতীয় অবস্থা।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দির শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ ধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের সময় এইরূপ ধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সময়ে শৈব ধর্ম্মের প্রকোপে বৈষ্ণবধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। লিঙ্গপূজার অনুকরণে বৈষ্ণবগণ শালগ্রাম পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াও বৈষ্ণবধর্ম্মকে আদরণীয় করিতে পারেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে পৌরাণিকগণ শ্রীকৃষ্ণকে আসরে অবতীর্ণ করিলেন। রস কস বিহীন শিব অপেক্ষা রসময়, প্রেমময়, ভক্তিময়, বুদ্ধিময় হস্তপদবিশিষ্ট সুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া লোকে সহস্রে সহস্রে তাঁহার পূজায় ব্যগ্র হইল। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি গঠিত হইল, কৃষ্ণমূর্ত্তি মন্দিরে মন্দিরে স্থাপিত হইল, তিনি নগরে নগরে পূজিত হইতে আরম্ভ হইলেন। আমরা প্রথমে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই। সে সময়ে তাঁহাকে কেহ পূজা করিত না, কেহ তাঁহার মূর্ত্তি গড়াইয়া গৃহে গৃহে রাখিত না। রামায়ণে যেমন রাম বিষ্ণুর অবতার, মহাভারতেও শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ বিষ্ণুর

অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান চতুর, যোদ্ধা ও অসীম ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। কিন্তু মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ রামায়ণের রাম হইতে অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ; তাহাই তিনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়াই শীঘ্রই ভারতে বিদিত হইয়া পূজিত হইতে লাগিলেন। মন্দিরে প্রত্যক্ষ ঠাকুর দেখিতে পাইয়াই লোকে শিব পূজায় মাতিয়াছিল, এক্ষণে মন্দিরে মন্দিরে শিব হইতে উৎকৃষ্টতর ঠাকুর দেখিতে পাইয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণের পূজায় নিযুক্ত হইল। দেখিতে দেখিতে বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতে আবার প্রবল হইল।

যতদূর আমাদের বিবেচনা হয়, তাহাতে বোধ হয়, যে কৃষ্ণমূর্ত্তিপূজায়ই ভারতে প্রথম মূর্ত্তিপূজার সূত্রপাত। শৈবগণ প্রকৃতিপুরুষব্যঞ্জক একটী চিহ্ন মাত্র পূজা করিতেন; বৈষ্ণবগণ হস্তপদবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। উপর্য্যুপরি এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুরাণ রচিত হওয়ায়, বৈষ্ণবধর্ম্ম লোকসমাজে আরও অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠিল। ভাগবতপ্রচারে কৃষ্ণধর্ম্ম ভারতে সর্ব্ব প্রাধান্য লাভ করিল।

কিন্তু শৈবগণ হারিবেন কেন? বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন বৈষ্ণবপুরাণ রচয়িতা ছিলেন, তেমনই শৈবগণের মধ্যে শৈব পুরাণ রচয়িতাও ছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদিগের ন্যায় মানুষ দেখিয়া, তাঁহাকে আপনাদের ন্যায় বাল্যকালে ক্রীড়া, যৌবনে বিহার, ও পূর্ণ বয়সে যুদ্ধবিগ্রহ করিতে দেখিয়া এবং তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে প্রেমভক্তির আদর্শ দেখিয়া লোকে তাঁহার পূজায় নিযুক্ত হইয়াছে। শিবকে পূর্ব্বের

স্থার অজ্ঞেয়, অনন্ত, দুর্ব্বোধ, প্রকৃতিপুরুষের বিকাশস্বরূপ শিব বলিলে, শৈবধর্ম্মের জীবনের আর আশা নাই। তাহাই তাঁহারা অনতিবিলম্বে হস্তপদ দিয়া শিবকে কৈলাসনাথ করিলেন; জটাজুটধারী ভূতনাথ ভারতে দেখা দিলেন, প্রকৃতি স্বরূপা দুর্গা তাঁহার স্ত্রী হইলেন। পৌরাণিকগণ তাহাতে রং ফলাইলেন। শিবদুর্গা স্ত্রী পুরুষে কত কাণ্ড করিলেন,—দক্ষযজ্ঞ হইল, হর পার্ব্বতীর বিবাহ হইল, মদনভস্ম, তারকাসুর প্রভৃতি বধ হইল, শম্ভু নিশম্ভুর যুদ্ধ ঘটিল। শ্রীকৃষ্ণ আর কত করিয়াছেন? তিনি যাহা করিয়াছেন, হর গৌরী তাহাপেক্ষা বরং অধিকতর কাণ্ড করিয়াছেন। তাঁহারাও প্রেম এবং ভক্তির পূর্ণ বিকাশ হইলেন, অধিকন্তু তাঁহারা জ্ঞান, যোগ ও শক্তির পূর্ণ আদর্শ।

শিবের এইরূপ চিত্র প্রচারিত হওয়ায় শৈবধর্ম্ম পূর্ব্ববল লাভ করিল। লোকে দেখিল, শৈবধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম উভয়ই সমান, উভয় দেবতার কার্য্য সমান, চরিত্র সমান, জীবন সমান, সুতরাং তখন লোকে নিজ নিজ রুচি অনুসারে কেহ বা শৈব কেহ বা বৈষ্ণব হইতে লাগিল।

কিন্তু কৃষ্ণধর্ম্ম এই নবশৈবধর্ম্মের নিকট দিন দিন নিষ্প্রভ হইতে লাগিল। কৃষ্ণের কার্য্যকলাপ, পৌরাণিকগণ যাহা নিশ্চয়ই নিজ নিজ কল্পনা বলে অথবা প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে জগতে প্রচার করিলেন, শৈবপৌরাণিকগণ শিবের জীবনে তাহাপেক্ষা কল্পনা বলে অধিক রং ফলাইলেন; বিশেষতঃ, প্রকৃতিস্বরূপা দুর্গাকে পাইয়া তাঁহাদের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইল। পুরুষের জীবনাপেক্ষা স্ত্রীর জীবন স্বভাবতই লোক প্রিয় হয়; বিশেষতঃ

শিব ও দুর্গা উভয়ের জীবন যেরূপ রহস্যময়, সুমিষ্ট, সুন্দর, উপদেশ ও ধর্ম্মপূর্ণ হইল, রমণীপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের জীবন তত সুন্দর হইল না; কাজেই আবার ধীরে ধীরে শৈবধর্ম্ম লোকপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল, বৈষ্ণবধর্ম্ম যা [illegible] ক্রমে শৈবধর্ম্মই প্রবল হইল। পৌরাণিক সময়ে যেরূপ তম গুণের বিকাশ স্বরূপ শিবের পূজা ভারতে প্রবল ছিল, পৌরাণিক কালের মধ্যাবস্থায় এক সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্র[illegible] করিলেও পরে শৈবধর্ম্মই প্রবল হইয়াছিল।

কিরূপ ধীরে ধীরে হিন্দুধর্ম্ম বিকৃত হইতেছিল তাহা বোধ হয় পাঠকগণ লক্ষ করিয়াছেন। জগতের দুইটী গুণ সত্ত্ব ও তম ক্রমে কিরূপে বিভূতি লাভ করিয়া শিব ও বিষ্ণু হইলেন, পরে দার্শনিক প্রকৃতিপুরুষরূপ পরব্রহ্ম হইতে কিরূপে হরগৌরী হইয়া দাঁড়াইল, তাহাও বোধ হয় পাঠকগণ দেখিলেন। প্রথমে সত্ত্ব ও তমের দুইটী কাল্পনিক মূর্ত্তি শিব ও বিষ্ণু মানসপটে পূজিত হইত, পরে প্রকৃতিপুরুষব্যঞ্জক চিহ্ন শিবলিঙ্গ পূজিত হইতে আরম্ভ হইল; ইহার দেখাদেখি বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণ করিয়া তাঁহার পূজা আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে গাণপত্য ও সৌর এই দুইটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাহারা কখনও প্রবল হইতে পারে নাই। নানাবিধ লোক নানাবিধ রুচি অনুসারে ধর্ম্মাচরণ করে। জগতে মধ্যে মধ্যে বহুসংখ্যক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিত্তি এক মূলধর্ম্মের উপর সংস্থাপিত; কেবল মাত্র পূজা পদ্ধতি ও দেবতা প্রভেদ।

যাহা হউক, এই সময়ে আমরা ভারতবর্ষে কেবল মাত্র পাঁচটী দেবতাকে পূজিত হইতে দেখিতে পাই। (১) শ্রীকৃষ্ণ,—বিষ্ণুকে এই সময়ে স্বতন্ত্রভাবে আর পূজিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। (২) শিব,—ইনি আর এক্ষণে পূর্ব্বের সেই তামসিকভাবে পূজিত হন না। (৩) দূর্গা,—স্বতন্ত্র ভাবে দুর্গার পূজা এ সময়ে ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। (৪) গণেশ,—গাণপত্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ গণেশকে উপাস্যদেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। (৫) সূর্য্য,—সৌরগণ সূর্য্যের উপাসনা করিতেন।

এই সময়ে বহুসংখ্যক পুরাণ ও উপপুরাণ রচিত হইয়াছিল; সুতরাং বহুসংখ্যক দেবদেবীরও সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাঁহাদের কেহই পূজিত হইতেন না।

এই সময়ে বৈদিক ক্রীয়াকলাপ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়; কারণ পশ্চাদীয় পুরাণে অশ্বমেদ যজ্ঞাদির কথা দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সকল যাগযজ্ঞের পরিবর্ত্তে ব্রত, দান, স্নান, ও তীর্থ-দর্শন প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণের প্রধান অঙ্গরূপে বিবেচিত হইয়াছিল। লোকে প্রতি সপ্তাহেই উপবাস করিত, প্রতি মাসেই কোন না কোন ব্রত করিত, এবং সুবিধা পাইলেই স্নান, দান ও তীর্থ দর্শন করিত।

বৈদিক ক্রীয়াকলাপ যাগযজ্ঞ অনেকটা তামসিকভাবাপন্ন ছিল; পরে শৈবক্রীয়াকলাপ তামসিক হইলেও সম্পূর্ণ বৈদিক ব্যাপার গোমেদ অশ্বমেদ প্রভৃতি শৈবগণ অনুমোদন করিতেন না। মধ্যে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য হওয়াতেই ভারত হইতে

প্রাণীবধ প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বৌদ্ধদিগের "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" মহাবাক্য বিলুপ্ত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত দেশে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন বৈষ্ণবধর্ম্ম ও তৎপরে কৃষ্ণধর্ম্ম প্রচলিত হওয়ায় লোকে শিবের পূজায়ও প্রাণীবধ করিত না। ব্রতাদিতেও প্রাণীবধ হইত না। ভারতবাসী যতদূর সৎপ্রকৃতি, নীরিহ, ধর্ম্মভীরু, সদাচারি হইতে হয়, এই সময়ে তাহাই হইয়াছিলেন। তাহার ফল এই হইল, যে যখন মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করিলেন, তখন তাঁহারা অবাধে সেই সকল যবনদিগের দাসানুদাস হইয়া পড়িলেন।

শেষ অবস্থা।

শৈব ও বৈষ্ণবে চিরকালই বিবাদ ছিল। পদ্ম পুরাণকার শৈব পুরাণ সকলকে তামসিক বলিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে এই সকল পুরাণ লোককে নরকগামী করে। কিন্তু ভবিষ্য পুরাণকার ও পরবর্ত্তী প্রায় সকল পুরাণকার এই বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহারা শিবকে যেরূপ দেবাদিদেব বলিয়া পূজা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, বিষ্ণু ও বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণকেও সেইরূপ দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়া পূজা করিতে বলিয়াছেন; তত্রাচ যতদূর বোধ হয়, জনসাধারণের মধ্যে কখনও এই দুই সম্প্রদায়ে মিল হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পৌরাণিক কালের দ্বিতীয় অবস্থায়ও শৈবধর্ম্ম প্রবল হইয়াছিল;—সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মকে নিষ্প্রভ

করিয়া শৈবধর্ম্ম যে লোকপূজিত হইয়াছিল। ইহার কারণ—গৌরী ও তাঁহার ক্রীয়াকলাপ—তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দি হইতে দ্বাদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে শৈব ও কৃষ্ণধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত ছিল, এবং দিন দিন শৈবধর্ম্ম প্রবলতা লাভ করিতেছিল। কৃষ্ণধর্ম্ম আরও বিস্তৃতি লাভ না করিলে, হয়তো আজ ভারতে কৃষ্ণধর্ম্ম একেবারে থাকিত না।

শৈবধর্ম্ম যে কেন কৃষ্ণধর্ম্ম অপেক্ষা লোকপ্রিয় হইতেছিল, তাহা বৈষ্ণব পৌরাণিকগণ বুঝিয়াছিলেন। শিবের পার্শ্বস্থ গৌরীই যে এই প্রাধান্য লাভের কারণ, তাহা তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে ঐরূপ একটী স্ত্রী মূর্ত্তি সংস্থাপন করিতে সমুৎসুক হইলেন; কিন্ত শিবের পার্শ্বে দুর্গার অবস্থান দার্শনিক মতসম্মত, কারণ তাঁহারা প্রকৃতি ও পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, বিষ্ণু ভগবানের কেবল সত্ব গুণের বিকাশ, সুতরাং তাঁহার পার্শ্বে স্ত্রী আইসেন কোথা হইতে?

যখন সত্বতমরজগুণযুক্ত ভগবানের দার্শনিক মত প্রকৃতি পুরুষের নিকট নিষ্প্রভ হইয়া গেল, যখন শৈবগণ তাঁহাদের শিবকে এই দার্শনিকগণের প্রকৃতিপুরুষে পরিণত করিয়া লইলেন, তখন সেই মতের তরঙ্গ বৈষ্ণবধর্ম্মেও প্রবিষ্ট হইল। তাঁহারাও কতকটা বিষ্ণুকে পুরুষরূপে গণিত করিলেন, এবং পৌরাণিকগণ বিষ্ণুর একটী স্ত্রী গড়াইয়া প্রকৃতির অভাব মিটাইলেন। পুরাণকালের প্রথম হইতেই বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দুর্গা ও লক্ষ্মী কখন পূজিত হইতেন না, তাঁহারা একরূপ হতাদরে থাকিতেন। পরে শৈব পৌরাণিকগণ গৌরীর নানা কার্য্যকলাপ প্রচার করিয়া সেই সঙ্গে

সঙ্গে শৈবধর্ম্মে গৌরীরও প্রাধান্য বৃদ্ধি করিলেন। বৈষ্ণবগণ হারিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের একটী উপযুক্ত অর্দ্ধাঙ্গিনী খুঁজিয়া পান না! কিন্তু এ অভাব কয়দিন থাকে? দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মীর অবতারস্বরূপা রাধার সৃষ্টি হইল। বৃন্দাবনলীলা বর্ণিত হইয়া উপর্য্যুপরি পুরাণ লিখিত হইতে লাগিল। হরগৌরীর লীলায় অভূতপূর্ব্ব ও মনুষ্যের অসাধ্য কার্য্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার বৃন্দাবনলীলায় পূর্ণমানবলীলা বর্ণিত হইল। শৈবগণ হর গৌরীর জীবনে জ্ঞান ও শক্তির বল শিক্ষা দিয়াছিলেন, রাধাকৃষ্ণ ধর্ম্মাবলম্বীগণ সম্পূর্ণ প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা পাইলেন। লোকে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলায় মুগ্ধ হইল, রাস, দোল প্রভৃতি উৎসব তাহাদের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিল, শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে রাধার অতুলনীয় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। বৈষ্ণবধর্ম্ম যাহা কিছু বল হারাইয়াছিল, অচিরে তাহা পুনর্ব্বার লাভ করিল। দিন দিন কৃষ্ণের ধর্ম্মই ভারতে প্রবল হইতে লাগিল। আর কেহ বড় শৈব হয় না,—তবে যাঁহারা শৈব নহেন, তাঁহারাও শৈবদেবতাকে ভক্তি ও মান্য করিতে লাগিলেন। ইহার একটী কারণ ছিল, এই সময়ে পুরাণের কল্যাণে লোকের তীর্থে বড়ই ভক্তি হইয়াছিল,—তীর্থদর্শন জীবনের একটী প্রধান কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু বৈষ্ণবদিগের প্রাচীন তীর্থ ছিল না। লিঙ্গ পূজা শৈবদিগের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হওয়ায়, শৈবদিগের কতকগুলি তীর্থ অতি প্রচীন হইয়া পড়িয়াছিল,—বৈষ্ণবদিগের তাহা হয় নাই। বলা বাহুল্য, তীর্থস্থান যত প্রাচীন হয়, তাহার মান্য ততই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বৈষ্ণবগণ আপনাদের কোন প্রাচীন তীর্থস্থান না থাকায়

শৈবদিগের তীর্থে গমন করিতেন, তাহাতে কোনরূপ দ্বিধা করিতেন না। এরূপ দ্বিধা না করিবার আরও একটী কারণ ছিল। এই সময়ে যে সকল পুরাণ প্রচারিত হইতেছিল, তাহাতে শিব ও কৃষ্ণ উভয়ের মহিমা সমভাবে বর্ণিত হইয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দি হইতে আরম্ভ করিয়া, সপ্তদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত, এইরূপ পৌরাণিকধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত ছিল। তৎপরে ভারতে তান্ত্রিকধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করে। এই সময়ে লোকে দানধ্যান করিতেন, অসংখ্য ব্রত ও উপবাস পালন করিতেন, যথাসাধ্য তীর্থদর্শন করিতেন। ধনীগণ নিজ নিজ গৃহে শিবলিঙ্গ স্থাপনা অথবা রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপনা করিতেন। কৃষ্ণের অনেকগুলি উৎসব হইত, শিবের ও শিবরাত্রি প্রভৃতি কয়েকটী উৎসব করা হইত। দুই একটী উৎসবে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করিবারও নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ধূপ, ধুনা, নৈবিদ্য, বিল্বপত্র, দুর্ব্বাদল, তুলসী প্রভৃতি দিয়া দেবতার পূজা হইত। পুরাণোল্লিখিত বিষয় সকলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হওয়ায়, সকলে যথাসাধ্য পুরাণের ধর্ম্মাচরণ করিবার চেষ্টা পাইতেন।

বিশ্বাস।

এই সময়ে হিন্দুগণ স্বর্গ ও নরক বিশ্বাস করিতেন। সাত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সুখদায়ী সাতটী স্বর্গ আছে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। আর অতি কষ্টদায়ক নরক বলিয়া একটী স্থান আছে, তথায় প্রাণীগণ দণ্ডিত হয়, ইহাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা পুনর্জ্জন্ম মানিতেন; মরিলে মৃতআত্মা

প্রেতরূপে যে অধিষ্ঠান করে, তাহাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন; এবং সেই জন্য পিতৃপ্রেতগণের সন্তোষের জন্য শ্রাদ্ধাদি করিতেন।

পুরাণের কল্যাণে উপবাস, ব্রত, স্নান ও তীর্থদর্শনে তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি হইয়াছিল। তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল, যে এই সকল কার্য্য করিলে, নিশ্চয়ই যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় হইবে এবং সেই জন্য তাঁহারা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও এই সকল কার্য্য করিতেন। শেষবর্ত্তী পুরাণগুলি দেখিলেই বোধ হয়, যেন কেবল ব্রত ও তীর্থ দর্শনই তৎকালে প্রধান ধর্ম্মাচরণ হইয়াছিল, পূজাদি যত হউক না হউক, ব্রতপালন ও তীর্থদর্শন চাই চাই। ক্রমে ব্রতের সংখ্যা ও তীর্থের সংখ্যা যে কত অধিক হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ স্কন্দ পুরাণ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

বিশেষরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, এই সময়ে হিন্দুধর্ম্ম নিম্ন লিখিত রূপ ছিল বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়। হিন্দুর বিশ্বাস যে ভগবান প্রকৃতি ও পুরুষে সম্মিলিত অবস্থায় সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় করেন। এই প্রকৃতিপুরুষের রূপই শিব ও দুর্গা, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী। প্রকৃতি পুরুষ হরগৌরী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কৈলাসে বাস করিয়া অদ্ভুত পূর্ব্ব কার্য্য করিয়াছেন; বিষ্ণু ও লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারূপে গোকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অদ্ভুতপূর্ব্ব ক্রীড়া সকল করিয়াছেন। ভগবানের এই অবতার দ্বয়ের যে কোন একটিকে ফল, ফুল, নৈবিদ্য দিয়া পূজা করিলে ধর্ম্মাচরণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রত ও তীর্থদর্শন প্রভৃতিতে ধর্ম্মাচরণ হয়।

স্তব ও মন্ত্র।

এই সময়ে পূজায় স্তব ছিল, মন্ত্র ছিল না। স্তব কেবল মাত্র প্রশংসা ও গুণকীর্ত্তন, মন্ত্র কতকটা প্রার্থনার উপায় বিশেষ। স্তব পুরাণের অঙ্গ, মন্ত্র তন্ত্রের অঙ্গ; সুতরাং এ সময়ে এ দেশে মন্ত্র প্রচলিত ছিল না। হিন্দুগণ শিব, দুর্গা, কৃষ্ণ বা রাধার স্তব করিতেন, তাঁহাদের নিকট কিছুই প্রার্থনা করিতেন না; কারণ, হিন্দুদিগের পৌরাণিকধর্ম্ম সম্পূর্ণই দার্শনিকধর্ম্মভাব হইতে সমুত্থিত। হিন্দু দর্শনকারগণ ভগবানের কিরূপ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ইহা দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন;—খ্রীষ্টিয় ঈশ্বরে ও হিন্দুর ঈশ্বরে অনেক প্রভেদ। হিন্দুর ঈশ্বর মনুষ্যের কোনই উপকার করিতে পারেন না। মানুষ পূর্ব্বজন্ম বা ইহজন্মের কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করে, তবে ধর্ম্মাচরণ (ধর্ম্মাচরণ যে কি তাহা আমরা উপরে বলিয়াছি) করিলে মানুষ দিন দিন পবিত্র ভাব প্রাপ্ত হয় ও পুণ্যবান হইতে পারে। পুরাণেও ভগবান ঠিক এইরূপ, তবে তিনি সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের উপকার সাধন করেন;—পুরাণকারগণ এইটুকু বলেন, দর্শণ কারগণ তাহা বলেন নাই। সুতরাং এই অবতারের কথা ছাড়িয়া দিলে, হিন্দুর নিকট ভগবানের অস্তিত্ব থাকা না থাকা সমান হয়। ইহা ভারতীয় গভীর দর্শন শাস্ত্রের ফল।

হিন্দুর সহিত ভগবানের সম্বন্ধ অতি অল্প। তাঁহারা খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতির ন্যায় ঈশ্বরের নিকট কোন প্রার্থনা করেন না বা অনুতাপ করিয়া তাঁহার চরণে ক্রন্দন করেন না।

হিন্দু ভগবানের বিকাশস্বরূপ দেবদেবীর স্তব বা গুণকীর্ত্তন করেন, ভগবানকে আপনাদের মত ভাবিয়া, তাঁহাকে আহারাদি দিয়া, তাঁহার গুণ গাইয়া, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করেন। মুক্তির জন্য এসব নহে; ধর্ম্মাচরণ ও মুক্তির পথ পরিষ্কার করিবার জন্য এই সকল পূজা করা। ইহাতে হৃদয়ে সদ্বৃত্তি সকল উৎকর্ষতা লাভ করে, এই মাত্র। হিন্দুর ধর্ম্মে—পৌরাণিক ধর্ম্মে,—এই পূজাপদ্ধতি অপেক্ষা তীর্থদর্শন, দান-ধ্যান, স্নান, ব্রত প্রভৃতি বহুপ্রকার ধর্ম্মাচরণের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল ধর্ম্মাচরণ করিলে, জীব যে স্বর্গলাভ করিতে সক্ষম হয়, ইহাই পুরাণের উক্তি।

পুরাণের সত্যাসত্য।

হিন্দুগণ পুরাণকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু আজ কাল আর বিশ্বাস করিবেন কিনা বলিতে পারিনা। আমরা যদি বলি, যে পুরাণোল্লিখিত সমস্ত বিষয়ই সত্য, তাহা হইলে সে কথা বালকেও বিশ্বাস করিবে না। পুরাণে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, সকলই সত্য বলিলে, কেবল মিথ্যার প্রশ্রয় প্রদান করা হয়। কিরূপে শিবদুর্গা ও রাধাকৃষ্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমরা বিশেষ করিয়া পাঠক দিগকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছি; সুতরাং শিবদুর্গা ও রাধাকৃষ্ণ যে প্রকৃত জন্ম গ্রহণ করিয়া, অভূতপূর্ব্ব কার্য্য সকল করিয়াছিলেন, একথা আমরা বলিতে পারি না। তবে হয়তো কৃষ্ণ বলিয়া একজন অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বহু প্রাচীন কালে জন্মিয়া

থাকিবেন; তাঁহার জীবনের অন্ধকারময় আশ্চর্য্যজনক গল্প সকল লোকমুখে প্রচলিত ছিল। হয়তো হিমালয়ের উত্তরে শিবের স্থায় কোন যোগী জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারও জীবনের গল্প লোকমুখে প্রচলিত ছিল। পৌরাণিকগণ কল্পনার সাহায্যে এই দুই প্রাচীন ব্যক্তির জীবনের সহিত প্রকৃতিপুরুষভাব সম্মিলন করিয়া, এবং বহুবিধ গল্প যোগ করিয়া, সুন্দর মূর্ত্তিতে সুন্দর ছবি ভারতবাসীর সম্মুখে যে ধারণ করিয়াছেন, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। ইহার অধিকাংশ ভাগই যে কাল্পনিক ও কবির কবিতা, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে উপাখ্যান গুলির মধ্যে কতক গুলির ভিত্তি সত্য ঘটনাবলম্বনে লিখিত বলিয়া বোধ হয়।

কাল্পনিক হইলেও এই সকল বিষয় এমন সুন্দর ভাবে বর্ণিত, এমনই ভাবময়, এমনই দার্শনিক ভাবপূর্ণ, এমনই ধর্ম্মময়, নীতিময়, জ্ঞানময় যে ইহাতেই ভারতবাসী এত ধর্ম্মশীল, সত্যনিষ্ঠ, আতিথ্যপ্রিয়, দয়ামায়াস্নেহমমতার আধার, ভক্তি ও প্রেমের উৎস এবং সতীত্বের আকর। পুরাণের সুললিত সুন্দর এই সকল উপদেশপূর্ণ বিষয় হিন্দুর গৃহে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া হিন্দুর গৃহে এই সকল গুণের বিকাশ করিয়াছিল এবং আজও করিতেছে। হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণকে পাইয়া হিন্দু সর্ব্বদাই তাঁহাদের স্থায় হইবার জন্য ব্যগ্র, তাহাই হিন্দুজাতি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহাই আবার পৌরাণিক ধর্ম্ম হিন্দুকে একেবারে ভাল মানুষ করিয়াছিল, তেজ ও বীর্য্য হীন করিয়া ছিল; নিশ্চিন্ত, নিশ্চেষ্ট, একরূপ অভূতপূর্ব্ব জীব করিয়া ছিল। বহুসংখ্যক ভুলবিশ্বাস তাঁহাদিগের হৃদয়ে

প্রবিষ্ট করাইয়া তাঁহাদিগকে একেবারে প্রায় অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছিল, নতুবা এত সহজে যবনগণ ভারতকে পদানত করিতে পারিতেন না।

কেবল ইহাই নহে, কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় জ্ঞানচর্চ্চা হীনতা লাভ করিয়াছিল। কল্পনার সুমধুর, মিষ্ট আস্বাদ পাইয়া লোকে জ্ঞানের কঠোরতার নিকট হইতে দূরে গিয়াছিল, দিন দিন দেশে কেবলই ভ্রম বিশ্বাস বিস্তৃত হইতেছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় ও বহুপ্রকার দেব দেবীরও সৃষ্টি হইতেছিল। যে জ্ঞানের উপর হিন্দুধর্ম্ম স্থাপিত, লোকে তাহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিল। যাহা পুরাণকার প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই ক্রমে লোকাচারে পরিণত হইয়াছিল, তাহাই ধূর্ত্তের অর্থ উপার্জ্জনের উপায় ও ভণ্ডের লোক ভুলাইবার ফাঁদ হইয়াছিল। এক সময়ে যেরূপ বহু পুরাণ প্রচারিত হওয়ায় ভারতে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ আবার পরে এই বহু পুরাণ প্রচারের জন্যই হিন্দুধর্ম্মের শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছিল। এত পুরাণ ও উপপুরাণ প্রচারিত না হইলে সম্ভবমত তাহাতে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না। কিন্তু আমাদের, বিশ্বাস এত পুরাণ প্রকাশ হওয়াই হিন্দুধর্ম্মে এত সম্প্রদায়, এত মতভেদ, এত পূজাপদ্ধতি ও এত দেবদেবীর সৃষ্টি হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এত সম্প্রদায়, এত মতভেদ, এত পূজাপদ্ধতি ও এত দেবদেবীই আজ হিন্দুধর্ম্মের হীনতার প্রধান কারণ।

পুরাণের সার মর্ম্ম।

এই পুরাণরূপা বহুশাখাপ্রশাখাযুক্ত বৃক্ষে কেবল মাত্র দুইটী সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে,—এই পুরাণরূপী ঘোর অন্ধকারময়ী রজনীতে কেবল মাত্র দুইটী সমুজ্জ্বল নক্ষত্র দীপ্তিমান হইয়াছে। এই দুইটী ফুল,—হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণ। এই দুইটী নক্ষত্র,—কৈলাস ও বৃন্দাবন।

কে বীজ বপন করিয়া ছিল, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। কিরূপে ধীরে ধীরে বহুবৎসরে সেই বীজ হইতে গাছ জন্মিয়াছে তাহাও আমরা দেখাইয়াছি,—সেই বৃক্ষে কি ফুল ফুটিয়াছে, তাহাও আমরা দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। বৃক্ষের সহিত বা বীজের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? সেই বৃক্ষে যদি বহু লতা বা গুল্ম জন্মিয়া থাকে, তাহাতেই বা আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি?

এ সংসারে আমারা ধর্ম্ম চাই, অর্থাৎ আমরা সকলেই ইহকাল ও পরকাল উভয় কালে সুখী হইবার ইচ্ছা করি। এই সুখের উপায় যে কি, তাহা আমরা কেহই স্থির করিতে পারি নাই। বহুদেশে বহুলোকে ইহার বহু প্রকার উপায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। দার্শনিক একরূপ বলিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক অন্যরূপ বলিয়াছেন;—পাষণ্ড একরূপ বলিয়াছে, মহাত্মা অন্যরূপ বলিয়াছেন;—মূর্খ একরূপ বলিয়াছে, জ্ঞানী অন্যরূপ বলিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটা স্থির নিশ্চিত উপায় এপর্য্যন্ত কিছুই স্থিরিকৃত হয় নাই; তবে এই পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে, যে ধর্ম্মাচরণই ইহার একমাত্র উপায়।

মনুষ্য দুই প্রকার। কেহ জ্ঞানী, কেহ মূর্খ; কেহ চিন্তা-শীল, কেহ কল্পনাপ্রবণ। সংসারে মনুষ্যদিগকে এই দুই প্রকৃতি বিশিষ্টই দেখা যায়, সুতরাং ধর্ম্মাচরণও দুই প্রকার না হইলে এই দুইপ্রকার প্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্যের উপযোগী কোন রূপেই হইতে পারে না। আর সকলেই যে জ্ঞানী ও চিন্তা-শীল হইবে, ইহারও কোন সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই দুইটী ধর্ম্ম সংসারে আবশ্যক। কোন ধর্ম্মেই এরূপ দুইটী ভাব নাই, কেবল হিন্দুধর্ম্মেই এইরূপ দুইটী প্রকৃতিবিশিষ্ট ধর্ম্মভাব আছে।

আমরা সকলেই দেখিয়াছি, আত্মবিস্মৃত হইতে পারিলেই সুখ। কোন একটা বিষয়ে তন্ময় হইতে পারিলেই আত্ম-বিস্মৃত হইতে পারা যায়। কোন একটা কিছুতে মাতিতে পারিলেই সুখানুভব ঘটে। আমরা সকলেই প্রত্যহ স্ব স্ব জীবনে এই দৃশ্য দেখিতেছি। কেহ বা জ্ঞানালোচনায় মাতিয়া, কেহ বা প্রেমে মাতিয়া, কেহ বা কোন কার্য্য বিশেষে মাতিয়া; কেহ বা আবার সুরাপান করিয়া মাতিয়া আমরা সকলে এই সুখ লাভের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই সুখকে স্থায়ী করিতে পারিতেছি না। যে টুকু সুখকে স্থায়ী করিতে পারি, সেই টুকুই সুখ, তৎপরে দারুণ ক্লেশের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

সুখ কিসে হয়, আমরা যদি ইহা বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, মানবপ্রকৃতির বা বৃত্তির কোন একটীতে তন্ময় হইতে পারিলেই ইহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। আবার মানবপ্রকৃতিকে যদি বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, মানবপ্রকৃতির মূল,—জ্ঞান ও প্রেম।

অথবা শক্তি ও হৃদয়। জ্ঞানে শক্তি জন্মে, শক্তি হইতে আমরা কার্য্য করি। আর হৃদয় হইতে আমরা অনুভব করি; অনুভব হইতেই সুখের উপলব্ধি হয়। যাহার জ্ঞান নাই সে জড়; যাহার হৃদয় নাই সে প্রস্তর হইতেও প্রস্তর। মানুষ জ্ঞান ও প্রেম, শক্তি ও হৃদয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানবে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহার সকলই ঐ জ্ঞান ও প্রেম হইতে উৎপন্ন। আমরা যে এ সকল কথা সকপোলকল্পিত বলিতেছি, তাহা নহে; দার্শনিক গণ সকলেই একথা বহুগবেষনার পর স্থিরিকৃত করিয়াছেন।

যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে এই জ্ঞানে বা প্রেমে তন্ময় হইতে পারিলেই প্রকৃত সুখ। আর এই জ্ঞান বা প্রেমে তন্ময় হইবার উপায়ই ধর্ম্ম! কিন্তু একার্য্য সহজ নহে; জ্ঞানময় ও প্রেমময় হওয়া সহজ কার্য্য নহে! জ্ঞান বালকেরও আছে, মহর্ষিগণেরও ছিল; কিন্তু জ্ঞানের পূর্ণবিকাশমানব জীবনে হওয়া বা করা সহজ নহে। যিনি ইহাই পারিবেন, তিনিই প্রকৃত সুখী হইবেন। ইহকাল পরকাল উভয় কালের সুখের ইহাই একমাত্র উপায়। হয় আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইয়া জ্ঞানময় হও, নতুবা আত্ম বিস্মৃত হইয়া প্রেমময় হও, এতদ্ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই, সুখ নাই। সকল ধর্ম্মেরই এই মূল কথা, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই এই কথা বলেন, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই জ্ঞানময় ও প্রেমময় মহাত্মাগণের উল্লেখ আছে।

কিন্তু সংসারে থাকিয়া কিরূপে জ্ঞানময় ও প্রেমময় হইতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই প্রদান করিতে পারেন নাই। মানুষ ইহার উপায় সহস্র চিন্তায়ও স্থির

করিতে পারে নাই। তাহাই করুণাময় পরম কারুণিক পরমেশ্বর স্বয়ং সময় সময় মনুষ্য হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সংসারে থাকিয়া কিরূপে জ্ঞানময় বা প্রেমময় হইতে হয়, তাহারই চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। অন্য কোন ধর্ম্মে ইহা নাই। আমাদের চক্ষের উপর, সুন্দর রমণীয় চিত্র,—মানব সেই চিত্রের অনুকরণে সংসারে থাকিয়া ঘোর সংসারী হইয়াও জ্ঞানময় ও প্রেমময় হইতে পারে। জ্ঞানের চিত্র কৈলাস, প্রেমের চিত্র বৃন্দাবন। জ্ঞান হইতে শক্তি,—শক্তির স্বরূপিনী গৌরী। প্রেম হইতে অনুভূতি,—অনুভূতির জীবন্ত মূর্ত্তি রাধা।

এ ধর্ম্ম মানবের সৃষ্ট ধর্ম্ম নহে, ইহা কবির কল্পনা বা বাতুলের প্রলাপ নহে। অন্ধকার হইতে যিনি আলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, শূন্য হইতে যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই মানবের কল্যাণের জন্য এই দুই সুন্দর চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। তিনিই মানব মাত্রকেই বলিতেছেন,—শিবদূর্গা হও; তাহা হইলেই সুখী হইবে; ইহকাল, পরকাল অনন্ত কালের জন্য সুখী হইবে, আর অনন্ত অসীম একমাত্র সুখের অনুভূতির নামই মুক্তি। তিনিই আবার বলিতেছেন,—যদি জ্ঞান তোমার প্রকৃতির উপযোগী না হয়, তবে প্রেমিক হও; তবে রাধাকৃষ্ণ হও; তাহা হইলেই অসীম অনন্ত সুখের অনুভূতি লাভ করিয়া মুক্তির ক্রোড়ে শায়িত হইতে সক্ষম হইবে।

যেরূপে শূন্য হইতে ধীরে ধীরে জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে, যেরূপে ধীরে ধীরে বীজ হইতে গাছ সমুৎপন্ন হয়, ঠিক সেইরূপে শত সহস্র বৎসরে মানবের সম্মুখে এই দুই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাই ভগবানের ছায়া, ইহাই

ভগবানের মূর্ত্তি, ইহাই ভগবানের ছবি, ইহাই ভগবানের অবতার। মানব যদি প্রকৃত সুখের প্রয়াসী হয়,—তবে ইহাই তাহাদের সুখলাভের এক মাত্র উপায়। মানবকে সংসারে থাকিয়া কার্য্যক্ষেত্রে লীপ্ত হইয়া বসবাস করিতে হয়। অথচ পূর্ণ জ্ঞানী বা পূর্ণ প্রেমিক না হইলে মানবের মুক্তির কোনই আশা নাই। ইহা কেমন করিয়া হওয়া সম্ভব! মানব সুখ চায়, মানব আনন্দ,—চিরআনন্দ—চায়; কারণ আনন্দই মুক্তি, আনন্দই ব্রহ্ম। জলের জন্য মানবের যেরূপ প্রবল তৃষ্ণা, সুখের জন্যও ঠিক তাহার তেমনই প্রবল তৃষ্ণা। শারীরিক তৃষ্ণা নিবারণের জন্য দয়াময়ী মা পৃথিবী জলে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, আর প্রাণের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তিনি কি কিছুই সৃষ্টি করেন নাই?

শরীরে জলের অভাব হইলে তৃষ্ণা জন্মে, সেই তৃষ্ণা আমরা জলপানে দূর করি। প্রাণে সুখের অভাব হইলেই সুখের তৃষ্ণা জন্মে, কিন্তু জল যত সহজে আমরা আমাদের সম্মুখে দেখিতে পাই, সুখ তত সহজে দেখিতে পাই না। সুখ কিসে হয় আমরা দেখাইয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি, মত্ততাই সুখ। আত্মবিস্মৃত হইবার নামই মত্ততা। আমরা ইহাও দেখাইয়াছি, জ্ঞান বা প্রেমের পূর্ণ উৎকর্ষতা সাধন করিতে পারিলেই মত্ততা বা আত্মবিস্মৃতি জন্মে। প্রকৃত সুখ আর অন্য কিছুতেই নাই। জ্ঞান ও প্রেমের বীজ আমাদের সকলের হৃদয়েই আছে। প্রাণের তৃষ্ণার জল প্রাণেই আছে, কেবল আমরা ইহা সেবন করিতে জানি না, এই মাত্র। যিনি যে পরিমাণ জ্ঞান ও প্রেমে মাতিতে পারেন, তিনি তত পরিমাণ সুখী হয়েন। যিনি

যতটুকু মাতিতে পারেন, তিনি তত টুকু সুখী। একেবারে মাতিয়া যাওয়ারই নাম সুখ, একেবারে আপনাকে ভুলিয়া যাওয়াই সুখ,—একেবারে অত্মবিস্মৃত হওয়াই আনন্দ।

জ্ঞান ও প্রেমে ইহা হয়। কেবল মাত্র মুখে বলিলে এ কথা আমরা বুঝিতে পারি না। সংসারে থাকিয়া জ্ঞান বা প্রেমে একেবারে মাতিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিতে পারা যায় কিনা, একথা আমরা কিরূপে বুঝিব? কি করিলেই বা জ্ঞান ও প্রেমে মত্ত হইতে পারা যায়, তাহা না দেখাইয়া দিলে আমরা যে ইহা বুঝিতে পারি না! তৃষ্ণার জল সম্মুখে আছে দেখিতেছি, কিন্তু কি পে সেই জল সেবন করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না। সম্মুখে জল দেখিয়া আমাদের তৃষ্ণা শতগুণ বৃদ্ধি হইতেছে, আমাদের যাতনা মুহুর্মুহু বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু সেই জল কিরূপে পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না।

ভগবান কি আমাদিগকে কেবল ক্লেশ দিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি যখন তৃষ্ণা দিয়াছেন, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণার জলও সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সংসারে তাঁহার সৃষ্টিতে আমরা কোনরূপ অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাই না। তিনি প্রাণের তৃষ্ণা দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাণের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলও প্রাণে দিয়া দিয়াছেন। জ্ঞান ও প্রেমই এই জল। তৃষ্ণা আছে, জলও আছে; কিন্তু সেই জল কিরূপে পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না।

শিশুকে মাতৃস্তন্যপান করাইতে কেহ শিখায় না, তাহাকে কাঁদিতে বা হাসিতেও কেহ শিখায় না। শিশু আপনা আপনি

এ সকল করে,—তাহার হৃদয়ে কে যেন বসিয়া তাহাকে এই সকল শিখাইয়া দেয়। আমরা যাহা কিছু জানি বা শিখি সকলই "জ্ঞানের" সাহায্যে। "জ্ঞান' না থাকিলে আমাদের কি কিছু জানিবার বা শিখিবার উপায় ছিল? আবার অনুভূতিই আমাদের হৃদয়,—অনুভূতিতে আমরা সুখ দুঃখ বোধ করি। হৃদয়ে অনুভূতি না থাকিলে আমরা জড় ভিন্ন আর কিছু কি রহি? অনুভূতির নামই "প্রেম।" "জ্ঞানে" সব হয়, "প্রেমে" সব হয়, কিন্তু "জ্ঞান" ও "প্রেম" শিখাইয়া দেয় কে?

প্রাণে তৃষ্ণা আছে, সেই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রাণে জ্ঞান ও প্রেমও আছে, কিন্তু আমরা এ জল পান করিতে জানি না। অন্য কিছু হইলে আমাদের জ্ঞান ও প্রেমের সাহায্যে ইহা জানিতে পারিতাম, স্বয়ং জ্ঞান ও প্রেমকে জানাইয়া দেয় কে? জ্ঞানে ও প্রেমের পূর্ণ উৎকর্ষতা লাভ করিয়া প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইয়া কিরূপে আনন্দময় ও সুখময় হইতে পারা যায়, ইহা আমাদিগকে শিখাইয়া দেয় কে?

মুখে বলিলে ইহা শিখিতে পারা যায় না। যেমন সন্তরণ কিরূপ বলিয়া দিলে কেহই সন্তরণ করিতে পারে না, ঠিক সেইরূপ, এইরূপে জ্ঞান ও প্রেম লাভ করিতে পারা যায় বলিলে কেহই জ্ঞান ও প্রেম লাভ করিতে পারে না। এই রূপে পূর্ণ জ্ঞানী ও পূর্ণ প্রেমিক হইতে হয়, তাহা পূর্ণ জ্ঞানী ও পূর্ণ প্রেমিক হইয়া না দেখাইলে কেহই ইহা হইতে পারে না।

ভগবান সৃষ্টিতে কি অসম্পূর্ণতা রাখিয়াছেন? ভগবান হস্ত পদ বিশিষ্ট মানুষ হইয়া মানুষের ন্যায় সংসারে বাস

করিয়া মানব জাতিকে জ্ঞান ও প্রেমের উৎকর্ষতা সাধন কিরূপে করিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। যদি না দেখাইতেন, তবে তাঁহার জগতে অসম্পূর্ণতা থাকিত, তাহা হইলে তিনিও অসম্পূর্ণ হইতেন। ভগবান সম্পূর্ণতার আধার, তাঁহার জগতও তাহাই সম্পূর্ণ। তিনিই প্রানের তৃষ্ণা দিয়াছেন, তিনিই সেই তৃষ্ণার জন্য জ্ঞান ও প্রেম মানব হৃদয়ে স্থাপিত করিয়াছেন। সেই জল কিরূপে পান করিতে হইবে, তাহা শিখাইয়া দিবে কে? তিনি ভিন্ন এ কাজ অন্যের দ্বারা সম্ভব নহে, ইহা না করিলেও তিনি অসম্পূর্ণ হয়েন; তাহাই তিনি মানবকে এ শিক্ষাও দিয়াছেন।

আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা করিতে হইলে ভগবানকে হস্ত পদ বিশিষ্ট মানুষ হইতে হয়। মানুষকে শিক্ষা দিতে হইলে মানুষ হইয়া শিখাইতে হয়, অথচ তিনি মানুষ হইবেন কিরূপে? জগত হইতে বিছিন্ন হইয়া কিছুতে আসিলেই তাঁহার সম্পূর্ণতা বিলুপ্ত হয়, সুতরাং তিনি ব্যক্তি বিশেষে অবতার হইতে পারেন না। তিনি যাহা আছেন, তিনি তাহাই আছেন, তিনি অপর কিছু হইতে পারেন না। ভগবান কখনই "ভগবান নয়" হইতে পারেন না। অথচ তাঁহাকে তাহাই হইতে হইবে; তাঁহাকেই মানুষ হইয়া মানুষকে পূর্ণ জ্ঞানি ও পূর্ণ প্রেমিক হইবার উপায় দেখাইয়া দিতে হইবে।

আকাশে কিছুই নাই, অথচ আকাশের আকার আছে, আমরা আকাশ দেখিতে পাই। ঠিক সেইরূপ ভাব রাজ্যে তিনি হস্ত পদ বিশিষ্ট হইয়া মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য কলাপ

করিয়া কিরূপে পূর্ণ জ্ঞানী ও পূর্ণ প্রেমিক হইতে হয়, তাহাই দেখাইয়াছেন। ভাব রাজ্যে তিনি অবতার হইয়াছেন। নিরাকার আকাশের যেরূপ আকার আমরা দেখিতে পাই, নিরাকার ভগবান তেমনই ঠিক সাকার হইয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। একদিনে তিনি বিকাশিত হন নাই। ধীরে ধীরে বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ হয়, ঠিক তেমনই ধীরে ধীরে শত সহস্র বৎসরে তিনি অবতার হইয়াছেন। তাঁহার অবতারের শেষ হয় নাই, এখনও তিনি অবতার রূপে আমাদের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন, চিরকাল করিবেনও। মানুষ যেরূপ শিক্ষিত ও সভ্য হইতেছে, তিনিও তেমনই সেই সঙ্গে সঙ্গে বিকাশিত হইয়া পূর্ণতার ছায়া দেখাইতেছেন। যখন মানুষ অশিক্ষিত ছিল, তখন তাহাকে যেরূপ করিয়া প্রেম ও জ্ঞান লাভের উপায় দেখান হইয়াছে, মানুষ শিক্ষিত হইলে সেরূপে দেখাইলে চলে না। তাহাই তিনি ভাবরাজ্যে অনন্তকাল বিরাজ করিয়া সুন্দর আকাশের ন্যায় সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মানুষকে সুখ লাভের পথ দেখাইয়া দিতেছেন।

হিন্দুর পুরাণে ইহাই হইয়াছে। হিন্দুর পুরাণ শাস্ত্রে ভগবান এইরূপ ভাব রাজ্যে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পুরাণরূপ আকাশে কেবল দুইটী চিত্র দেখিতে পাই, পুরাণের সকল ছাড়িয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই যে রাধা কৃষ্ণ ও হর গৌরি এই দুইটী জ্বলন্ত চিত্র ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। পুরাণের এই দুইটী চিত্রই সার। বহুসংখ্যক পুরাণ প্রচারিত হইয়া এই দুই চিত্রই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

যিনি যে পুরাণ রচনা করিয়াছেন, তিনি সেই পুরাণে এই দুই চিত্রকেই নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বহু বৎসরে, বহু লোকের সাহায্যে, এই দুই চিত্রের ভাব জগতে অঙ্কিত হইয়াছে। একদিনে হয় নাই, একজনের দ্বারা হয় নাই, শত সহস্র বৎসরে কত শত লোকের সাহায্যে, শূন্যে শূন্যের উপর আকার গঠিত হইয়া এই দুই চিত্র ও মূর্ত্তি জন্মিয়াছে। জগতে যেরূপে শূন্যে আকাশ সৃষ্টি হইয়াছে, ঠিক সেইরূপে শূন্যময় ভাব জগতে শূন্যময় দ্রব্য হইতে এই হস্তপদবিশিষ্ট দুইটী চিত্র গঠিত হইয়াছে। ইহাকে ভগবানের আবির্ভাব, ও ভগবানের অবতার ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ভগবানের হস্ত পদ বিশিষ্ট অবতার হওয়া যদি কখন সম্ভব হয়, তবে ইহাই ভগবানের অবতার, এ ভিন্ন অবতার আর কিছুই নাই, হইতেও পারে না।

পুরাণ গল্পময়। নানাবিধ গল্পদ্বারা পুরাণে সদ্বৃত্তি সকলের ও সৎপ্রকৃতি সকলের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদান করা হইয়াছে। প্রহ্লাদ চরিত্র বর্ণনা করিয়া যেমন ভক্তির মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেইরূপ অন্যান্য নানা গল্পে নানা সদ্গুনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এ সকল গল্পই রাধাকৃষ্ণ বা হরগৌরীর চিত্রের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি ও ইহাদের উৎকৃষ্টতা সাধনের জন্য করা হইয়াছে। পুরাণের পর পুরাণ রচিত হইয়া ঐ সকল পুরাণে শত শত সুন্দর গল্পে ও দৃষ্টান্তে রাধাকৃষ্ণ ও হরগৌরী মূর্ত্তিকেই জ্বলন্ত রেখায় মানবজাতির সম্মুখে ধারণ করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। একদিনে এই দুই চিত্র অঙ্কিত হয় নাই, এ দুই

চিত্রে যে মনুষ্যজীবনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা মনুষ্যের কল্পনার অতীত, মনুষ্য ক্ষমতায় তাহা হয় কিনা, সে বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ। এ পর্য্যন্ত নানা দেশে নানা সাধু জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের জীবন ইঁহাদের চরণ রেণুর ও সমতুল্য নহে। পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ প্রেম ভগবানেই আছে, সুতরাং যে হস্তপদবিশিষ্ট মনুষ্য দ্বারা জীবনলীলায় সেই পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণপ্রেম দেখিতে পাই, তাহা ভগবানের অবতার ভিন্ন, আর কিছুই হইতে পারে না। সেরূপ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কেবল ভগবানেই সম্ভব, এমন কি সেইরূপ পূর্ণ প্রেমময় ও জ্ঞানময় মানবজীবনের ভাব কল্পনায় উপলব্ধি করাও মনুষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোন কবি এরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই, কখনও পারিবেন কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ। এক জনের দ্বারা এরূপ চিত্র কল্পনা করিয়া অঙ্কিত করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। বহু সাধু, বহু মহাত্মা, বহু কবি, বহু দার্শনিক এবং বহু পণ্ডিতের সাহায্যে এই দুই চিত্র ভাবরাজ্যে অঙ্কিত হইয়াছে, কেহ ইচ্ছা করিয়া ইহাদিগকে গঠিত করেন নাই। ইহাই ভগবানের অবতার, ইহাই তাঁহার জীবন্ত প্রতিমা, ইহাই মানবের পথ প্রদর্শক নক্ষত্র, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, মানব হৃদয়ের সুখের তৃষ্ণা নিবারণের এক মাত্র সুশীতল জল।

সাধু, মহাত্মা, কবি, দার্শনিক, পণ্ডিত প্রভৃতি কেহই জীবিত নাই, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ ও হরগৌরী অমর ভাবে আমাদের চক্ষের উপর জীবিত রহিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনন্তকাল হইতে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত রহিবেন, তাঁহারা অমর,

অনন্ত, অপূর্ব্ব সুন্দর। তন্নিমিত্ত ইহাই ভগবানের অবতার, ভগবানের অন্য অবতার হইতে পারে না, হওয়াও অসম্ভব। বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতি মহাত্মাগণ সাধু, কিন্তু তাঁহারা অবতার নহেন। ভগবান কিরূপে সম্পূর্ণ ভাবে অবতীর্ণ হইবেন? জগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি কিরূপে ব্যক্তি বিশেষের রূপ ধারণ করিবেন? বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, সকলেই ভগবানকে স্বীকার করিয়া, সময়ে সময়ে ভগবানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা ভগবান নহেন; তাঁহাদের পক্ষে পূর্ণব্রহ্ম হওয়া অসম্ভব। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ হস্তপদ বিশিষ্ট হইলেও তাঁহারা ভাবরাজ্যের ছবি, অনন্ত, অমর,—যীশু বা চৈতন্যের মত নহেন। তাহাই রাধাকৃষ্ণ ভগবানের অবতার, যীশু চৈতন্য অবতার নহেন।

কৃষ্ণ বা শিব যদি জন্ম গ্রহণ করিয়াও থাকেন, তাহা হইলে সে কৃষ্ণ ও শিবের সহিত আমাদের কোন সম্পর্কই নাই। তাঁহারা ভগবানের অবতারও নহেন। আজ শত শত সাধু মহাত্মা ও কবির সাহায্যে যে শিব ও যে কৃষ্ণ আমরা দেখিতেছি, তাঁহারাই ভগবানের অবতার। যে কৃষ্ণ মহাভারতের সময় ছিলেন, সে কৃষ্ণ ভাগবতের সময় ছিলেন না, ভাগবতের কৃষ্ণ আবার বৃন্দাবনলীলাপরিপূরিত পুরাণ সকলে নাই। পুরাণে যে কৃষ্ণ ছিলেন, শ্রীচৈতন্যের সময় সে কৃষ্ণ নাই। চৈতন্যের সময় যে কৃষ্ণ ছিলেন, আধুনিক কালে আবার সে কৃষ্ণ নাই। তবে আমরা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি দিন দিন পূর্ণতা লাভ করিয়া পূর্ণ প্রেমের চিত্র হইতেছেন। ব্যাসদেব

যে কৃষ্ণ আঁকিয়াছিলেন, ভাগবত রচয়িতা সেই কৃষ্ণকে আরও উজ্জ্বল করিয়া ছিলেন। পরে শ্রীচৈতন্য তাহাতে আরও রং ফলাইয়া গিয়াছেন। কবির পর কবি, সাধুর, পর সাধু, মহাত্মার পর মহাত্মা, আসিয়া এই দুই চিত্রে রং ফলাইয়া তাহাদের উৎকৃষ্টতা সাধন করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত করিবেন।

যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া এ চিত্র অঙ্কিত করিতেন তাহা হইলে আমারা ইহাকে কল্পনা মাত্র বলিয়া পরিত্যাগ করিতাম। তাহা হইলে ইহাকে কোন মতেই ভগবানের অবতার বলিতে সাহসী হইতাম না। একটু বিশেষ করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট দেখিতে পাই, জগতের সমস্ত মহাত্মার জ্ঞান ও প্রেম যেন আকার ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে এই দুই মূর্ত্তিতে পরিনত হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে।

যাঁহাদের সাহায্যে এই চিত্র জগতের ভাবরাজ্যে অঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই মহাত্মা। কেহই ভাবিয়া চিন্তিয়া বুদ্ধিবলে একাজ করেন নাই। মহাত্মাগণের বর্ণনা আমরা কতক এই পুস্তকের ভূমিকায় করিয়াছি। আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি, এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া কেহই মহাত্মা বা কবি হইতে পারেন নাই। কোথা হইতে কি এক অলৌকিক শক্তি তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগের মুখ হইতে অসীম, অনন্ত, অজ্ঞেয় অমূল্য বাক্য সকল নির্গত করিয়াছে। তাঁহাদের জীবন তাঁহাদের বাক্যের সমতুল্য নহে। তবে তাঁহাদের হৃদয়ে ঐশিক শক্তির আবির্ভাব হওয়ায় তাঁহাদের জীবনও সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতাময় হইয়াছে।

সহসা কি এক শক্তি আসিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত মানবজাতি হইতে শ্রেষ্ঠতম আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

জগতে মানবজাতির নয়নসম্মুখে ইহা এক অদ্ভুদ দৃশ্য! সকলই মানুষ, সেই মানুষের মধ্যে এক জন, হয়তো যিনি অতিশয় দরিদ্র, হয়তো যিনি ঘোর মূর্খ, হয়তো যিনি ঘোর নীচ কুলোদ্ভব, সহসা তিনিই মানব জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভগবানের রাজ্যে বিনাকারণ সত্যে কোন কাজ হয় না, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। তবে সহসা কোন কোন ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ে এ শক্তি কেন উদিত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে? সহজে ইহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে আমরা ইহার কারণও সুস্পষ্ট দেখিতে পাই।

মানব হৃদয়ে একরূপ তৃষ্ণা আছে। সেই তৃষ্ণা নিবারণ হইবার দ্রব্যও মানব হৃদয়ে আছে, কিন্ত কিরূপে সেই দ্রব্য ব্যবহার করিয়া হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হয়, আমরা তাহা জানি না। যাহার সাহায্যে আমাদের জ্ঞান ও উপলব্ধি জন্মে, সেই দুইটী বিষয় অবগত হইবার উপায় মানব জীবনে নাই। কোন বাহিরের দৃষ্টান্ত না দেখিলে আমরা কোন মতেই ইহা শিখিতে পারি না। আমরা ইহাই দেখিয়াছি, যে ভগবান ভিন্ন অপর কেহই এ শিক্ষা প্রদানে সক্ষম নহেন। আমরা আবার ইহাও দেখিয়াছি যে এ শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে ভগবানকে হস্তপদবিশিষ্ট মানুষরূপে অবতীর্ণ হইতে হয়। ভগবান রক্ত-মাংসবিশিষ্টশরীরী মানব হইতে পারেন না, সুতরাং অন্যকোন

রূপে তাঁহাকে হস্তপদবিশিষ্ট মানুষ হইয়া মানুষের ন্যায় কার্য্য সমাপন করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি, আকাশের যেরূপ আকার না থাকিয়াও আকার আছে, ভগবানেরও ঠিক সেইরূপ আকার ধারণ সম্ভব। ভাবরাজ্যেই (Ideal world) কেবল তিনি এইরূপ আকার ধারণ করিতে পারেন। ইহা করিতে হইলে তাঁহার ঐশিক শক্তি কোন ব্যক্তি বিশেষে ন্যস্ত করিয়া তাঁহারই সাহায্যে কেবল এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন। ভগবান তাহাই করিয়াছেন।

ভগবান মানবহৃদয়ে সুখেরতৃষ্ণা দিয়াছেন। সুখ লাভের একমাত্র উপায় জ্ঞান ও প্রেমে তন্ময় হওয়া অর্থাৎ মানবকে সুখী হইতে হইলে পূর্ণ জ্ঞানী বা পূর্ণ প্রেমিক হইতে হইবে। কিরূপে পূর্ণ জ্ঞানী ও পূর্ণ প্রেমিক হইতে হয়,—ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে মনুষ্যরূপ ধারণ করিতে হইয়াছে। তিনি মানুষ হইতে পারেন না, কাজেই তাঁহাকে ভাবরাজ্যে চিত্র রূপে আবির্ভূত হইতে হইয়াছে। এ চিত্র তিনি স্বয়ং আঁকিতে পারেন না কাজেই তাঁহার শক্তি ব্যক্তিবিশেষে ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে এ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইয়াছে। যাঁহাদের সাহায্যে তিনি এই কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহারাই মহাত্মা সাধু ও কবি।

বৃক্ষের জ[illegible], মৃত্তিকা ও বীজ আবশ্যক। তিনটী সম্মিলিত হইলে [illegible] বৃক্ষ জন্মে। মানুষ পূর্ণ জ্ঞানী বা পূর্ণ প্রেমিক হইতে [illegible] জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত চাই, সেই দৃষ্টান্ত গঠনের জন্য [illegible] l world) চাই, ভাবরাজ্যে হস্ত পদবিশিষ্ট মনু[illegible] আর সেই চিত্রে পূর্ণ জ্ঞান ও

পূর্ণ প্রেম প্রকাশের জন্য বাক্য চাহি। এই বাক্যই এ বৃক্ষের বীজ। তাহাই ভগবান কোন কোন ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ে নিজ ঐশিক শক্তি বিকীর্ণ করিয়া এ বীজের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে প্রণালীতে জল নির্ম্মিত হইতেছে, ফুল ফুটিতেছে, মানবের জন্ম হইতেছে, ঠিক সেই নিয়মেই মানব জীবনের দৃষ্টান্তস্বরূপ এই রাধাকৃষ্ণের ও হরগৌরীর অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে।

ধর্ম্ম অর্থে নিয়ম। বৃক্ষ হইলেই ফুল ফুটে, এই জন্যই বৃক্ষের ধর্ম্ম ফলফুলধারণ। ঠিক এইরূপ মানুষেরও একটী ধর্ম্ম আছে। মানুষ সুখ চায়,—সুখ পাইতে হইলে পূর্ণ জ্ঞানী ও পূর্ণ প্রেমিক হইতে হয়। ইহা হইবার উপায় একমাত্র জলন্ত দৃষ্টান্ত,—সেই দৃষ্টান্ত রাধাকৃষ্ণ ও হরগৌরী; সুতরাং মানুষের যদি কিছু প্রকৃত ধর্ম্ম থাকে, তবে সে ধর্ম্ম সুখ-উপার্জ্জন; সুখ-উপার্জ্জন অর্থে রাধাকৃষ্ণ ও হরগৌরীর ন্যায় পূর্ণ প্রেমিক ও পূর্ণ জ্ঞানী হওয়া। ইহা হইতে পারিলেই পরমানন্দ, আর আনন্দই মুক্তি,—মুক্তিই ব্রহ্ম। এই জন্যই হিন্দু ধর্ম্মই কেবল সত্য, অমর, অনন্ত, সনাতন ধর্ম্ম। মানবজাতির পক্ষে এই ধর্ম্ম ভিন্ন আর অন্য ধর্ম্ম নাই।

রাধা কৃষ্ণ।

উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত, পশ্চিমে সিন্ধুনদ হইতে পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত, এই বিস্তৃত ভারতের যে প্রদেশেই দৃষ্টিপাত করি, তাহার সর্ব্বত্রই মন্দিরে মন্দিরে সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও সুন্দরতর শ্রীমতী রাধার মূর্ত্তি দেখিতে পাই। পীতবসনধারী ধড়াচূড়ায় শোভিত বংশী হস্তে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান, বামে সকল সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তার আধার শ্রীমতী রাধা বিরাজিতা। এমন সৌন্দর্য্য আর নাই, এমন কমনীয়তা আর হয় নাই। ভারতে এই সুন্দর মূর্ত্তি মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শত সহস্র বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এই শত সহস্র বৎসরে কত শত মহাত্মা এই মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া প্রেম-সাগরে ডুবিয়া মুক্তির তীরে উপনীত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের ন্যায় মহা পণ্ডিত রাধা কৃষ্ণের নামে প্রেমাকুল হইয়া গৃহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া রাধা রাধা ধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ প্রেমে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। আজও দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে রাধাকৃষ্ণের নামে শত সহস্র লোক ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া প্রেমানন্দে মাতিয়া আনন্দরূপী ব্রহ্মকে উপভোগ করিতেছেন।

এমন মধুময় শ্রীকৃষ্ণ,—ইনি কে? পুরাণের পর পুরাণ রচিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জীবনি, কার্য্য-কলাপ, লীলাখেলা, সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণের শ্রীকৃষ্ণে কবিগণ রং ফলাইয়া আরও অধিকতর সুন্দর করিয়াছেন। তৎপরে

মহাত্মার পর মহাত্মা, সাধুর পর সাধু জন্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অপূর্ব মূর্ত্তিতে গঠিত করিয়া জগতের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

মথুরায় যে সময়ে দুর্দ্দান্ত কংশরাজা প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে বসুদেবের ঔরসে ও দৈবকীর গর্ব্ভে অষ্টমমাসে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। কংশরাজা গণনার দ্বারা জানিয়াছিলেন, যে দৈবকীর গর্ভস্থ শিশুর হস্তেই তাঁহার নিধন হইবে, তাহাই তিনি সেই শিশুকে নিহত করিবার জন্য বসুদেব ও দৈবকীকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহাই হউক, যথা সময়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিলে, বসুদেব কোন গতিকে সেই শিশু লইয়া সেই রাত্রে ঝড়, বৃষ্টি, দৈবদুর্য্যোগ, না মানিয়া যমুনা পার হইয়া, অপর পারস্থ গোকুলে আগমন করিলেন। গোকুলে বহুসংখ্যক গোপগণ বাস করিত, নন্দ তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। ঠিক এই দিবসেই নন্দের কন্যা হইয়াছিল বসুদেব নন্দের আলয়ে আসিয়া কোন গতিকে এই শিশুর পরিবর্ত্তে তাঁহার কন্যাটীকে লইয়া সেই রাত্রেই মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে দুর্দ্দান্ত কংশের হস্ত হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু নন্দের কন্যা নিহত হইল।

এই ঘটনা উপলক্ষে অনেকানেক আশ্চর্য্য-জনক গল্পের উল্লেখ হইয়াছে। ভাদ্র মাসের পূর্ণ হৃদয়া যমুনা ঝড় বৃষ্টিতে উৎক্ষিপ্তা, সেই তরঙ্গমালাপারপুরিত যমুনা পার হইবার উপায় কিছুই নাই, সেই রাত্রে একখানি নৌকা কোথাও ছিল না, থাকিলেও কেহ সে সময়ে যমুনা পার হইতে সাহসী নহে।

এই সময়ে বসুদেব দেখিলেন, একটী শৃগাল অনায়াসে যমুনা পার হইয়া যাইতেছে। তিনি তাহাই দেখিয়া সেই শৃগালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া অনায়াসে নির্ব্বিঘ্নে যমুনা পার হইলেন। এরূপ আরও বহুতর আশ্চর্য্যজনক গল্প উল্লিখিত হইয়াছে, এই সকল গল্প সত্য বা মিথ্যা হইলে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের বা তাঁহার অবতার ভাবের কোনই বৈলক্ষণ্য হয় না। এই জন্য এই সকল আশ্চর্য্যজনক গল্পের উল্লেখ বা আলোচনা আমরা করিব না, তবে কোন কোন স্থলে উল্লেখ করিব মাত্র।

যাহাই হউক, নন্দের আলয়ে শ্রীকৃষ্ণ দিন দিন বড় হইতে লাগিলেন। যশোদার নিকট তিনি তাঁহার গর্ভজাত পুত্র হইলেও বোধ হয় এত ভালবাসা পাইতেন না। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ ভাল বাসিতেন, তেমন ভাল এ পর্য্যন্ত কোন জননী নিজ সন্তানকে কখনও বাসেন নাই। এক মুহূর্ত্তের জন্যও যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে নয়নান্তরাল করিতেন না, এক মুহূর্ত্ত তিনি তাঁহার কৃষ্ণকে না দেখিলে উন্মাদিনীপ্রায় হইতেন। কৃষ্ণকে পাইয়া মা যশোদা গৃহ সংসার ভুলিয়াছিলেন। কৃষ্ণকে তিনি ক্রোড়ে লইয়া আদর করেন, কৃষ্ণকে তিনি ক্ষীর, ননী, সর, খাওয়ান, কৃষ্ণের সহিত তিনি দিবা রাতি ক্রীড়া করেন,—শিশু কৃষ্ণই তাঁহার জীবনের একমাত্র মূল মন্ত্র হইয়াছেন।

ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন আর তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সহিত খেলা করা সম্ভব নহে, তাহাই নিদারুণ হৃদয়বেদনা সত্যেও মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে অন্যান্য গোপবালকগণের সহিত গোচারণের জন্য মাঠে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে মাঠে যাইতে দিতে যশোদার হৃদয়ে কতই

ক্লেশ, কতই ভাবনা, কতই উদ্বেগ। তাঁহার গৃহে ফিরিতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে যশোদা উন্মাদিনী প্রায় হইতেন। তিনি প্রত্যেক রাখাল বালকের হাত ধরিয়া আদর করিয়া বলিয়া দিতেন, "তোরা আমার কৃষ্ণকে দূরে যেতে দিস্ না, সকালে সকালে বাড়ী ফিরাইয়া আনিস; দেখিস্ যেন কৃষ্ণ আমার যমুনার ধারে না যায়, রোদ হইলে তাহাকে গাছের ছায়ায় রাখিস্।" একবার নয়, শত শত বার ব্যাকুলা যশোদা প্রত্যেক রাখাল বালককে এ কথা বলিতেন। তৎপরে অতি যতনে ও অতি আদরে কৃষ্ণকে মনের সাধে সাজাইয়া গোঠে পাঠাইতেন।

গোঠে গিয়া একি অপূর্ব্ব দৃশ্য ঘটিল! রাখাল বালকগণ সকলেই কৃষ্ণের জন্য পাগল। কৃষ্ণভিন্ন তাহাদের আর গোঠে যাওয়া হয় না। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে রাখাল বালক গণ যে যাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নন্দের আলয়ে আসিয়া সমবেত হইয়া ডাকিতেছে,

"আয় রে আয় কানাই বলাই।"

কানাইকে না লইয়া তাহারা কেহই আর গোঠের দিকে একপদ অগ্রসর হয় না। তাহারা সকলে এত প্রত্যূষে আসিয়া নন্দের দ্বারে কোলাহল আরম্ভ করিত, যে তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইত, যে তাহারা অতি কষ্টেই একরূপে রাত্রি যাপন করিয়া কানাইয়ের সহিত সম্মিলিত হইতে ছুটিয়াছে। সমস্ত দিন তাহারা সকলে কৃষ্ণের সহিত অতিবাহিত করে, একমুহূর্ত্তও কেহ তাঁহার পার্শ্ব হইতে যাইতে চাহে না। গোচরণ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে, সমস্ত দিন গাভিগণ কোথায় থাকে, কোথায়

যায়, তাহা তাহাদের জ্ঞান নাই। কৃষ্ণ লইয়াই তাহারা পাগল,—কৃষ্ণের সহিত খেলা ধুলারই তাহারা সমস্ত দিন কাটাইয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে গৃহে প্রত্যাগমন করে।

ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তখন তাঁহার সুমধুর বংশীধ্বনি সমস্ত গোকুলে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। বাল্যকাল হইতেই তিনি তাঁহার বংশী বাজাইয়া রাখাল বালকগণের মন হরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার দৃষ্টি গোকুলের গোপিনী গণের প্রতি পড়িল। প্রত্যহই সকালে বৈকালে গোকুলের গোপবালাগণ সকলেই যমুনায় স্নান, অবগাহন, ও জল লইতে আসিতেন। কৃষ্ণ যমুনা তীরস্থ সুন্দর কদম্ব বৃক্ষের শাখায় বসিয়া সুমধুর বংশী নিনাদ করিতেন। তাঁহার প্রাণমনহরণকারী বংশী ধ্বনিতে গোপবালাগণের হৃদয় বিমোহিত হইয়া গেল। তাঁহারা সকলেই মুরারীমোহন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। সুবিধা বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের সহিত হাস্যপরিহাস, কৌতুক করিতে আরম্ভ করিলেন। আজ তিনি তাঁহাদের গায় বারি বরিষণ করেন, কাল তিনি তাহাদের বস্ত্র লইয়া বৃক্ষের শাখায় উঠেন!

ক্রমে এক দুই করিয়া সমস্ত গোপকামিনীগণ,—কি বালিকা, কি প্রৌঢ়া, কি বৃদ্ধা,—সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইলেন। ক্রমে তাঁহারা কৃষ্ণের জন্য এতই পাগল হইলেন, যে তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইল, কুল, মান, সম্ভ্রম, সকলই হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইল, তাঁহারা গৃহ সংসার ভুলিয়া গেলেন। রাত নাই, দিন নাই, সকাল নাই, বৈকাল নাই, সকল

সময়েই তাঁহারা সকলে কৃষ্ণ সহবাস সুখ উপলব্ধি করিবার জন্য যমুনার তীরে ধাবিতা। আর কুলের ভয় নাই, আর পিতা মাতা স্বামীর ভয় নাই, আর গুরুজনের গঞ্জনা ও কলঙ্কের শঙ্কা নাই, সহস্র যাতনা সত্বে, সহস্র লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সত্বেও গোপবালাগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের নিকট ধাবিতা হয়েন। একবার কৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে না হইতে তাঁহারা আত্মজ্ঞান বিরহিতা হইয়া সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যমুনার তীরে ছুটিতে থাকেন।

আর ভয় ভয়, লুকাচুরি নাই। কুঞ্জে কুঞ্জে কৃষ্ণসহ গোপবালাগণ বিহার করেন, যমুনার তীরে সুন্দর বৃন্দাবনের সৃষ্টি হইয়াছে। গোপিনীগণ গৃহ সংসার ভুলিয়া মুরারীমোহন বংশীবদন বাঁকাশ্যামের প্রেমে ক্ষেপিয়াছেন। গৃহে গৃহে গোপিনীগণ ভাবেন,

"ওইগো ওই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।"

বাঁশীর মোহিনী শক্তি সমস্ত গোকুলে এমনই বিকীর্ণ হইয়াছে, যে, গোপিনীগণের প্রেমময় মনতো ভুলিবেই—

"যমুনা বহে উজান বাঁশী শুনিতে।"

যেখানে অর্দ্ধশিক্ষিত গোপগোপিনীগণ বাস করিত, যেখানে গোচারণ ভিন্ন কোন কাজ ছিল না, যথায় সর্ব্বদাই ক্ষীর, ননী, সর প্রস্তুত ভিন্ন আর কিছুই হইত না, সেই গোকুলে প্রেমের হাট বসিয়া গিয়াছে। কুঞ্জে কুঞ্জে গোপবালাগণ শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন।

প্রেমের এই সীমা নহে। গোপিনীগণের প্রেমের এই অন্ত নহে। ষোড়শত গোপিনী কৃষ্ণপ্রেমে পাগল, কৃষ্ণসহ

কুঞ্জে কুঞ্জে দিবস রজনী বসবাস করিয়া, আমোদ প্রমোদ করিয়া, বিহার করিয়াও গোপিনীগণের প্রেমতৃষ্ণা উপসমিত হয় নাই। তাঁহাদের প্রেম যেন শত সহস্র বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় কোথায় কি এক অনির্ব্বচনীয় সাগরের দিকে ছুটিতেছে।

অবশেষে সেই সাগর মিলিল। গোকুলে রাধার আবির্ভাব হইল। সমস্ত গোপিনীগণের, বৃন্দাবনের ষোড়শত গোপ বালার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম যেন একত্রিভূত হইয়া রাধায় পূর্ণ বিকাশ পাইল। শ্রীমতী রাধা আয়ান ঘোষের স্ত্রী, কুলবালা, আয়ান সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মামা। কিন্তু হইলে কি হয়,—প্রেমের নিকট ভেদাভেদ নাই, পার্থক্য নাই, বৈষম্য নাই, সমাজ নাই, কুল নাই, লোকলজ্জা নাই,—প্রেমের নিকট কিছুই নাই। রাধা কৃষ্ণময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য উন্মাদিনী হইলেন। রাধার প্রেমের তুলনা হয় না। প্রেম যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া রাধা রূপে জগতে আবির্ভূতা হইলেন। প্রেম ভিন্ন রাধার আর কিছুই নাই। রাধা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিলে ঝড়, বৃষ্টি, উল্কাপাত মানেন না;—রাধা কৃষ্ণ নামে মূর্চ্ছিতা হয়েন,—রাধা কৃষ্ণবর্ণ তামালবৃক্ষ দেখিলে কৃষ্ণ বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করেন;—রাধা চারি দিকেই কৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখেন,—আকাশে মেঘ উঠিলে তিনি কৃষ্ণ ভাবিয়া যমুনাতীরে উন্মাদিনীর প্রায় ছুটিতে থাকেন। প্রেমের এরূপ চিত্র এ সংসারে আর নাই। রাধাতে রাধা আর নাই, রাধা প্রেমে পরিণতা হইয়াছেন। এ সংসারে রাধা নাই, রাধা কৃষ্ণরূপ সাগরে মিশাইয়া গিয়াছেন। ইনি যদি দেবী না হয়েন, তবে দেবী কে?

গোপিনীগণ পূর্ব্বে কৃষ্ণ সহ আমোদ প্রমোদে সুখী হইতেন, এক্ষণে রাধার সহিত কৃষ্ণের মিলন ঘটাইয়াই তাঁহাদের পরমানন্দ। তাঁহারা কেহ কৃষ্ণ রাধার জন্য পুষ্পসয্যায় কুঞ্জ সাজাইতেছেন, কেহ বা মনের সাধে শ্রীমতীর অঙ্গ ভূষণ ভূষায় বিভূষিত করিতেছেন; কেহ বা আবার কৃষ্ণকে আনিবার জন্য গোকুলে ছুটিতেছেন, কেহ বা আবার বিরহিনী রাধাকে নানা প্রবোধ বাক্য বলিয়া সান্ত্বনা করিতেছেন। আনন্দ,—সমস্ত বৃন্দাবন আনন্দময়,—গোকুলে আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই নাই। ষোড়শত গোপিনীর মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ, কলহ বিচ্ছেদ একবারেই নাই,—কেবলই আনন্দ, কেবলই উৎসব।

আজ জোৎস্নায় প্রস্ফুটিত সুন্দর বৃন্দাবনে সুন্দর পূর্ণিমার গোপিনীগণ সহ রাধা কৃষ্ণের সহিত রাসলীলায় আত্মজ্ঞান বিরহিতা হইয়াছেন। সখীগণ হাসিতেছে, গাইতেছে, নাচিতেছে, কৃষ্ণরাধাকে মধ্যে রাখিয়া তাঁহারা পূর্ণিমায় রাস করিতেছেন। রাসের পর দোল, হোলি খেলা আরম্ভ হইয়াছে।

হোলি খেলে প্যারে লাল
লালে লাল।
লাল ভ্রমরা, লাল ময়ূরা,
লাল যমুনা কি জল।

সমস্ত বৃন্দাবন লাল হইয়া গিয়াছে। লাল ভিন্ন আর কিছুই নাই। গোপিনীগণ শ্রীমতী রাধাসহ, গোপগণ শ্রীকৃষ্ণসহ, আবিরে আবিরে আবিরময়;—আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই নাই। সকলই আনন্দ, সকলই প্রেম, সকলই উন্মত্ত। দোলের পর ঝুলন;—কৃষ্ণরাধাকে ঝুলনে বসাইয়া সখীগণ প্রেমানন্দে দোল

দিতেছে। দিনে দিনে উৎসব, দিনে দিনে আমোদ প্রমোদ, দিনে দিনে কেবলই আনন্দ! গোকুলে আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই নাই।

যমুনার অপর পারে প্রেমের রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে; দরিদ্র নন্দ ঘোষের পুত্র কৃষ্ণ প্রেমের রাজ্য খুলিয়াছেন। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সকলই কৃষ্ণ নামে পাগল হইয়াছে। তাহাদের রাজা কৃষ্ণ, তাহাদের আহার বিহার কৃষ্ণ, তাহাদের জীবন কৃষ্ণ; কৃষ্ণ ভিন্ন তাহাদের আর কিছুই নাই। সামান্য গোপবালক সমস্ত গোকুল মাতাইয়াছে. গোকুলের গোপ ও গোপিনীগণ তাহার পদানত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী শক্তি দিনে দিনে চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে, ক্রমে যমুনার পরপারস্থ অধিবাসী ও অধিবাসিনীগণও কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হইয়া যমুনা পার হইতেছে।

কংশরাজা ভীত হইলেন। তাঁহার প্রজাগণ আর তাঁহাকে মানে না; কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া তাহারা পাগল হইয়াছে। কৃষ্ণ মরিতে বলিলে তাহারা মরে, কৃষ্ণ বাঁচিতে বলিলে তাহারা বাঁচে। এ কৃষ্ণ সামান্য নহেন। কংশ নিজ সিংহাসন বিপদস্থ ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু ইহার ফল এই হইল যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইলেন। তখন গোকুলের গোপবালক মথুরায় আসিয়া কংসের সিংহাসনে রাজা হইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

তিনি গোকুলের খেলা ভুলিয়া গেলেন। কোন দিন যে তিনি গোকুলে গোপিনীগণ সহ এত আমোদ প্রমোদ করিয়াছিলেন, মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলে তাহা আর

বোধ হয় না। কোথায় সে রাস, দোল; হলি খেলা, কে থায় সে গোপিনীগণ, শ্রীমতী রাধা! কোথায় সে বালক বালিকা, কোথায় মা যশোদা! শ্রীকৃষ্ণ আর সে শ্রীকৃষ্ণ নাই। শৈশবে তিনি মা যশোদাকে হৃদয় দিয়াছিলেন, কিন্তু যেই রাখালগণকে পাইলেন, অমনি মা যশোদাকে ভুলিলেন। আবার যেই গোপিনীগণ সহ রাধাকে পাইলেন, অমনি তিনি প্রাণসম রাখালগণকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন। মা যশোদাকে ভুলা সম্ভব, রাখাল বালকগণকেও বিস্মৃত হওয়া সম্ভব, কিন্তু রাধাকে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ভুলিলেন! তুমি আমি হইলে পারিতাম না, বরং বৃন্দাবনে কোন এক কুটির বাঁধিয়া উভয়ে বাস করিতাম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রেমসিন্দু শ্রীগোবিন্দ, প্রেমাতুরা রাধাকে ভুলিয়া মথুরায় গিয়া রাজা হইয়া বসিলেন; গোকুলের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। যখন কাঁদিতে কাঁদিতে রাখাল বালকগণ তাঁহাকে গিয়া ধরিল; বলিল, "ভাই কানাই, আমাদের কোথায় ফেলে যাও ভাই।" তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

আর তো ব্রজে যাব না ভাই,
যেতে প্রাণ নাহি চায়।
ব্রজের খেলা ফুরায়ে গেছে,
তাই এসেছি মথুরায়।

আর মা যশোদা! কৃষ্ণ হারাইয়া, বিষাদিনী যশোদা নয়ন সলিলে দিবারাতি ভাসিতেছেন, আর কেহই তাঁহাকে সেরূপ করিয়া মা বলিয়া ডাকে না। রাখাল বালকগণ তাহাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য কতবার তাঁহার নিকট আসিয়া, তাঁহাকে মা মা বলিয়া ডাকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মত কেহই আর তাঁহাকে ডাকে না,

তেমন মধুর ডাকে আর যশোদার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হয় না। যশোদা কৃষ্ণ বিহনে আত্মহারা হইয়াছেন, "মা" কথা শুনিলে তিনি কাঁদিয়া বলেন,—

"কে এলিরে গোকুলে,
কে আমায় ডাকলি মা বলে,
এলি কি গোপাল আমার,
আয় করি কোলে।"

যখন রাখালগণ মা যশোদার কথা শ্রীকৃষ্ণকে বলিল, তখন তিনি বিন্দু মাত্রও বিচলিত না হইয়া কেবল মন্ত্র কহিলেন,—

"তোমরা সবাই মা বলে ভাই ভুলিয়ে রেখ যশোদায়,
আমার মত বাঁকা হয়ে দাঁড়াও রে কদম তলায়।"

আর শ্রীমতী রাধা!—আর বিরহিনী গোপিনীগণ!—কৃষ্ণ বিহনে তাহাদের যাহা হইল, তাহার বর্ণনা হয় না। ক্ষণে ক্ষণে রাধা মূর্চ্ছিতা হইতেছেন, কৃষ্ণ বিহনে তাঁহার সঙ্গা বিলুপ্ত হইতেছে। তাঁহার কানে কৃষ্ণনাম শুনাইয়া সখীগণ রাধাকে প্রাণে জীবিতা রাখিতেছেন। কৃষ্ণনাম শুনিলে শ্রীমতী রাধা চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিতেছেন, কৃষ্ণ বই রাধা নাই! রাধা কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে রাধারও জীবন, মন, প্রাণ, সেই সঙ্গে সঙ্গে মথুরায় চলিয়া গেল। প্রেমময়ী রাধার দেহমাত্র লইয়া সখীগণ বিরহ বেদন সহ্য করেন. রাধার আর হৃদয়ে বেদনা নাই। রাধা মূর্চ্ছিতা, বহুচেষ্টায়ও সখীগণ রাধার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিতে পারেন না। রাধা আর নাই, রাধার সমাধি হইয়াছে; হা কৃষ্ণ

বলিয়া রাধা প্রেম সাগরে ডুবিয়াছেন। প্রেমময়ী প্রেম রাধারূপে গোকুলে উদিতা হইয়াছেন।

এইতো শ্রীকৃষ্ণ, এইতো শ্রীমতী রাধা।—রাধার জীবনে রহস্য বা আশ্চর্য্য ঘটনা কিছুই নাই। যেমন প্রত্যহ আমরা অনেকানেক রমণীকে প্রেমাতুরা দেখিতে পাই, রাধাও তাহাই। রাধা শ্রীকৃষ্ণের জন্য উন্মাদিনী। রাধার ন্যায় প্রেমিকা এ সংসারে আর নাই সত্য, কিন্তু রাধার মত ভাল বাসিতে অনেকেই পারে, অনেকেই অনেককে ভাল বাসিয়াছে, এখনও বাসিতেছে। অনেক রমণী ভালবাসার জন্য কুলত্যাগ করিয়া অকূলে ভাসিয়াছে নেকে ভালবাস জন্য লজ্জাসরম পরিত্যাগ করিয়াছে, কলঙ্কের ডালি মাথায় ধরিয়াছে। পিতা, মাতা পরিজন, এমন কি প্রাণের সন্তানকেও পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কতজন আবার উন্মাদিনী হইয়া অপরকে হত্যা করি- আত্মঘাতিনীও হইয়াছে আমরা প্রতি দিনই আমাদের আশেপাশে চারিদি ই দৃশ্য দেখিতেছি। তবে তাহাদের প্রেমে ও রাধার প্রেমে পার্থক্য আছে; রাধার প্রেম পূর্ণ ভাবে বিরাজিত, রাধার প্রেমের সীমা নাই, রাধার প্রেম অনন্ত। এ সংসারে যিনিই যত প্রেমিকা হইয়াছেন, তাঁহাতে প্রেম ভিন্ন অন্য বৃত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাধার প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই। শ্রীমতী রাধা হইতে প্রেমকে তুলিয়া লইলে রাধা আর রহেন না। অনেকে অনেককে ভালবাসিয়াছে ও এখনও বাসিতেছে, কিন্তু কেহই রাধার ন্যায় ভালবাসায় পরিণত হইতে পারে নাই। যাহাকে ভালবাসি, তাহারই অস্তিত্বের সহিত মিশিয়া যাইতে আমরা

কেবল প্রেমময়ী রাধাকেই দেখিতে পাই। রাধা ভালবাসিতে বাসিতে এত ভালবাসিয়াছিলেন, যে রাধাতে রাধা আর ছিলেন না; রাধার ভালবাসার সীমা দেখিতে পাওয়া যায় না। যত দূর রাধার হৃদয় আমরা দেখিতে পাই, ততদূরের মধ্যে সে হৃদয়ে প্রেম, অনন্ত অসীম প্রেম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। রাধা এত ভাল বাসিয়াছিলেন যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ একেবারে মগনা, একেবারে তাঁহাতে মিশাইয়া গিয়াছিলেন। রাধা ছিলেন না, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন; রাধার নিকট গোকুলের গোকুল-বিহারিনী প্রেমাতুরা রাধা একেবারেই ছিলেন না। কৃষ্ণপ্রেম ভিন্ন রাধার আর কিছুই নাই; তাহাই রাধা পরম সুন্দর, তাহাই রাধা মূর্ত্তিমতী প্রেম। মানুষ ইহাপেক্ষা প্রেমের ভাব উপলব্ধি করিতে পারে না, মানুষের হৃদয়ে ইহাপেক্ষা ভালবাসার জ্ঞান আইসে না, ইহাই প্রেমের চরম বিকাশ। রাধার মত প্রেমময়ী মূর্ত্তিমতী প্রেমিকা হইতে না পারিলেও,—শ্রীমতী রাধার মত পূর্ণ প্রেমিকা হওয়া মানবের পক্ষে অসম্ভব হইলেও,—রাধার মত প্রেমিকা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মানবের নিকট প্রতীত হয় না। তাহাই রাধার প্রেম মানব জাতির নিকট প্রেমের পথপ্রদর্শক, উত্তম দৃষ্টান্ত ও দীপ্তিমান নক্ষত্র। মানবহৃদয়ে প্রেম কতদূর উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে, রাধার প্রেমই তাহার পূর্ণ বিকাশ (ideal)। এ ভাব,—প্রেমের এ ভাব (ideal)—আমাদের চক্ষের উপর আছে বলিয়াই আমরা রাধার অনুকরণ করিয়া হৃদয়ের প্রেম তৃষ্ণা কতক উপশমিত করিতে পারি। রাধাই আমাদের প্রেমশিক্ষা প্রদানের গুরু, রাধাই আমাদের

আরাধ্যা দেবী। এ দেবীর পূজা করিব না তো এ সংসারে আর কাহার পূজা করিব?

কিন্তু শ্রীমতী রাধার প্রেম অসীম, অনন্ত, গভীর হইলেও পূর্ণ নহে; কারণ রাধার প্রেমে বেগ আছে, গতি আছে, চাঞ্চল্য আছে, দুঃখ আছে। রাধা প্রেমিকা, পূর্ণ প্রেমিকা, অসীম অতুলনীয়া মানব হৃদয়ের কল্পনাতীতা প্রেমিকা, হইলেও রাধা দুঃখিনী, বিষাদিনী কাতরা। রাধার প্রেমে সুখ দুঃখ একত্রে সমভাবে জড়িত; রাধার প্রেমে দুই শক্তির সমকার্য্য দৃষ্টিগোচর হয়।—এই রাধা হাস্যময়ী, এই রাধা আবার শোকাতুরা উন্মাদিনী; এই রাধার হাসিতে সুন্দর বৃন্দাবন হাসে, এই আবার রাধার অশ্রনীরে যমুনার জল উদ্বেলিত হয়! রাধা সুখী দুঃখী উভয়েই, রাধার প্রেমে হাসি কান্না দুইই একত্রে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করে। প্রেম করিয়া রাধার ন্যায় এ সংসারে কেহ কাঁদে নাই; আবার প্রেম করিয়া রাধার ন্যায় কেহ এ সংসারে সুখীও হয় নাই। জগতে যেরূপ আলোক ও অন্ধকার, জ্যোৎস্না ও দুর্যোগ, জীবন ও মৃত্যু, একত্রে এক সঙ্গে পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাই, রাধার জীবনেও প্রেমে আমরা ঠিক সেই দৃশ্যই দেখিতে পাই। রাধার প্রেম কার্য্যশীল, কার্য্য থাকিলেই দুইটী শক্তির ক্রীয়া বুঝায়; যে খানে কার্য্য সেইখানেই দুইটী বিভিন্না প্রকৃতির শক্তির সম্মিলন; রাধা তাহাই পূর্ণ প্রেমিকা হইয়া পূর্ণ রূপে সুখী নহেন। তবে কি এ সংসারে সুখ নাই? হৃদয়ে যে সুখের তৃষ্ণা সর্ব্বদা বিরাজিত, সেই সুখের তৃষ্ণা পূর্ণরূপে উপশমিত করিবার উপায় কি এ সংসারে নাই? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে এ উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন ;—তাহাই শ্রীকৃষ্ণ অবতার।

শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে পুতনা বধ করিয়া ছিলেন ; যৌবনে গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ছিলেন ; এতদ্ব্যতীত গোকুলে তিনি আরও কত আশ্চর্য্যজনক কার্য্য সকল করিয়া ছিলেন ; এই জন্যই কি তাঁহাকে আমরা ভগবানের অবতার বলিতেছি? গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ, কালিয় দমন, কুঞ্জে কালীরূপ ধারণ প্রভৃতি গল্প পুরাণে লিখিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ করুন, আর নাই করুন, তিনি কোনরূপ অদ্ভুত আশ্চর্য্য কাণ্ড করুন, আর নাই করুন, ইহাতে তাঁহার মাহাত্ম্যের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণ আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়া ছিলেন বলিয়াই যদি তাঁহাকে অবতার বলিতে হয়, তবে বোধ হয় ঐন্দ্রজালিক মাত্রেই অবতার। আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন অবতারের লক্ষণ নহে। আত্মার পূর্ণতাই পরমাত্মা ;—যাঁহাতে পরমাত্মার সকল গুণ পূর্ণরূপে বিকশিত, তিনিই অবতার,—গিরিগোবর্দ্ধন ধারণে অবতার প্রমাণীকৃত হয় না। যাঁহার এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি করুন ; যিনি এই সকল কাণ্ড অদ্ভুত ও অসম্ভব মনে করেন, তিনি অবিশ্বাস করুন। গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ বা কালিয় দমন শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য নহে। এই সকল আশ্চর্য্য কাণ্ডের জন্য আমরা তাঁহাকে পূজা করি না, অবতারও বলি না।

তিনি পূর্ণ প্রেমিক। তিনি প্রেমের প্রশান্ত সাগর। তিনিই প্রেমের পূর্ণ উৎস, তাঁহা হইতেই প্রেম শত সহস্র ধারায়

প্রবাহিত হইয়াছে। প্রেমই প্রেমের শক্তি,—পরমাত্মা প্রেমময় পূর্ণ ব্রহ্ম। যাঁহাতে এই প্রেমসাগর,—প্রেমের উৎস,—দেখিতে পাই, তিনিই ব্রহ্ম;—ব্রহ্ম আর দ্বিতীয় নাই। শ্রীকৃষ্ণে কি আমরা এই প্রেমের-প্রশান্ত সাগর,—প্রেমের উৎস,—দেখিতে পাই? তাঁহার জীবনের যতটুকু শুনিয়াছি তাহাতে যে তাঁহাকে নির্দ্দয়-হৃদয় পাষাণসম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যিনি মা যশোদাকে ভুলিতে পারেন, যিনি রাজা হইয়া বাল্য সখাগণকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান, যিনি শ্রীমতী রাধাকে ভুলিয়া মথুরায় গিয়া রাজা হয়েন, তাঁহার হৃদয়ে যে কিছু মাত্র প্রেম আছে, তাহা আমরা কি রূপে বলিব? যে এক মুহূর্ত্তে সকল ভুলিতে পারে, প্রেমময়ী রাধা ও প্রেমাতুরা গোপ বালাকে ভুলিতে পারে, তাহার মত নির্দ্দয় এ সংসারে আর কে আছে? শ্রীকৃষ্ণ তো ভালবাসা কিছু মাত্রও দেখিতে পাই না, তাঁহার হৃদয়ে তো প্রেম বিন্দুমাত্র ছিল বলিয়াও বোধ হয় না! ভাল-বাসিলে কি এ জীবনে সে ভালবাসাকে হৃদয় হইতে দূর করিতে পারা যায়!

এ সকল সত্ত্বেও কৃষ্ণ প্রেমিক। তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। প্রেমই তাঁহার জীবন, প্রেমই তাঁহার শক্তি। যশোদা তাঁহাকে ভাল বাসিতেন; কৃষ্ণ পরের ছেলে হইলেও মা যশোদা তাঁহাকে আপন সন্তান অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। গোকুলে আরও অনেক জননী ছিলেন, তাঁহাদেরও তো অনেক পুত্র কন্যা ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পরের সন্তান হইলেও যশোদা তাঁহাকে যেমন ভাল বাসিতেন, তেমন ভাল অন্য কোন জননী নিজের সন্তানকেও বাসেন না—বাসিতে পারেন ও

না। এত ভালবাসিবার কারণ কি? কৃষ্ণের এমন কি ছিল, তাঁহার জন্য যশোদার মন মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়? কেবল যশোদা নহেন, তাঁহাতে এমন কি ছিল, যাহাতে রাখালবালকগণ তাহাদের স্ব স্ব সোদর অপেক্ষাও তাঁহাকে ভালবাসিত? তাঁহাতে এমন কি ছিল যাহাতে তাহারা সকলে তাঁহাকে পাইয়া তাহাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আহার, নিদ্রা, সকল ভুলিয়া গিয়াছিল। কেবল রাখাল বালকগণ নহে, শ্রীকৃষ্ণে এমন কি ছিল, যে যাহাতে গোকুলের গোপীকাগণ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া পাগল হইয়াছিলেন? তিনি অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়াই কি এইরূপে তাঁহার জন্য গোকুলের গোপ ও গোপিনীগণ পাগল হইয়াছিলেন? আলৌকিক কার্য্যে ভয় হয়, ভক্তি জন্মে,—ভালবাসা আইসে না, পাগল হইতে হয় না।

তবে কৃষ্ণে কি ছিল, যাহাতে তাঁহার জন্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই পাগল হইয়াছে?—এ সংসারে এমন কি শক্তি আছে, যাহার সাহায্যে অন্যের হৃদয়ে নিজের প্রতি ভালবাসা জন্মাইয়া দিতে পারা যায়? একটু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, যে প্রেমই প্রেমোদ্দীপনের একমাত্র উপায়। চৈতন্যদেব প্রেমিক ছিলেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যের জন্য এত লোক উন্মত্ত; যাঁহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, তাঁহাকেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। তিনি নিজের ভালবাসা কোনরূপে প্রকাশ না করিলেও আমরা তাঁহার সেই হৃদয়স্থিত অলক্ষিত ভালবাসার নিকটে আসিলে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত

পশু; কোকিল, পাপিয়া প্রভৃতি বিহঙ্গম, লোক দেখিলেই চিনিতে পারে। কাহারও নিকট তাহারা আমোদ করিয়া আইসে, আবার কাহারও নিকট হইতে তাহারা ভয়ে দূরে পলায়ন করে। যাঁহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, তাহারা তাঁহাকে স্বতঃই চিনিয়া নিকটস্থ হয়, কেমন আপনা আপনি জানিতে পারে, যে তাঁহার দ্বারা তাহাদের কোন অনিষ্ট সাধিত হইবে না। এরূপ লোকের সহবাসে দুই দণ্ড থাকিলে তাহারা তাঁহাকে ভাল বাসিয়া ফেলে। যদি বনের পশু পক্ষীগণের মধ্যে এই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে মানব জাতির মধ্যে এ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যিনি প্রেমিক, তিনি তাঁহার প্রেম প্রকাশ না করিলেও লোকে তাঁহাকে ভাল বাসিয়া ফেলে। যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, তাহার উপর ভালবাসা কখনই জন্মে না।

যখন দেখি, শ্রীকৃষ্ণ যাহার নিকট যান. সেই তাঁহাকে ভাল বাসে, সেই তাঁহার জন্য উন্মত্ত হয়; যখন দেখি,—তিনি কোন মতেই কোনপ্রকারে তাঁহার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করেন না, তবুও তাঁহাকে আবাল বৃদ্ধ বনিতা, এমন কি পশু পক্ষী পর্য্যন্ত, ভালবাসে, তখন বলিতে হয়, নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয়ে প্রেম পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত ছিল; নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয়ে এক অদ্ভুত শক্তি অধিষ্ঠিত ছিল। যদি তাহা না হইবে, তবে লোকে তাঁহার জন্য ক্ষেপিবে কেন? প্রেমই প্রেম উদ্দিপনের এক মাত্র শক্তি, সুতরাং বলিতে হয়, শ্রীকৃষ্ণে প্রেম পূর্ণ মাত্রায় ছিল।

প্রেম পূর্ণ মাত্রায় ছিল কেন বলিব? আমরা রাধার প্রেম দেখিয়াছি, মানব জীবনে রাধার প্রেমাপেক্ষা যে আর অধিক

প্রেম বিকশিত হইতে পারে, তাহা আমাদের কল্পনায় আইসে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম রাধার প্রেমাপেক্ষা কি অধিক ছিল? ইহারই আলোচনা আমরা এক্ষণে করিব।

শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে প্রেম ছিল, নতুবা পরের ছেলের জন্য যশোদা এত পাগল হইবেন কেন? তাঁহার হৃদয় নিশ্চয়ই ভালবাসায় পূর্ণ ছিল, নতুবা রাখাল বালকগণ তাঁহার জন্য উন্মত্ত হইবে কেন? তিনি নিশ্চয়ই প্রেমময় ছিলেন, নতুবা গোকুলের গোপ বালাগণ তাঁহার জন্য একেবারে ক্ষেপিয়া যাইবেন কেন?

কুলবধূ তাঁহার জন্য পাগল হইয়া যমুনার তীরে কুল লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়াছে: স্বামীর ক্রোড় হইতে স্ত্রী বাঁশীর রব শুনিয়া কদমতলায় বাঁকা শ্যামের সহিত সম্মিলিতা হইতে প্রধাবিতা হইয়াছে, কই তাহাতে তো শ্রীকৃষ্ণের কোন বিপদাপদ হয় নাই! কই, গোকুলের গোপগণ তো শ্রীকৃষ্ণকে কখন প্রহার করিতে উদ্যত হন নাই! তাঁহাদের স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা, কুলটার ন্যায় রাত্রে কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভ্রমণ করিতেছে, তাঁহারা কি ইহা জানেন নাই? তবে তাঁহারা কেন কৃষ্ণের উপর রাগ করেন নাই? তাঁহারা যদি কৃষ্ণের উপর সকলে ক্রুদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে তিনি অসীম ক্ষমতাপন্ন হইলেও কোন না কোন দিন কোন লোকের হাতে নিশ্চয়ই নিহত হইতেন। না, তাঁহারা কৃষ্ণের উপর রাগিতে পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণের উপর রাগ আসে না, তাঁহারাও কৃষ্ণ প্রেমে পাগল। কৃষ্ণের জন্য তাঁহারা স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা, সব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কি মায়া জানিতেন? যে কাজ করিলে সংসারে প্রতিদিন নরহত্যা হয়, সেই কাজ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ

সকলের প্রিয়। লোকের স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা ও জননীর মন প্রাণ চুরি করিয়া, তাঁহাদের সহিত কুঞ্জে কুঞ্জে বিহার করিয়াও কৃষ্ণ সকলের প্রিয়। কৃষ্ণের উপর কাহারও রাগ হয় না, কৃষ্ণ প্রেমে সকলে উন্মত্ত। কৃষ্ণ কি মায়া জানিতেন! গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ বরং একদিন সম্ভব, কিন্তু এ যে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া প্রতীতি হয়।

প্রেমেই প্রেম জন্মে,—প্রেমেই প্রেমের উদ্দীপন, প্রেমে বনের হিংস্র শ্বাপদকুলও বশীভূত হয়। কৃষ্ণের হৃদয়ে নিশ্চয়ই প্রেম পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত ছিল, নতুবা কৃষ্ণের জন্য গোকুল পাগল হইবে কেন? কৃষ্ণের প্রেম অসীম অনন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায়, তাহাই তাঁহার নিকট যে আসিয়াছে, সেই-ই প্রেমিক হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ক্ষেপিয়াছে। প্রেম পরেশ মনির গুণ ধারণ করে, প্রেমের নিকট হৃদয় আসিলেই সে হৃদয় প্রেমময় হইয়া যায়। গোকুল ভিন্ন এ দৃশ্য তো জগতের আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না; আর কেহইতো নর নারীকে প্রেমে এত মাতাইতে পারেন নাই!—তাহাই বলি, কৃষ্ণের হৃদয়ে অসীম অনন্ত প্রেম বিরাজ করিত, সেই প্রেমের মোহিনী মায়ায় তাঁহার প্রেমে সকলে উন্মত্ত হইয়াছিল।

কেবল ইহাই নহে,—তাঁহার প্রেম কত বিস্তৃত! আমরা এক সময়ে একজনকে ভিন্ন দুই জনকে ভাল বাসিতে পারি না। এক জনকে ভাল বাসিয়া দুই জনকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারি না; কলহ, বিবাদ, বিসম্বাদ, বিদ্বেষ আসিয়া আমাদের সকল সুখ নষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রেম কত বিস্তৃত! এ প্রেম সাগরে সমস্ত বৃন্দাবন ডুবিয়া গিয়াছিল, সমস্ত গোকুলের নর নারী

নিমগ্ন হইয়া ছিল, কেহই আর কৃষ্ণ প্রেমরূপ সাগরবারির উপর ভাসমানে সক্ষম হয় নাই! সকল রাখাল বালকই তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিত, কিন্তু সেই সকল রাখাল বালকদিগের মধ্যে কখন হিংসা ও দ্বেষ দেখা দেয় নাই। কৃষ্ণ ইহাকে অধিক ভাল বাসেন, উহাকে কম ভাল বাসেন,—এরূপ ভাব তাহারা কখনও তাঁহাতে দেখে নাই; দেখিলে বিদ্বেষের উদ্রেক হইত, বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিত, গোঠে এমন প্রেমের হাট বসিত না। আবার আমরা দুই জন স্ত্রীলোকের নিকট আসিলে উভয়কে সমভাবে সন্তুষ্ট রাখিতে পারি না, উভয়ে বিবাদ বিসম্বাদ বাঁধিয়া উঠে, হিংসা বিদ্বেষ দেখা দেয়, অশান্তির উদয় হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সহ ষোড়শত গোপিনী একত্রে কুঞ্জে কুঞ্জে ক্রীড়া করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ নাই, কলহ বিবাদ নাই। কৃষ্ণপ্রেমে কেহ অসাম্য ভাব দেখিতে পান না; সকলেই সমভাব, সকলের প্রতিই সম ভালবাসা। সকলেই ভাবেন,—কৃষ্ণ তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন! এমন সুন্দর দৃশ্য এ সংসারে আর কি আছে? একজনকে ভালবাসিতে পারা যায়, একজনের জন্য আত্মহারা হইলেও হইতে পারা যায়, রাধার মত ভালবাসাও সম্ভব; কিন্তু একজন নয়, দুই জন নয়, শতজন নয়, সহস্র জন নয়, সকলকেই সমান ভালবাসা, সকলের জন্যই সমভাবে আত্মহারা হওয়া কি সম্ভব? ইহা যে কল্পনারও অতীত; কিন্তু কৃষ্ণের জীবনে এই অতুলনীয় দৃশ্যই আমরা দেখিতে পাই।

কৃষ্ণ কি সকলের জন্যই আত্মহারা হইয়া ছিলেন? অবশ্যই হইয়া ছিলেন, নতুবা গোপবালাগণ এত সুখী হইবে কেন?

তাঁহারা তাঁহার জন্য আত্মহারা, তিনি তাঁহাদের জন্য আত্মহারা না হইলে তাঁহাদের প্রাণে কখনই সন্তোষ জন্মিতে পারে না। আমি যাহাকে ভালবাসি, সে আমাকে আমার অপেক্ষা অধিক ভাল না বাসিলে, আমার প্রাণে সন্তোষ জন্মে না, সুখ হয় না, শান্তি থাকে না। গোপিনীগণ কৃষ্ণকে ভাল বাসিয়া সন্তোষ, সুখ ও শান্তিলাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং বলিতে হয়, তাঁহাদের অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রেম অধিক। এক জন নয়, দুই জন নয়, শত সহস্রের জন্য সমসময়ে আত্মহারা! এ দৃশ্য এ জগতে আর নাই!

কেবল ইহাই নহে, কৃষ্ণের প্রেমে স্বার্থ নাই। সকলের জন্য কৃষ্ণ, দশ জনের জন্য শ্রীগোবিন্দ, গোকুলের নর নারী—আবাল বৃদ্ধ বনিতা—সকলের জন্য মুরারীমোহন বৃন্দাবনমোহন শ্যাম; পরেরই জন্য তাঁহার প্রাণ, ষোড়শত গোপিনী সেবায় তাঁহার জীবন নিযুক্ত! তাঁহার অতুলনীয় স্বার্থ শূন্য প্রেমের ছায়ায় আসিয়া গোকুলের নর নারী স্বার্থ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল; তাহাই গোপগন স্ত্রী কন্যা ভগিনী ছাড়িয়া দিয়া ক্লেশানুভব করে নাই; তাহাই রাখালগণ কৃষ্ণকে পাইয়া আত্মীয় স্বজন সকলকে ভুলিয়া ছিল? কেবল ইহাই নহে, গোপিনীগণ সকলই কৃষ্ণ-প্রেমে আত্মহারা, লোকলাজ ভয় না করিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় ধরিয়া, তাহারা কৃষ্ণ প্রেম সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। কিন্তু নিজের জন্য নহে, ক্রমে তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেম এতই স্বার্থ শূন্য হইয়াছিল যে তাঁহারা কৃষ্ণ সহ রাধার মিলন করিয়াই অভূতপূর্ব্ব সুখানুভব করিতেন। রমণী সতিনীর নামে শিহরিয়া উঠে, স্ত্রী কন্যা ভগিনী কুলটা হইলে আমরা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া

যাই, কিন্তু সখীগণের হৃদয়ে স্বার্থ একেবারে নাই, স্বার্থ শূন্য কৃষ্ণ প্রেমের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া গোপিনীগণ রাধার সহিত কৃষ্ণের সম্মিলন করাইয়াই সুখী। এমন সুন্দর দৃশ্যই বা আর এ সংসারে কোথায় আছে?

রাধার প্রেম অসীম অনন্ত, কিন্তু সে প্রেমে বেগ আছে, চাঞ্চল্য আছে, গতি আছে, সুখ দুঃখ দুই আছে; কিন্তু কৃষ্ণ প্রেমে তাহার কিছুই নাই। কৃষ্ণ প্রেম প্রশান্ত সাগরের ন্যায়, তাহাতে বেগ নাই, গতি নাই, চাঞ্চল্য নাই, সুখ দুঃখ কিছুই নাই। রাধা প্রেমে কাঁদিয়াছেন ও হাসিয়াছেন; কৃষ্ণ প্রেম করিয়া কাঁদেন নাই, হাসেনও নাই; তাঁহার প্রেম অচল, অটল, অতুলনীয়, অসীম ও অনন্ত।

কৃষ্ণের প্রেমে সুখ দুঃখ নাই, কেবলই আনন্দ। সে আনন্দের বর্ণনা হয় না। সে আনন্দ আমরা কখনও উপলব্ধি করি নাই, কল্পনাও করিতে পারি না, সুতরাং সে আনন্দ যে কি, তাহা আমরা কিরূপে বুঝিব? তবে এই পর্য্যন্ত দেখিতে পাই; এ সংসারে প্রেম করিয়া সকলকেই চক্ষের জল ফেলিতে হইয়াছে; কেবল শ্রীকৃষ্ণই প্রেম করিয়া কাঁদেন নাই! একজন, দুইজন নয়, সমস্ত গোকুলের গোপিনীর সহিত প্রেম করিয়াও কোন দিন এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলেন নাই।

মানুষের হৃদয়স্থ সুখের তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জল প্রেম, কিন্তু প্রেমে সুখ দুঃখ দুই হয়; ভগবান কিরূপে প্রেম হইতে কেবলই আনন্দ জন্মে, কিরূপে প্রেম করিলে প্রাণের তৃষ্ণা নিবারণ হয়, তাহাই মানবকে শিক্ষা দিবার জন্য ভাবরাজ্যে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যদি এ সংসারে প্রেম লাভ করিয়া,

প্রাণের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া, চির আনন্দ উপলব্ধি করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে কৃষ্ণ ভিন্ন আর অন্য গতি নাই। শ্রীকৃষ্ণই ইহার একমাত্র উপায়, একমাত্র দৃষ্টান্ত, একমামাত্র পথ। কৃষ্ণ যে রূপ প্রেম করিয়া ছিলেন, সমভাবে সকলে আত্মহারা হইয়া ছিলেন, তাঁহার প্রেমে যেমন স্বার্থ ছিল না, তাঁহার প্রেমে যেমন সুখ দুঃখ কিছুই নাই, তাহাই কর ;—নতুবা প্রাণের তৃষ্ণা নিবারণের আর দ্বিপথ নাই ; সুখী হইবার আর অন্য উপায় নাই।

এই তো শ্রীকৃষ্ণ ; এইতো বৃন্দাবনের মোহন মুরারীধারী বঙ্কিম শ্যাম, এইতো গোপ বালার মনমোহন, রাধার প্রাণ-মন-হরণ বাঁকা মদনমোহন! ইনি যদি ভগবানের অবতার না হয়েন, তবে ভগবানের অবতার এ সংসারে আর নাই, হইতেও পারে না। প্রেমই ব্রহ্ম, কৃষ্ণই জীবন্ত প্রেম। রাধা পূর্ণ অনুভূতি,—রাধা প্রেম সাগরের পূর্ণ সলিলা নদী ;—কিন্তু কৃষ্ণ প্রেম সমুদ্র। কৃষ্ণই প্রেম, প্রেমই কৃষ্ণ। আর প্রেমই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কৃষ্ণ।

আমরা গৃহে গৃহে মন্দিরে মন্দিরে এই অতুলনীয় প্রেম-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করি, ধ্যান, ধারণা ও স্তব করি। কৃষ্ণ-মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণ-প্রেম লাভের প্রয়াস পাই। সুখী হইবার তৃষ্ণা যদি মানবের ধর্ম্ম হয়, আর প্রেমই যদি সেই তৃষ্ণার জল হয়, তবে কৃষ্ণ প্রেমই সেই জল। ইহা পান করাই মানব মাত্রেরই ধর্ম্ম ; ইহা ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই, হইতেও পারে না।

কাষ্ঠ প্রস্তর নির্ম্মিত যে সুন্দর মূর্ত্তি মন্দিরে মন্দিরে আমরা দেখিতে পাই, সেই স্থূল মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ নহেন। তাহা যদি

হইত, তাহা হইলে মন্দিরে না গেলে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতাম না। সেই মূর্ত্তি কেবল শ্রীকৃষ্ণের স্থূল কাল্পনিক দেহ মাত্র। যে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা সকলেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ বলিয়া স্ব স্ব হৃদয়ে ধারণা করি, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই ভগবানের অবতার। যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি, ভাব ও প্রেম শত সহস্র সাধু, মহাত্মা ও কবির সাহায্যে চিত্রিত হইয়া আমাদের মানসপটে অঙ্কিত হইয়াছে, সেই মানসপটস্থিত ভাবময়ী মূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণ, আর সেই শ্রীকৃষ্ণই ভগবানের অবতার।

যদি এই রূপই শ্রীকৃষ্ণ হয়েন, যদি শ্রীকৃষ্ণ মানব জীবনের প্রেম প্রদর্শক ভাবময়ী ঈশ্বরের মূর্ত্তি হয়েন, তবে এরূপ মূর্ত্তি তো সকল জাতিরও সকল ধর্ম্মাবলম্বী সকলের মনেই বিরাজিত আছে। ইহার জন্য নন্দঘোষের পুত্র, গোকুলের গোপিকা বৃন্দাবন প্রভৃতি গল্পের প্রয়োজনীয়তা কি! মানুষ মনুষ্যমূর্ত্তি ভিন্ন,—জড়ভাব ভিন্ন,—কেবলই শুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাব উপলব্ধি করিতে পারে না; কিছু ভাবিতে হইলে মানব মনে একটা আকার আসিয়া পড়ে। পূর্ণ প্রেমিকের ভাবনা ভাবিতে গেলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে একটী পরম সুন্দর মূর্ত্তি মনে উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মূর্ত্তি আর একটীও নাই, সুতরাং প্রেমের মূর্ত্তি ভাবিতে হইলে এই মূর্ত্তিই শ্রেষ্ঠ।

প্রেমকার্য্যশীল হইয়া পূর্ণ প্রেমের পথ দেখাইতেছেন, এরূপ ধারণা করিতে গেলে, একজন প্রেমিক ও অপর কতক গুলি প্রেমিক প্রেমিকার ভাব মনে ধারণা না করিলে প্রেমের কার্য্য উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। এক জনকে একজন ভালবাসিতেছেন, এরূপ ভাবনা না করিলে প্রেমের বিকাশ

বুঝিতে পারা যায় না। সেই জন্যই প্রেমের একটী জীবন কল্পনা করা বা ধারণা করা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ন্যায় প্রেম পূর্ণ জীবন এ সংসারে আর কাহারও নাই, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম চিত্র। আমরা দেখাইয়াছি, সাধু মহাত্মা ও কবিগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি গঠিত, সুতরাং ভগবানের পূর্ণ প্রেমের ইহা বিকাশ ও অবতার। এতদ্ব্যতীত পূর্ণ প্রেমের অন্য চিত্র যদি থাকে, তবে দেখাইয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা আর ভগবানের বিকাশ ও অবতার বলিতে সাহসী হইব না।

ভগবান মানব মনে সুখের তৃষ্ণা দিয়াছেন, সেই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রেম দিয়াছেন; সেই প্রেম সুধা পান করিয়া কিরূপে সুখের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হয়, তাহাই তিনি দেখাইয়া দিবার জন্য, তাহাই তিনি শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা মানব হৃদয়ে ভাবরূপে (ideal) ভাবে বিরাজ করিতেছেন। কি সভ্য, কি অসভ্য, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ,—সকলেরই হৃদয়ে সকল বিষয়ের একটা করিয়া উচ্চতম ভাব (ideal) আছে। যে কখন সমুদ্র দেখে নাই, কেবল মাত্র নাম শুনিয়াছে, তাহারও হৃদয়ে একটা সমুদ্রের ভাব আছে। কোন বিষয়ের অস্তিত্বের জ্ঞান হইলেই, হৃদয়ে সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটা ভাব জন্মে। মানব হৃদয়ে প্রেমেরও ঠিক এইরূপ আইডিয়াল (ভাব) আছে। এমন মানুষ কেহই নাই, যাঁহার হৃদয়ে ভালবাসা নাই; এমন নরনারী সংসারে কেহই হইতে পারেন না,—যাঁহার হৃদয়ে প্রেমের (ভালবাসা) বীজ একেবারেই নাই। যদি ইহাই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে সকলেরই মনে প্রেমের একটা ভাব

(ideal) আছে। সেই আইডিয়াল পরিস্ফুট বা বিকাশিত করিবার জন্য বাহ্যিক কোন দ্রব্যের আবশ্যক;—যেমন মানুষের মনে স্মরণ শক্তি আছে, কিন্তু সেই স্মরণ শক্তি চর্চ্চায় বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ মানব হৃদয়ে প্রেমের যে ভাব বা আইডিয়াল আছে, তাহা ক্রমে দৃষ্টান্ত, উচ্চ হইতে উচ্চতম দৃষ্টান্ত, দর্শনে সাধু মহাত্মা কবিগণের বাক্যে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। আমাদের সকলেরই হৃদয়ে যে প্রেমের আইডিয়াল আছে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টিয়াণ সকলের হৃদয়েই যে প্রেমের আইডিয়াল আছে, সেই আইডিয়াল মত হইতে পরিলেই প্রেমিক হইতে পারা যায়। কিন্তু আইডিয়াল থাকিলে সেই আইডিয়াল অনুসারে কাজ করিতে পারা যায় না। আইডিয়াল যদি আমাদের মত হস্তপদবিশিষ্ট হইয়া কাজ করেন, তবেই কতকটা সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা সেইরূপ হইতে পারি। তাহাই ভগবান সাধু মহাত্মা ও কবিগণের কণ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সাহায্যে অতি ধীরে ধীরে ভাবরাজ্যে আকার ধারণ করিয়া পূর্ণপ্রেমিক কাহাকে বলে ও পূর্ণ প্রেমিক হইলে কি করিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই এইরূপ পূর্ণ প্রেমিকের উচ্চতম আইডিয়াল, তোমার আমার সকলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে পাইয়াও তাঁহাকে বুঝিতে পারি না, তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তাহাই ভগবান তাঁহার অস্তিত্ব জগতে দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপে গোকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ জন্মিয়া থাকেন, ভালই; না জন্মিয়া থাকেন, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ গোকুলের শ্রীকৃষ্ণ আর নাই, তিনি

প্রভাসতীর্থে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করি, তিনি অনন্ত কাল হইতে জীবিত রহিয়াছেন, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন। তিনি ভাবরাজ্যের ছবি, তিনি অনন্ত আকাশের ন্যায় অনন্তরূপে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এই কৃষ্ণই—কেবল এই অনন্ত প্রেমরূপী শ্রীকৃষ্ণই—অবতার। অন্য অবতার মানি না, মানিতে পারি না। অন্যরূপ অবতার হয় না,—হইতেও পারে না।

অমরা দেখিয়াছি, কৃষ্ণে প্রেম ছিল। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে কৃষ্ণের প্রেমে স্বার্থ ছিল না, কৃষ্ণের প্রেম বহু বিস্তৃত, অসীম, অনন্ত। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তিনি কি "প্রেম" ছিলেন? প্রেম একটী শক্তি! যেমন মাধ্যাকর্ষণ একটী জড় জগতের শক্তি, প্রেমও ঠিক সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতের একটী শক্তি। যে শক্তির বলে সমস্ত জগতের জীব সমস্ত জগতের জীবের সহিত আকৃষ্ট হইয়া নানা কার্য্য করিতেছে, যে শক্তি হৃদয়ে থাকায় আমরা সমস্ত প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছি, যে শক্তির বলে জীব-জগত পরিঘূর্ণয়মান হইতেছে, প্রেম সেই অসীম, অনন্ত, অজ্ঞেয় শক্তি।

এই শক্তির কার্য্যমাত্র আমরা দেখিতে পাই। প্রকৃতি অনুসারে কাহারও হৃদয়ে ইহার কার্য্য অধিক দেখি, কাহারও হৃদয়ে অল্প দেখি; তোমাতে আমাতে অল্প দেখি, শ্রীমতী রাধায় অসীম অনন্ত দেখিয়াছি। প্রেম-শক্তির কার্য্য দেখিতে পাই, প্রেমরূপী শক্তিকে দেখিতে পাই না। কারণ সেই শক্তিই ব্রহ্ম।

শ্রীগবিন্দে প্রেমের কার্য্য হইয়াছে,—না, তিনি স্বয়ংই সেই প্রেম শক্তি? যদি তাঁহাতে কেবল মাত্র প্রেমের কার্য্য হইত, তাহা হইলে সে কার্য্য অনন্ত, অসীম পূর্ণ হইলেও তাঁহাকে আমরা ভগবানের অবতার বলিতাম না। কার্য্য শক্তি নহে, শক্তির সঞ্চালনের নামই কার্য্য। শক্তি সঞ্চালিত হইলেই আমরা একটা কার্য্য দেখিতে পাই, কিন্তু কার্য্য বাধ দিলেও একটা শক্তির অস্তিত্ব থাকে। আমরা কখনও কার্য্যশূন্য শক্তি দেখি নাই, তাহাই কার্য্যকে বাধ দিয়া শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। কার্য্য বাধ দিয়া যদি কোন শক্তি থাকে, তবে তাহাই ভগবান। আর যাহাতে সেই ভাব নাই, তাঁহাকে ভগবানের অবতারও বলিতে পারি না। গোকুলের শ্যামে কি তাহাই ছিল?

ছিল, নতুবা তিনি অবতার নহেন। তিনি পূর্ণ প্রেম-শক্তি. তিনি শক্তিই মাত্র। শক্তি ভিন্ন সেই শক্তির কার্য্য তাঁহাতে ছিল না। তিনি প্রেম করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেমের কার্য্য তাঁহার হৃদয়ে আমরা কি কিছু দেখিতে পাই? শৈশব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষে এক বিন্দু জল দেখি নাই। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই কোন না কোন সময়ে কাঁদিতে হইয়াছে। এক বিন্দুও চক্ষের জল ফেলেন নাই, এমন লোক আর এক জনও দেখিতে পাওয়া যায় না; কেবল তিনিই কখন চক্ষের জল ফেলেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে তাঁহার হৃদয়ে কখন কোনরূপ বেগ বা চাঞ্চল্য বা কার্য্য হয় নাই। প্রেমের কার্য্যেই সুখ ও দুঃখের উপলব্ধি। প্রেমের কার্য্য হৃদয়ে হইলেই

হৃদয়ে আলোড়ন দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে যত আলোড়ন, সেইখানে প্রেমের তত উদয় ও উদ্দীপনা। রাধার হৃদয়ে তাহাই এত হাসি ও কান্না। কিন্তু কৃষ্ণে তাহার কিছুই নাই, কৃষ্ণ হৃদয়ে যে প্রেম আছে বা কখনও ছিল, তাহা বোধ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণে প্রেমের কার্য্য কিছুই ছিল না। তাঁহাতে প্রেমের শক্তি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাই তিনি পরম যোগী। প্রেম হইতে, প্রেমের বেগ, চাঞ্চল্য ও গতি দূর করিতে পারিলেই, কেবল মাত্র প্রেমের শক্তি বা প্রেমরূপী শক্তিই বিরাজ করে, তাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না। কেবল প্রেমের অস্তিত্বই থাকে। এই অস্তিত্বই যে আনন্দ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আর আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, আনন্দই ব্রহ্ম।

কৃষ্ণ পরম যোগী। হৃদয় ও মনের উপর তাঁহার অসীম আধিপত্য। তিনি সংসারে থাকিয়া সংসারের প্রেমরঙ্গে মাতিয়াও পরম যোগী। তাঁহার হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্য বিন্দু পরিমাণেও দাগ পড়ে না। যিনি সংসারে থাকিয়া এক বিন্দু চক্ষের জল নিক্ষেপ করেন নাই, তাঁহার ন্যায় যোগী কে?

যশোদা কৃষ্ণের জন্য পাগল, কৃষ্ণ যশোদাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেন বটে, কিন্তু তিনি যে যশোদার জন্য বিন্দু মাত্র ভবিতেন, ইহা তো বোধ হয় না। যশোদার মৃত্যু হইলে তিনি যে এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিতেন, এরূপ তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিয়া বোধ হয় না। রাখাল বালকগণ তাঁহার জন্য পাগল, কিন্তু রাখাল বালকগণের জন্য তাঁহার যে হৃদয়ে বিন্দু মাত্র আকর্ষণ ছিল, ভাবনা ছিল, ব্যাকুলতা ছিল, তাহা তো বোধ হয় না। গোকুলের গোপিনীগণ তাঁহার জন্য উন্মাদিনী,

শ্রীমতী রাধা তাঁহার জন্য ক্ষিপ্তা; কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য প্রয়াস পাইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে তাঁহাদের জন্য যে কোনরূপ ব্যাকুলতা ছিল, তাহার চিহ্ন আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। যদি তিনি প্রেমে মজিতেন, যদি তিনি রাধার মত প্রেমে পাগল হইতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই গোকুলের গোপিনীগণকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় গিয়া রাজা হইয়া ব্রজের খেলা ভুলিতে পারিতেন না। সাধারণ লোকের ন্যায়, তাঁহার হৃদয় হইলে. তিনি অত প্রেম করিয়া কখন ও সে প্রেম একেবারে ভুলিতে পারিতেন না। তাঁহাতে মায়া বা কামনা একেবারেই ছিল না। কামনা থাকিলে, সে কামনা সাধনা ব্যতীত আর কিছুতেই যায় না। তাঁহার বৃন্দাবনলীলায় পূর্ণ কামনার বিকাশ। তিনি পরম যোগী না হইলে, সেই পূর্ণ কামনা বিস্মৃত হইয়া কিরূপে মথুরায় গিয়া সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া রাজকার্য্যে মাতিলেন? তাঁহার মায়ায় সকলে মুগ্ধ, তাঁহার ভালবাসায় সকলে পাগল, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে মায়া থাকিলে তিনি মা যশোদাকে ভুলিতে পারিতেন না, ভালবাসা থাকিলে সোদরসম রাখাল বালকগণকে বিস্মৃত হইতেন না।

তিনি পরম যোগী, অদ্বিতীয় যোগী। যাঁহার হৃদয়ে শক্তি বিশেষের উৎকর্ষতা সাধন হইয়াছে, তাঁহার উপর সেই শক্তির কার্য্য আর হয় না। তাঁহার হৃদয়স্থ শক্তি অপর হৃদয়ে কার্য্য করে।* প্রথমে শক্তির কার্য্যই দেখিতে পাই, ক্রমে শক্তি যত উৎকর্ষতা লাভ করে, তত তাহার কার্য্য নিজ হৃদয়ে আর হয় না; সেই শক্তির কার্য্য চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তুর উপর হয়, সুতরাং এরূপ ব্যক্তি ক্রমে পরম যোগী হয়েন। তাঁহার শক্তি তাঁহার

উপর আর কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না; তিনি অচল, অটল, পর্ব্বতসমান, সদানন্দে বিরাজ করেন।

শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ঠিক এইরূপ যোগীই দেখিতে পাই। তাঁহার হৃদয়স্থ প্রেমশক্তি অপর হৃদয়কে উন্মত্ত করিত, কিন্তু তাঁহাকে পারিত না। তিনি অচল, অটল, পর্ব্বতসমান সদাই দণ্ডায়মান। কেবল যে ব্রজের খেলা তিনি ভুলিয়া ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে যোগী বলিতেছি, এরূপ নহে। আমরা তাঁহার জীবনে কখনও আলোড়ন দেখি নাই, সে হৃদয়ে কখনও যে চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে তাহাও আমরা কখন লক্ষ করি নাই। যখন প্রভাসতীর্থে তাঁহার চক্ষের উপর তাঁহার আত্মীয় স্বজন, প্রিয়জন, সকলে আত্মকলহে একে একে নিধন প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইলেন, তখনও তিনি অচল,অটল, বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। তাঁহার চক্ষের উপর সংসারের সকল প্রিয় আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, একে একে নিহত হইতেছেন. সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়া রমনীগণ, তাঁহার ভগিনী, কন্যা, প্রভৃতি সকলেই বিধবা হইতেছেন, অথচ তিনি অচল, অটল। তিনি জানিতেন যে প্রভাসতীর্থে যদুবংশ সমূলে নির্ম্মূল হইবে, সঙ্গে সঙ্গে মথুরায়, দ্বারকায়, গোকুলে, ক্রন্দনের রোল উঠিবে, তিনি এ সকল জানিয়া শুনিয়াও একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইলেন না। তিনি যদুবংশ রক্ষা করিতে পারিতেন কিনা, সে বিষয়ের উল্লেখের প্রয়োজন নাই। তিনি পারুন আর নাই পারুন, তিনি পরম যোগী যোগেশ্বর না হইলে, চক্ষের উপর আত্মীয় স্বজনের এরূপ নিধন দেখিয়া, কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। অন্ততঃ এ বিবাদ মিটাইবার জন্য একবারও চেষ্টা করিতেন।

না, তিনি তাহার কিছুই করিলেন না, চক্ষের উপর যদুবংশ ধ্বংশ হইয়া গেল। তিনি সেই সুন্দর প্রভাস নরশোণিতে প্লাবিত দেখিয়া এক বিন্দুও চক্ষের জল ফেলিলেন না, নির্ব্বিবাদে অন্যত্র গমন করিয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইলেন। সংসার ভস্মীভূত হইয়া গেলেও তিনি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেন, যদুবংশ তো তাঁহার কিছুই নহে। এরূপ অচল, অটল যোগী এ সংসারে আর কখনও কি কেহ দেখিয়াছেন? আবার এই অচল, অটল পুরুষশ্রেষ্ঠ অপর কেহ নহেন, প্রেমের পূর্ণ উৎস, গোকুলের গোপবালাগণের মনমোহন বঙ্কিম শ্যাম। যাহার মন স্ত্রীলোকের অপেক্ষাও কোমল বলিয়া বোধ হয়, সেই আবার এত কঠিন, এত পর্ব্বত সমান অচল, অটল! যেখানে দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই, যেখানে অন্ধকার ও আলোক সমভাবে একত্রে বিরাজ করে, যাহাতে দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির শক্তি (two coutrary forces) সমভাবে এক সময়ে কার্য্য করে, সেই শক্তিই ভগবানের শক্তি,—তিনিই ভগবান। যে কোমল, তাহাকে আমরা কোমলই দেখিতে পাই; কোমল সময়ে কঠিন হইতে পারে, কিন্তু কোমলত্ব ও কঠিনত্ব এক সময়ে হওয়া আমাদের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। কেবল ভগবানেই এরূপ ভাব হওয়া সম্ভব, কারণ কোমলত্ব ও কঠিনত্ব একত্র না থাকিলে সম্পূর্ণতা রক্ষা হয় না। ভগবান যদি সম্পূর্ণ হয়েন, তবে তাঁহাতেই কেবল দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির শক্তির সমাবেশ ও বিকাশ সম্ভব। যাঁহাতে যত এইরূপ ভাব আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাতেই তত আধ্যাত্মিকতা ও ভগবানত্ব বুঝিতে

হইবে। শ্রীকৃষ্ণে আমরা এ ভাব যেরূপ দেখিতে পাই সেরূপ আর কোন সাধু বা মাহাত্মাতে দেখি নাই। যিনি অতি কোমল তাঁহাকে আমরা ভাল বলিয়া পূজা করি, যিনি অতি কঠিণ, তাঁহাকে আমরা হৃদয়ে হৃদয়ে ভয় করি; কিন্তু কোমলত্ব ও কঠিনত্ব এক সময়ে একত্রে আমরা মনুষ্যজীবনে দেখিতে পাই না। যিনি তাহা হইবেন, তিনিই ভগবান। শ্রীকৃষ্ণে এই ভাব সম্পূর্ণ বিদ্যমান। তাহাই তিনি ভগবানের অবতার।

যদি কেহ বলেন যে কৃষ্ণে দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা কিছুই ছিল না, তিনি পাষণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহেন; তাহা হইলে কোন্ শক্তির বলে তিনি সকলকে প্রেমে মাতাইয়া ছিলেন? কেবল যে কোমলহৃদয়া মা যশোদাকে, সরলপ্রকৃতি রাখাল বালকগণকে ও প্রেমপ্রবণা গোপিনীগণকে তিনি মুগ্ধ করিয়া ছিলেন, এরূপ নহে; তাঁহার হৃদয়স্থ প্রেম অসীম, অনন্ত শক্তি রূপে তাঁহাতে বিরাজ করিত।

তিনি সামান্য গোপগৃহপালিত সামান্য লোকের সন্তান বইত নহেন। তাঁহার সৈন্য সামন্ত কিছুই ছিল না, তাঁহার বন্ধু বান্ধব গোষ্ঠের রাখালগণ, তাঁহার অস্ত্রেরমধ্যে তাঁহার বাঁশী। যিনি বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই, শিক্ষা কাহাকে বলে জানিতেন না; যিনি বাল্যে রাখাল বালকের সহিত গরু চরাইয়াছেন, যৌবনে গোপিকাগণের সহিত রঙ্গ করিয়াছেন, তিনি কোন্ শক্তির বলে কংশ রাজার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন? কেবল ইহাই নহে, তিনি কিরূপে দ্বারকায় রাজা হইয়া বসিলেন? ইহাতেও আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই,—বরং এসকল

হওয়াও কোনরূপে সম্ভব। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, সমস্ত ভারতের একছত্রধারী মহা সংগ্রামশীল কুরু পাণ্ডবগণ কোন্ শক্তির বলে তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ কখন ও যুদ্ধ করিয়া নিজ শোর্য্যবির্য্য দেখান নাই। ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি মহা মহা যোদ্ধাগণ তাঁহার কোন শক্তিতে তাঁহার দাসানুদাস হইয়া ছিলেন? যাঁহার সৈন্য নাই, সামন্ত নাই, যাঁহার শিক্ষা নাই, সাধনা নাই, যাঁহার অস্ত্রের মধ্যে বাঁশী, শিক্ষার মধ্যে বৃন্দাবনে রাস, দোল, হোলিখেলা,—তিনি কোন্ শক্তিতে সকলের শ্রেষ্ঠ পদে প্রতিষ্ঠিত হইযাছিলেন? কই, তিনি বাহুবলে কাহাকেও পরাভূত করিয়া দাসানুদাস করেন নাই, তিনি অসাধারণ যোগবলে কাহাকেও বশীভূত করেন নাই, অথচ সকলেই তাঁহার দাস,—ছত্রধারী সম্রাট, দিগ্বীজয়ী বীর, মহা চতুর রাজনৈতিক,—নানা গভীর শাস্ত্রে মহা পাণ্ডিত হইতে কুটীরবাসী ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেই শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস।

কেন, তাঁহাতে কি শক্তি ছিল, যাহার বলে তিনি সমস্ত জগতকে বশীভূত করিয়াছিলেন? তাঁহাতে এমন কি ছিল যে তাঁহার নিকট যে আসিত সেই তাঁহাকে ভাল বাসিত? তিনি প্রেম-পূর্ণ; তাহাই সেই প্রেমের বলে সমস্ত ভারত, রাজা হইতে প্রজা, সকলেই তাঁহার দাসানুদাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভয়াবহ কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী উপস্থিত, ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরগণ যুদ্ধস্থলে সমবেত;—এ সাধারণ যুদ্ধ নহে, এ যুদ্ধ- আত্মীয়ে আত্মীয়ে, বন্ধুতে বন্ধুতে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ; গুরু এক দিকে শিষ্য অন্যদিকে, পুত্র এক দিকে পিতা অন্যদিকে, এতই জ্ঞাতিবিরোধ ঘটিয়াছে যে কাহারই আর ক্রোধে,

হিংসায়, বিদ্বেষে হিতাহিত জ্ঞান নাই। সকলেই সকলের রক্তপান করিবার জন্য উন্মত্ত। ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, আত্মীয়বিগ্রহে কুরু পাণ্ডব উন্মত্ত হইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ক্ষেপিয়াছে।

এরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে সকলেরই কত সাবধান হইয়া থাকা প্রয়োজন! যেখানে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, কাহারও সহিত কাহারও ভেদাভেদ জ্ঞান নাই, যেখানে সকলেই সকলের রক্তপান করিবার জন্য ব্যস্ত, যেখানে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সকলেরই কত সাবধান থাকা প্রয়োজন, সেই ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন না। জীবনে তিনি কখন অস্ত্র গ্রহণ করেন নাই, ভয়াবহ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও তিনি অস্ত্র গ্রহণ করিলেন না। তাঁহাতে এমন কি শক্তি ছিল, যাহার বলে তিনি অজেয় দুর্ভেদ্য? অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মধ্যে এমন একজনও কি ছিল না যে তাঁহার হৃদয় লক্ষ করিয়া তীর নিক্ষেপ করে, তাঁহার মস্তক লক্ষ করিয়া অসি উত্তোলন করে? যে যুদ্ধে মহারথী ভীষ্ম হইতে সামান্য ক্ষুদ্র সৈনিক পর্য্যন্ত হত আহত হইয়াছিলেন, যে যুদ্ধে এমন কেহই ছিলেন না, যিনি রক্তাক্ত হন নাই, যাঁহার শরীর হইতে রক্তপাত হয় নাই, সেই যুদ্ধে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই শরীর হইতে এক বিন্দুও রক্তপাত হইল না। তাঁহার দেহেই কেবল অস্ত্রের দাগ পড়িল না। কেন? যে যুদ্ধে বালক অভিমন্যুও বাঁচিলেন না, তাঁহার বালসুলভ সরলতাও যেখানে তাঁহাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইল না, সেই ভয়াবহ যুদ্ধে নিরস্ত্র হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ আহত হয়েন নাই! কেহ তাঁহার প্রতি অস্ত্র ক্ষেপ করে নাই! কেন? তাঁহাতে কি ছিল,

যাহার বলে পাষণ্ডের মনও গলিয়া গিয়াছিল? তাঁহাতে কি ছিল, যাহার জন্য কেহ তাঁহাকে আঘাত করিতে পারে নাই?

তিনি যে স্বয়ং প্রেম, তিনি যে মুর্ত্তিমতী ভালবাসা, তিনি যে সম্মুখে আসিলে প্রেমে হৃদয় আপ্লুত হইয়া যায়, পাষাণসম কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়,—তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিতে প্রাণ চায় না। তাঁহার অন্য কোন অলৌকিক ক্ষমতা ছিল কিনা আমরা জানি না। অদ্ভুত আশ্চর্য্যজনক ঘটনা সকল বিশ্বাস করিতে অনেকের প্রাণ চায় না, প্রয়োজনই বা কি? তাঁহার শরীরও রক্তমাংসের শরীর, ভগবান যদি রক্ত-মাংস-শরীরধারী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকেও বাহ্যিক জগতের, জড়জগতের নিয়মের বশীভূত হইতে হয়। এরূপ রক্ত-মাংস-শরীরী শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিক ক্ষমতাধারী হইলেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হত না হউন, নিশ্চয়ই এক দিনের জন্য আহতও হইতেন। অলৌকিক ক্ষমতাধারী মহাত্মা যীশুও ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, জিউগণের হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই। তবে কি গুণে ও কি শক্তির বলে শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রহীন হইয়াও দুর্দ্দান্ত দুর্য্যোধন, পাপমতী দুঃশাসন, উন্মত্ত অশ্বত্থামার অস্ত্র হইতে রক্ষা পাইলেন? ভালবাসা ভিন্ন এ শক্তি আর কোন শক্তিই হইতে পারে না। ভালবাসার বলে বনের পশুও বশীভূত হয়, সিংহ ব্যাঘ্রও দংশনে বিমুখ হয়! কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধস্থিত উন্মত্ত কৌরবসেনা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মুগ্ধ, তাঁহার প্রতি তীর লক্ষ করিতে, তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিতে, তাহাদের ইচ্ছা হইলেও প্রাণ ধরিয়া পারে না। কৃষ্ণ তাহা জানিতেন, তাহাই তিনি কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র গ্রহণ করেন নাই, করিবার আবশ্যকই বা কি।

কুরু পাণ্ডব উভয়েই তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যস্ত,—কেবল তাঁহাকে, সেই নিরস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে, পাইবার জন্যই ব্যস্ত। যিনি যুদ্ধ করিবেন না, তাঁহাকে পাইবার জন্য উভয় পক্ষে এত ব্যগ্র কেন? শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নারায়ণী সেনা সমস্তই দুর্য্যোধনকে দিয়া নিরস্ত্র পাণ্ডব পক্ষ গ্রহণ করিয়া, যুদ্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তাহাতেই পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধন অপেক্ষা সৈন্য, সামন্ত সেনাপতি ও অর্থে দুর্ব্বল হইয়াও যুদ্ধে বিজয়ী হইলেন;—কারণ তিনি প্রেম-শক্তি। অর্জ্জুনের রথে তাঁহাকে দেখিয়া পাছে তাঁহার সেই অঙ্গে অস্ত্রাঘাত হয়, এই বলিয়া কেহ অর্জ্জুনের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে সাহস পান নাই। তিনি যুদ্ধের যে স্থলে উপস্থিত হয়েন, পাছে তাঁহার দেহে অস্ত্র ঘাত হয়, এই ভয়ে অনেকেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; এমন প্রেমের দৃশ্য এ সংসারে আর কি কোথাও আছে? উন্মত্ত রক্তপিপাসু কৌরবসেনা প্রাণ ধরিয়া তাঁহার সোনার অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিতে পারে নাই!

তিনি প্রেমময় পূর্ণ প্রেম শক্তি, তাহা না হইলে কখনও পাণ্ডবের পক্ষ গ্রহণ করিতেন না। যদি তাঁহাতে প্রেমভিন্ন অন্য কিছু থাকিত, যদি তাঁহাতে উচ্চাভিলাষ, আশা, কামনা প্রভৃতি থাকিত, তাহা হইলে তিনি নির্ব্বাসিত ও সৈন্য-সামন্ত-অর্থ-রাজ্য বিহীন পাণ্ডবদিগের পক্ষ গ্রহণ করিতেন না। যদি তাঁহাতে কামনা থাকিত, তাহা হইলে তিনিতো সসাগরা পৃথিবীর রাজা হইতে পারিতেন; সকলেইতো তাঁহার পদানত হইয়া ছিল।— না, তাঁহাতে প্রেম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। প্রেম-শক্তি প্রেম কার্য্যের দাস। এই জন্যই তিনি এক সময়ে গোকুলে

শ্রীরাধা ও গোপিকাগণের দাস হইয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি পরে প্রাণসম সখা অর্জ্জুনের দাস হইয়াছিলেন। গোকুলে শ্রীমতী রাধা তাঁহাকে যেমন ভাল বাসিতেন, ইন্দ্রপ্রস্থেও অর্জ্জুন তাঁহাকে তেমনই ভাল বাসিতেন। তাহাই তিনি পাণ্ডবগণের অনুচর, সহায়, বন্ধু,—দাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভক্তের ডাকে ভক্তেশ্বর রহিতে পারেন না,—তিনি যে ভক্তের দাস।

যাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিতে কাহারও প্রাণ চায় না, যাঁহাকে দেখিলেই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারা যায় না, যাঁহাকে পাইবার জন্য শত্রু মিত্র সকলই পাগল, তিনিই আবার কি কঠিন, কি নির্দ্দয়, কি অচল, অটল পাষাণ দেখুন! যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের তরঙ্গ ছুটিতেছে, ক্রন্দনের রোল উঠিতেছে, পিতা পুত্রহীন হইতেছে, ভ্রাতা ভ্রাতা হারাইয়া কাঁদিতেছে, সমস্ত ভারতের গৃহে গৃহে অশ্রুনীরের প্রবাহ প্রধাবিত হইয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণ অচল, অটল! যখন সম্মুখে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীকে দেখিয়া অর্জ্জুন গাণ্ডিব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সখে, আমার দ্বারা যুদ্ধ হইল না! রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। কোন্ প্রাণে আমি আমার আত্মীয় স্বজনের রক্তে ধরা প্লাবিত করিব? কোন্ প্রাণে আমি আমার আত্মীয়া রমণীগণকে পুত্রহীনা, ভ্রাতৃহীনা, পিতৃহীনা, স্বামীহীনা অনাথিনী করিব?" তখন প্রেমসিন্দু শ্রীগোবিন্দ বলিলেন, "সখে, যুদ্ধ করিবে বইকি! এ সংসারে জীবন মৃত্যু দুই-ই সমান! শোক দুঃখ কিছুই নহে, ন্যায় অন্যায় একত্রে বিরাজ করে। তুমি কাজ করিতে আসিয়াছ, কাজ কর। কামনা রাখ কেন?

যখন কামনা পরিত্যাগ করিবে, তখনই দেখিতে পাইবে যে তোমার নিকট জীবন মৃত্যু উভয়ই সমান বলিয়া বোধ হইবে।" শ্রীকৃষ্ণ পুস্তকশ্রেষ্ঠ গীতায় যে সকল উপদেশ অর্জ্জুনকে দিয়া গিয়াছেন, সেরূপ উপদেশ এ পর্য্যন্ত আর কেহ এ সংসারে দিতে সক্ষম হন নাই। গীতার ন্যায় পুস্তকও আর এ জগতে নাই।

তাহাই শ্রীকৃষ্ণ পরম যোগী। কামনা তাঁহাতে একেবারেই নাই। তিনি জীবন্ত শক্তি, শক্তির কার্য্য তাঁহাতে একেবারেই হয় না, তাঁহার শক্তি অপর দ্রব্যে ও অপর ব্যক্তির উপর কার্য্যকারী হইয়াছে। কখন তাঁহাতে কোন কার্য্য দেখি নাই, তিনি কোন কার্য্য করেন নাই। তাঁহার শক্তির অন্তরালে থাকিয়া কতজন কত কাজ করিয়াছে, কিন্তু তিনি অচল, অটল শক্তি মাত্র!

তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণই কি পূর্ণ ব্রহ্মের অবতার? তাহা যদি হয়েন, তাহা হইলে ভগবান কি কেবলই প্রেম শক্তি? এই শক্তি ব্যতীত তিনি কি আর কিছু নহেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রেম-শক্তির কার্য্য অনুভূতি, কেবল অনুভূতিতে জগত সৃষ্ট হইতে পারে না, থাকিতেও পারে না। আধ্যাত্মিক জগতে অনুভূতি অর্দ্ধেক, অনুভূতি সকল নহে। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আর একটী মূল শক্তি আছে। যেমন প্রেম হইতে শত শত বৃত্তির সৃষ্টি, তেমনই এই শক্তি হইতেও শত শত বৃত্তির সৃষ্টি। এই শক্তির নাম চিৎশক্তি, অথবা জ্ঞান।

প্রেম ও জ্ঞান এই দুই শক্তির সমষ্টির নাম ব্রহ্ম। এই দুইটীই জগতের মূল শক্তি, তৎপরে ইহা হইতে আরও কত শত সহস্র শক্তি বা শক্তির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই দুই শক্তি ব্যতীত আর কোন শক্তি নাই, আমরা ইহাদের কার্য্যকেই অনেক সময়ে স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া বোধ করি।

এই দুইটী শক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির শক্তি; একটীকে কোমল শক্তি, অপরটীকে কঠিন শক্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট শক্তি (two contrary forces) একত্রে কার্য্য করিতেছে বলিয়াই কার্য্য হইতেছে ও জগত সৃষ্ট হইয়াছে; নতুবা হইত না, হইতে পারে না। কেবল প্রেম-শক্তি ব্রহ্ম নহে, কেবল জ্ঞান-শক্তি ব্রহ্ম নহে; এই দুই শক্তির সম্মিলনে যে শক্তি, সেই শক্তিই পরব্রহ্মের শক্তি। কিন্তু এরূপ ব্রহ্মের ধারণা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। দুই শক্তির কার্য্য যাহা হইতেছে, তাহাই আমরা ধারণা করিতে পারি, অন্য আর কিছুই পারি না; এই জন্যই হিন্দু দার্শনিকগণ ভগবানের দুই শক্তির দুইটী বিভিন্ন নাম দিয়াছেন; একটীর নাম প্রকৃতি, অপরটীর নাম পুরুষ, অর্থাৎ প্রকৃতি প্রেম, পুরুষ জ্ঞান। কিন্তু প্রকৃতি পুরুষ কখনও বিছিন্ন হইয়া রহেন না। প্রকৃতি ও পুরুষ বা জ্ঞান ও প্রেম পরব্রহ্মের দুইটী শক্তি।

শ্রীকৃষ্ণে আমরা পূর্ণ প্রেম-শক্তি দেখিয়াছি, সেই প্রেম শক্তির কার্য্য অনুভূতির জলন্ত ছবি শ্রীমতী রাধায় দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি যদি পূর্ণ ব্রহ্মের প্রেম-শক্তি হয়েন, তবে তাঁহার জ্ঞান-শক্তি কোথায়? প্রেম হইতে জ্ঞান কখন বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না; প্রকৃতি হইতে পুরুষ কখনও বিচ্ছিন্ন হয়

না। তিনি যদি পূর্ণ প্রেম-শক্তি হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাতে নিশ্চয়ই জ্ঞান-শক্তিও বিদ্যমান আছে।

শ্রীকৃষ্ণ যে পরম জ্ঞানী, তাহা সকলেই জানেন। মহাভারত হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পুরাণ পর্য্যন্ত সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানমাহাত্ম্য প্রকাশ করা হইয়াছে। যাঁহাতে জ্ঞান-শক্তি পূর্ণভাবে বিরাজিত, তাঁহার গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ, কালীয় দমন, কালীরূপ ধারণ প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য সকল করা কোন মতেই অসম্ভব নহে। জ্ঞান-শক্তির নিকট অসম্ভব কার্য্য কি আছে?

তবে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের জ্ঞান-শক্তির অবতার নহেন। তিনি তাঁহার প্রেম-শক্তির অবতার, তাহাই তাঁহাতে প্রেমের বিকাশ, তাহাই তাঁহা হইতে চারিদিকে প্রেম-শক্তি বিকীর্ণ হইয়া প্রেমের কার্য্য হইয়াছে, চারিদিকে প্রেমের হাট বসিয়াছে। আমরা তাঁহাতে অসীম, অনন্ত, অজ্ঞেয়, অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান দেখিতে পাই বটে, তাঁহাকে পরম জ্ঞানী, পূর্ণ জ্ঞান-শক্তি বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি বটে, কিন্তু জ্ঞানের কার্য্য তাঁহাতে তত স্পষ্ট নাই, প্রেমই তাঁহাতে উজ্জ্বল। জ্ঞান যেন কৃষ্ণরূপ অদ্ভুত বৃক্ষের মূল; মূল মৃত্তিকানিম্নে আছে আমরা তাহা সকলেই জানি, কিন্তু জানিয়াও তাহা দেখিতে পাই না। সেইরূপ কৃষ্ণে জ্ঞান আছে জানি, কিন্তু সুস্পষ্ট দেখিতে পাই না। প্রেম কৃষ্ণ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা, ফল ফুল। তাহাই শ্রীকৃষ্ণে প্রেমের খেলাই দেখি।

ইচ্ছা হয় বলুন, শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান, আর রাধা প্রেম; শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি; অথবা ইচ্ছা হয় বলুন, শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতি

পুরুষ সম্মিলিত পরব্রহ্ম। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে রাধা অনুভূতি,—রাধা কার্য্য মাত্র, শক্তি নহেন; সুতরাং রাধাকে প্রকৃতি স্বরূপিণী শক্তি বলিতে পারা যায় না। শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতি, শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ,—কারণ প্রকৃতি পুরুষ বিচ্ছিন্ন হইবার নহে।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের প্রেমের অবতার; জ্ঞান তাহাই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের মূল; তাহাই তিনি পরম যোগী যোগেশ্বর। তাহাই তাঁহাকে আমরা চিনিতে পারি না, বুঝিতে পারি না। এই তিনি বালক, এই তিনি জ্ঞানী; এই তিনি দয়াময়, এই তিনি নির্দ্দয়; এই তিনি কোমল, এই তিনি কঠিন; তাঁহাতে জ্ঞান ও প্রেম সমভাবে বিরাজ করিতেছে। তিনিই জ্ঞান-শক্তি, তিনিই আবার প্রেম-শক্তি; তিনিই সব। শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণকে আদর করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "নাথ, তুমি আমার অঙ্গের ভূষণ, মস্তকের মণি, হৃদয়ের মন, জীবনের প্রাণ।" এইরূপে শ্রীমতী রাধা হৃদয়ের সকল আবেগ মিটাইয়া সকল কথা বলিয়াও সন্তুষ্ট হইলেন না; অবশেষে বলিলেন, "নাথ, তোমাকে আর কি বলিব, তুমি আমার সব।" আমরাও বলি শ্রীকৃষ্ণ এ জগতের সব। "সব" ভিন্ন তাঁহার আর অন্য বর্ণনা বা অন্য নাম হয় না, হইতেও পারে না।

এইতো শ্রীকৃষ্ণ;—প্রেমের ইহাপেক্ষা উচ্চ আইডিয়াল্ (ভাব) আর হয় নাই, হইবে কিনা তাহা আমরা জানি না। শক্তি-স্বরূপিনী অসীম, অনন্ত প্রেমের ভাব যদি কিছু থাকে, যদি কখনও প্রেমের আকার গঠিত হইয়া সেই প্রেমের কার্য্য হয়, তবে তাহা হইলে সেই প্রেম শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

ভগবানে যে প্রেম-শক্তি আছে, অথবা ভগবান যে পূর্ণ প্রেম-শক্তি, তাহা ধারণা করিতে গেলেই তাহাতে একটী আকার অরোপ করিতে হয়। ভগবানের এইরূপ আকার আরোপিত হইলে তবে তাঁহাকে প্রেমময় প্রেমের কার্য্যে সদা নিরত দেখিতে পাওয়া যায় ও তাঁহার ধারণা হয়; নতুবা এমন কেহ মানুষ এ সংসারে নাই বা হইতেও পারেন না, যিনি শরিরী হইয়া আকার শূন্য কোন বিষয়ের ধারণা বা অনুভব করেন। ধারণা করিতে হইলে আকার চাই, সেই প্রেমের ন্যায় হইতে ইচ্ছা করিলে একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত চাই, কোন একটা বিষয়ের সমতুল্য হইতে হইলে মনে একটা আইডিয়াল্ চাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানব জাতীর সুখের তৃষ্ণা নিবারণের উপায় প্রেম; প্রেম আমাদের সকলেরই হৃদয়ে বিদ্যমান আছে, সেই প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলেরই মনে এক একটী প্রেমের আইডিয়াল আছে। সেই আইডিয়াল্ প্রেমের পূর্ণ চিত্র নহে; আমাদের শিক্ষা, আমাদের অভ্যাস, আমাদের সমাজ প্রভৃতির মত আমাদের প্রেমের আইডিয়াল্ ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু সহস্র শিক্ষায় মহা মহা পণ্ডিত ও দার্শনিকগণও প্রেমের পূর্ণ আইডিয়াল্ গঠিত করিতে পারেন নাই। ভারতে, গ্রীসে, রোমে ও আধুনিক ইয়ুরোপে মহা মহা দার্শনিকগণ জন্মিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই এ পর্য্যন্ত প্রেমের সর্ব্বোচ্চ আইডিয়াল্ জগতে প্রচার করিতে পারেন নাই। এ কার্য্য প্রেমসিন্ধু স্বয়ং ভগবান ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে। ইহাই মানবের সুখের তৃষ্ণা নিবারণের একমাত্র জল না হইলে ভগবানের এ আইডিয়াল্ মানব জাতির সম্মুখে গঠিত করিবার কোনই আবশ্যকতা ছিল

না। মানবের হৃদয়ে সুখের তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রেম আছে, কিন্তু সেই প্রেম-সুধা পান করিতে তাহারা জানে না। যেমন অত্যাশ্চর্য্য ভাবে তিনি শিশুকে মাতৃস্তন পান করিতে শিখাইয়া দিয়াছেন, পক্ষীকে নীড় নির্ম্মাণ করিতে শিখাইয়াছেন, ফুলকে ফুটিতে শিখাইয়াছেন, সেইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ভাবে তিনি মানবকে প্রেম-সুধা পান করাইবার জন্য মহাত্মা, সাধু ও কবিগণের কণ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের দ্বারা জগতে প্রেমের সর্ব্বোচ্চ আইডিয়াল্ অঙ্কিত করিয়াছেন। মানবজাতির সম্মুখে প্রেমের সর্ব্বোচ্চ আইডিয়াল্ স্থাপন করিলেও তাহারা প্রেম সুধা পান করিয়া প্রাণের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না। পূর্ণ প্রেমিক কাহাকে বলে, পূর্ণ প্রেমিক হইতে হইলে কি করিতে হয়, পূর্ণ প্রেমিকের চিহ্ন কি, পূর্ণ প্রেমিক সংসারে কিরূপ কাজ করেন,—এই সকল চক্ষের উপর না দেখিলে, এইরূপ একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত ও ছবি না দেখিতে পাইলে মানুষ প্রেম শিক্ষা করিতে কিছুতেই পারে না,--প্রেমিক হওয়া তাহাদের সম্পূর্ণ অসাধ্য হইয়া পড়ে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানবের এ অভাব দূর করিবার জন্য ভগবান মানবজাতির সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ভাবরাজ্যে হস্তপদবিশিষ্ট মনুষ্য হইয়া পূর্ণ প্রেমিকের জলন্ত দৃষ্টান্ত ও প্রতিমা দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি তাহাই শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন। প্রেমের জলন্ত দৃষ্টান্ত ও উজ্জ্বল প্রতিমা আর যদি কোন থাকে, ভালই ;—আমরা তাঁহাকেই গ্রহণ করিব, শ্রীকৃষ্ণে আমাদের প্রয়োজন কি ? কিন্তু তাহা নাই, ভগবান একবার ব্যতীত দুইবার অবতার হন নাই। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার প্রেম-শক্তির অবতার, কৃষ্ণ বই আর অবতার নাই।

তাই বলি, যদি সংসারে থাকিয়া সুখের অসহনীয় তৃষ্ণা নিবারণ করিবার ইচ্ছা কর, তবে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে আশ্রয় গ্রহণ কর। এতদ্ব্যতীত আর অন্য পথ নাই এবং অন্য উপায়ও নাই, ইহাই সুখের তৃষ্ণা নিবারণের একমাত্র পথ। হৃদয়স্থ প্রেম-শক্তির চর্চ্চা কর, চর্চ্চায় সকলেরই উৎকর্ষতা সাধন হয়। এই চর্চ্চার নামই সাধনা। সাধনা ভিন্ন হৃদয়স্থ প্রেমকে উন্নীত করিবার আর অন্য উপায় নাই, তাহাই শাস্ত্রের মত হইয়া যাও। এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই চক্ষের উপর, এরূপ সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি আমরা প্রেম শিক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে আর কিসে পারিব! আইস, আমরা প্রথমে গোপিকাগণের ন্যায় প্রেমিকা হই; তৎপরে আইস, আমরা শ্রীমতী রাধার ন্যায় প্রেমময়ী হইয়া যাই। না, ইহাতেও প্রেমের শেষ হইবে না, ইহাতেও হৃদয়ে আলোড়ন, বিলোড়ন, বেগ, গতি, চঞ্চলতা থাকিবে, আইস আমরা সকলে অবশেষে শ্রীমধুসূদন বৃন্দাবনের বাঁকা মদনমোহনের ন্যায় পূর্ণ প্রেম হইয়া যাই। তখন আমরাও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ঠিক অচল, অটল হইব, আমাদেরও আর কোন চঞ্চলতা থাকিবে না, হৃদয় হইতে কামনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। আমাদের হৃদয়স্থ প্রেম-শক্তি পূর্ণতা লাভ করিয়া সেই শক্তির কার্য্য অন্যত্র হইবে, আমাদের উপর আর হইবে না।

আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পূর্ণ প্রেম,—পূর্ণ প্রেম-শক্তিতে পরিণত হইব, তখন আমরাও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অসীম ক্ষমতাশালী হইতে পারিব; তখন আমাতে ও শ্রীকৃষ্ণে আর কোনই প্রভেদ থাকিবে না। তখন আনন্দে, পূর্ণানন্দে, অনির্ব্বচনীয় অসীম অনন্ত

আনন্দে, বিভোর হইয়া আমরা সকলে আকাশ পাতাল ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিব, "শিবহং শিবহং।"

শ্রীকৃষ্ণ মরেন নাই; তিনি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত রহিবেন। তবে তাঁহার চরণারবিন্দ পান করিয়া কত শত লোক শ্রীকৃষ্ণ হইয়া ভগবানে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অবতার নহেন, তাঁহারা সাধু ও মাহাত্মা। কত শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন, আরও কত শ্রীকৃষ্ণ হইবেন। কত প্রেম-নদী প্রেমসাগরে যাইয়া একাকারে মিশিয়া যাইবে, গিয়াছে ও যাইতেছে। নদীয়ার গৌরাঙ্গ, জেরুজিলামে যীশু; দূর পঞ্জাবে নানক, অতি সন্নিকট-বর্ত্তী দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ,—কত নাম করিব? কত হইয়াছেন, কত হইবেন, কত যাইবেন! প্রেমসাগরে জগত বিলীন হইয়া আছে, ভগবানের প্রেম-শক্তি জগতের সকল দ্রব্যে, কীটানুকীট পরমানু পর্য্যন্ত সকল দ্রব্যে, কি জড়, কি আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিষয়ে ব্যাপ্ত সেই শক্তির বলেই জগতের অনুভূতি হইয়াছে, তোমাতে আমাতে সকলেতেই এই অজেয় শক্তি বিরাজ করে; এই শক্তির কার্য্য অনুভূতি, অনুভূতির ফল কামনা। ক্রমে চেষ্টায়, ক্রমে সাধনায়, ক্রমে চর্চায় মানুষ কামনা ত্যাগ করিতে পারে। কামনা না থাকিলে অনুভূতি থাকে না, অনুভূতি না থাকিলে কেবলই শক্তি থাকে। ভগবান শক্তি মাত্র, সেই শক্তির কার্য্য জগত, জগতের বিলোপ ধারনা করিলেও অস্তিত্ব থাকে: সমস্ত কার্য্য নষ্ট করিলেও শক্তি থাকে;—আবার কামনাশূন্য কার্য্য হইলেও অনুভূতি থাকে না, কিন্তু শক্তি থাকে; শক্তির অস্তিত্ব কখনও বিলুপ্ত হয় না। কেবলই শক্তি ভগবান; সুতরাং মানুষ যখন কেবলেই শক্তি হয়েন, তখন তিনি ভগবান হইয়া যান। ভগবানেও

তাঁহাতে কোনই প্রভেদ থাকে না। তাহাই বলিয়া তিনি কি স্বতন্ত্র আর একজন ভগবান হয়েন? না, তাহা নহে; ভগবানের শক্তিই তাঁহাতে বিরাজ করে। সেই শক্তি, তাহাতে শক্তি মাত্র হইলে তিনি ভগবানে মিশিয়া যান,—ইহাই মুক্তি।

জগতে কি রূপে শক্তি হইতে হয়, ভগবান তাহাই দেখাইবার জন্য আকার ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার প্রেম-শক্তির আকার, অবতার ও প্রতিমা। সুতরাং সংসারে সুখী হইতে ইচ্ছা করিলে, সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ভগবানে মিশিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলে, কৃষ্ণ ব্যতীত আর উপায় নাই; কৃষ্ণই গতি, কৃষ্ণই মুক্তি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে ভগবান মনুষ্য প্রকৃতিতে দুই বিভিন্ন ভাব সৃষ্টি করিয়াছেন দুইটী শক্তির সম্মিলনেই মনুষ্য জীবন প্রত্যেক মনুষ্যে প্রেম ও জ্ঞান আছে, প্রেম ও জ্ঞানই মানবজীবনের সুখ। এইজন্য মনুষ্যেরও দুই প্রকার প্রকৃতি হয়, এক প্রকার প্রেমপিপাসু প্রকৃতি ও অন্য প্রকার জ্ঞানপিপাসু প্রকৃতি। কাহারও প্রকৃতিতে জ্ঞান ভাল লাগে, কাহারও প্রকৃতিতে প্রেম ভাল লাগে। যে প্রেমিক-প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোক, সে যত সহজে প্রেম উপার্জ্জন করিতে পারে, তত সহজে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে না। আবার যাঁহার জ্ঞান-প্রকৃতি বিশিষ্ট মন, তিনি যত শীঘ্র জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারেন, তত শীঘ্র প্রেম উপার্জ্জন করিতে পারেন না। এইজন্য দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট মানবজীবনের জন্য দুইটী বিভিন্ন ভাব যুক্ত ধর্ম্মের আবশ্যক। এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই জন্যই ভগবানকে প্রেম-রূপ ও জ্ঞান-রূপ উভয় রূপেই অবতার গ্রহণ

করিতে হইয়াছে। আমরা ভগবানের প্রেম-রূপ অবতারের আলোচনা বিস্তৃত ভাবে করিয়াছি। কেবল তিনিই যদি ভগবানের অবতার হইতেন, তাহা হইলে ভগবানের অবতার পূর্ণ হইত না, মানবজীবনের ধর্ম্মপিপাসাও মিটিত না। যাঁহাদের প্রেমিক প্রকৃতি, কেবল তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিয়া সময়ে শ্রীকৃষ্ণ হইয়া মুক্তির পথে বিচরণ করিতে সক্ষম হন। এইজন্য জ্ঞানের একটী অবতারও আবশ্যক।

যেমন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধা প্রেমের চিত্র ও প্রেমের অবতার, ঠিক সেইরূপ হরগৌরী জ্ঞানের চিত্র, জ্ঞানের অবতার। কৃষ্ণচিত্র ও কৃষ্ণ অবতার আলোচনা কালে আমরা এ সকলের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রীয় বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়াছি, হরগৌরী অবতার বর্ণনা কালে আমাদের এ সকল বিষয়ের আর পুনরায় আলোচনা করিতে হইবে না। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা আবশ্যক ও প্রয়োজন, তাহার সমস্তই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। হরগৌরীর আলোচনা কালে তাঁহারা কি জন্য জ্ঞানের চিত্র, জ্ঞানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ও জ্ঞানের পূর্ণ অবতার, তাহাই আমরা দেখাইব।

হর-গৌরী

ভারতবর্ষের উত্তরে তুষারমণ্ডিত সুন্দর হিমালয়, হিমালয়ের উত্তরে সুন্দরতম কৈলাস; কবিকুলমণি কালিদাস যে মুনিজন মনহারী অপ্সরীকিন্নরীর আবসভূমি অপূর্ব্ব কৈলাসের বর্ণনা করিয়াও বর্ণনা করিতে পারেন নাই, সে কৈলাস বর্ণনার আর আবশ্যকতা কি?—আমাদের সাধ্যই বা কি?

সেই সুন্দর কৈলাসে,—যথায় হিংসা দ্বেষ নাই, কলহ বিবাদ নাই, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য, ক্রোধ নাই, যথায় সিংহিনীর সহিত হরিণী একত্র বিচরণ করে, ব্যাঘ্রশাবক মেষ শাবকের সহিত একত্রে ক্রীড়া করে, সেই পবিত্র, অতি মনরমা, পরম সুন্দর কৈলাসে ভূতভাবন ভূতনাথ বসতি করেন।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলে বরং তাঁহাকে প্রকৃতই একজন মানুষ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত হইয়াছে। সেই যমুনা এখনও সেইরূপ ভাবে বহমানা হইতেছে, সেই বৃন্দাবন এখনও সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সেই মথুরা এখনও অবস্থিত, শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল এখনও শত সহস্র লোক প্রতি দিন দেখিয়া জীবন সার্থক করিতেছে। ইহাতে সহজেই শ্রীকৃষ্ণকে একজন শরীরধারী জীব বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, অনেকে ঠিক এই ভাবেই তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু শিবের তাহার কিছুই নাই। শিব সম্পূর্ণই ভাবরাজ্যের পূর্ণ ছবি, শিব সম্পূর্ণই আইডিয়াল্ প্রতিমূর্ত্তি।

শিব জন্মেনও নাই, মরেনও নাই। তাঁহার আদিও নাই, অন্তও নাই। তিনি অসীম, অনন্ত, অজ্ঞেয়; শ্রীকৃষ্ণের মত নহেন। মানুষ পূর্ণ ব্রহ্মের যেরূপ ধারণা করিতে পারে বা তাহাদের দ্বারা পূর্ণ ব্রহ্মের যেরূপ ধারণা হওয়া সম্ভব, শিব তাহাই। তিনি সম্পূর্ণই আইডিয়াল্।

প্রেমের সকল প্রকার কার্য্য দেখাইতে হইলে প্রেমকে মানব জীবনের সর্ব্বাবস্থায় দেখাইতে হয়। জ্ঞান সম্বন্ধে এ আবশ্যকতা নাই। মানব প্রেম যত সহজে বুঝিতে পারে, জ্ঞান তত সহজে পারে না। তাহাই আমরা শ্রীকৃষ্ণকে যত সহজে বুঝিতে পারি বা ধারণা করিতে পারি, শিবকে তত শীঘ্র পারি না। শিব যেন অনন্ত, শিব যেন অজ্ঞেয়, শিব যেন গভীর অতল সাগর, তাঁহার অন্ত নাই, সীমা নাই, কিছুই নাই, কেবলই এক অজ্ঞেয় শক্তি।

অথচ তিনি মানুষ, তাঁহার মানুষের ন্যায় আকার, মানুষের ন্যায় কার্য্যকলাপ, মানুষের ন্যায় ঘর সংসার। তিনি সগুণ ভগবান, তাঁহাতে ভগবানের সকল গুণ বিরাজ করিতেছে, অথচ তিনি মানুষ। তাঁহাকে একদিকে আমরা পূর্ণব্রহ্ম অবস্থায় দেখিতেছি, অপর দিকে তাঁহাকে আমাদেরই ন্যায় ঘর সংসার করিতে দেখিতেছি; তাহাই তিনি অতি সুন্দর, তাহাই তাঁহার ন্যায় এমন সুন্দর, এমন ভাবময়, এমন শক্তিময় আর কিছুই নাই। জ্ঞান শক্তি ভগবানের চিৎশক্তি, এই শক্তি হইতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। প্রেম-শক্তি ভগবানের সৌন্দর্য্য, জ্ঞান-শক্তি তাঁহার জীবন। প্রেম-শক্তি শাখা প্রশাখা, ফল ফুল, জ্ঞান-শক্তি মূল। যিনি পূর্ণ জ্ঞানী, তিনি সর্ব্ব শক্তিময়,

তাঁহার নিকট অসাধ্য কিছুই নাই, অজ্ঞেয় কিছুই হইতে পারে না,—তিনিই ব্রহ্মের সকল গুণযুক্ত অনন্ত পুরুষ।

কৈলাসে জটাজুটধারী ভূতনাথ শরিরী, তিনি ঠিক আমাদেরই ন্যায় মানুষ; তবে সাধু, মহাত্ম ও কবিগণ তাঁহার যে রূপ গঠিত করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব সুন্দর। তাহাপেক্ষা জ্ঞানের মূর্ত্তি কল্পিত হইতে পারে না। শিব জটাজুটধারী ভূতনাথ, তাঁহার রং অমল ধবল, শূন্যের যদি কিছু রং থাকে তবে তাহাই সেই রং। তাঁহার কপালে অগ্নি সর্ব্বদা ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে, তাঁহার মস্তকে কল্লোলিনী গঙ্গা সর্ব্বদা উন্মাদিনী ভাবে ছুটিতেছে; তাঁহার গলায় হাড় মালা, কোটীতে কাল ফনিনী; তাঁহার পরিধান বাঘছাল, তাঁহার হস্তে ভয়াবহ ত্রিশূল; সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যদি একটী আকার প্রদান সম্ভব হয়, সমস্ত জগতের যদি একটী রূপ মানবরূপ, কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে সে রূপ অনন্ত, অজ্ঞেয় শিবরূপ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। জগতে যেমন ধন ও নির্দ্ধন, মনি ও অঙ্গার, জীবন ও মৃত্যু, অন্ধকার ও আলোক সর্ব্বদা একত্রে একসঙ্গে বিরাজ করে, কেবল শিবরূপেই তাহাই আমরা দেখিতে পাই।

শিবের আকার যেরূপ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ, তাঁহার হৃদয়ও জগৎপিতা পরমেশ্বরের প্রতিরূপ। তিনি একদিকে যেমন কঠোর, অপরদিকে তিনি তেমনই কোমল; একদিকে তিনি যেমন জ্ঞানী, অপর দিকে তিনি তেমনই প্রেমিক; একদিকে তিনি যেমন দয়াময, অন্যদিকে তিনি তেমনই নিষ্ঠুর; তাঁহাতে সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ের সম্মিলন। তিনি ধনী, তিনি আবার

দরিদ্র ; যাঁহার ভাণ্ডারী কুবের, তাঁহারই আবার শ্মশানে গৃহ ; যাঁহার ন্যায় যোগী এ সংসারে আর কেহই নাই, তিনিই আবার পরম গৃহী; এমন গৃহীও আর এ সংসারে কেহ নাই।

তিনি যেমন ভাল, তিনি তেমনই মন্দ। তিনি সুধাপান করেন, তিনিই আবার বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। তিনি পরম যোগী, গভীরতম ধ্যানে সর্ব্বদা মগ্ন হইয়া রহেন, কিন্তু তাঁহার ক্রোড়ে হাস্যময়ী মা সর্ব্বদা হাসিতেছেন। এমন সুন্দর স্ত্রী, যৌবন শোভায় ভাসমানা, প্রেমাতুরা, প্রেমউৎস গৌরী যাঁহার ক্রোড়ে. তিনি সেই গৌরীকে ভুলিয়া কিরূপে যোগে মত্ত হয়েন. কিরূপে আত্ম বিস্মৃত হয়েন, আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আমরা ইহা ধারণাও করিতে পারি না। কিন্তু ভগবান এই দৃশ্য আমাদিগকে দেখাইবার জন্যই জগতে এই শিবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপ হইতে পারিলেই সুখী, অনন্ত, অসীম, অনির্ব্বচনীয় সুখী হইতে পারা যায় ; এই জন্যই তিনি কৈলাসে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন।

পুরাণের পর পুরাণ প্রকাশিত হইয়া শিবের এই সুন্দর মূর্ত্তি. শিবের এই সুন্দর জীবন বর্ণিত হইয়াছে ; পুরাণের পর পুরাণ লিখিত, প্রচারিত ও হিন্দু গৃহে গৃহে ঘোষিত হইয়া শিবের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। শত শত সাধু, মহাত্মা ও কবি জন্ম গ্রহণ করিয়া এই মূর্ত্তির উৎকর্ষতা সাধন করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে আমাদের চক্ষের উপর যে শিব মূর্ত্তি দেখিতে পাই, আমরা গৃহে গৃহে যে শিব পূজা করি, সে শিব এক দিনে সৃষ্ট হন নাই, সে শিবের গঠন এক দিনে গঠিত হয় নাই। শত সহস্র বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও

ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট সাধু, মহাত্মা ও কবির হৃদয়ে ঐশিক শক্তি উদিত হইয়া তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে সত্য, অজ্ঞেয় ও সুন্দর বাক্য সকল প্রকাশ হইয়া এই শিবমূর্ত্তি ভাবরাজ্যে দিন দিন অধিকতর উজ্জল হইতেছে, হইয়াছে ও অনন্ত কাল হইবে। এমন সুন্দর, এমন মনোহর, এমন হৃদয়-আনন্দ-দায়ক, এমন জ্ঞানময়, পূর্ণ-জ্ঞান-শক্তি-স্বরূপ শিবমূর্ত্তি আর জগতে হয় নাই, হইবেও না, হইতেও পারে না। মানুষের সৃষ্ট বিষয় মানুষে সৃষ্টি করিতে পারে, যাহা একবার হইয়াছে, তাহা আর একবার হইতে পারে; যাহা চিন্তায়, শিক্ষায়, বুদ্ধি বলে হয়, তাহা মানুষ চেষ্টা করিলে করিতে পারে, কিন্তু অনন্ত, অসীম, অজ্ঞেয় শিবমূর্ত্তি তাহা নহে। ইহা মানুষের সৃষ্ট বিষয় নহে, মানুষ এরূপ কখন সৃষ্টি করিতে পারে না; যাহা মানুষের হৃদয়ে ধারণা হয় না, তাহা মানুষ কিরূপে সৃষ্টি করিবে? এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি, সুতরাং সে সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ এখানে আর আবশ্যক নাই।

এই যে কৈলাসনাথ সুন্দর শিব,—ইনি কে?—আমরা শিবের যে মুর্ত্তি জগতে প্রচারিত দেখিতেছি, এই শিব কে?—ইনি কোথায় বসতি করেন?—ইঁহার প্রকৃতি কিরূপ?—এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব।

অনন্ত, অজ্ঞেয়, অসীম শিব; তাঁহার অন্তও নাই, শেষও নাই। তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আছেন, শেষ পর্য্যন্তও থাকিবেন। একই ভাব, একই রূপ, একই প্রকৃতি; তুসার-মণ্ডিত মণিমুক্তার আবাসস্থল কৈলাসের ন্যায় অটল, অচল। ইঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও এবং সমস্ত কুবের-ভাণ্ডার ইঁহার

চরণতলে নিক্ষিপ্ত থাকা সত্ত্বেও ইনি ভিখারী;—হাড়মালা পরিধান করেন, বাঘছাল কোটীতে বেষ্ঠন করেন, চন্দন চুয়ার পরিবর্ত্তে শ্মশানের ছাই সর্ব্বাঙ্গে লেপন করেন; দেখিলে বোধ হয় ইহাঁর ন্যায় উন্মাদ এ সংসারে আর কেহ নাই।

সমস্ত দেব দেবী, কিন্নর কিন্নরী, দানব দানবী ইহাঁর দাসানুদাস হইলেও ইনি ভূত প্রেত লইয়া সর্ব্বদা রঙ্গ করেন; জগতের সকল প্রকার যান পরিত্যাগ করিয়া ইনি বৃদ্ধ বলদ বাহনে জগত পরিভ্রমণ করেন। ইহাঁর হাব ভাব, ইহাঁর বাহ্যিক প্রকৃতি, ইহাঁর বাহিরের ভাব দেখিলে ইহাঁর ন্যায় দরিদ্র ভিখারী সংসারে আর কেহ যে কখন ছিলেন বা হইতে পারেন, বলিয়া বোধ হয় না।

তবে কি ইনি প্রকৃতই ভিখারী? ইহাঁর কিসের অভাব? কৈলাস যাঁহার আবাস স্থল, কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী, দেব দানব যাঁহার দাস, তাঁহার কিসের অভাব? তিনি গরিব কিসে? যিনি অপরকে ধন, মান, অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন, যাঁহার বাক্যে পথের ভিখারী রাজছত্রধারী সম্রাট হয়েন, যাঁহার কৃপায় লঙ্কার দশানন দেব দানব কাহাকেই মানিতেন না, তাঁহার কিসের অভাব? তাঁহার সকলই আছে, অথচ তাঁহার কিছুতেই কামনা নাই, তাহাই তাঁহার সকল থাকিয়াও নাই। তাঁহার আছে সব, কিন্তু সে সকল থাকিলেও তিনি তাহাদের বিষয় ভাবেন না, মনে স্থান দেন না। তিনিই রাক্ষসনাথ মহা দুর্দ্দান্ত রাবণকে অদ্বিতীয় সর্ব্বত্র বিজয়ী করিয়াছিলেন, আবার তিনিই তাহার দাসরূপে স্বর্ণলঙ্কার দ্বারে প্রহরায় নিযুক্ত রহিতেন। তিনিই আবার রাম লক্ষ্মণ সাহায্যে দুর্দ্দান্ত রাক্ষসপতিকে সবংশ নিধন

করিয়া ছিলেন। যিনি ফুল সৃষ্টি করেন, তিনিই আবার দাসবৎ বায়ুরূপে সেই ফুলকে সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে থাকেন, তিনিই আবার সেই ফুলকে ঝরাইয়া দেন। এক তিনিই তিন ভাবে সর্ব্বত্র সকল স্থানে বিরাজ করেন,—তিনিই প্রভু, তিনিই দাস, তিনিই আবার ধ্বংসকর্ত্তা। তাহাই শিব সকল ঐশ্বর্য্যশালী পরম পুরুষ, তাহাই আবার তিনি ভিখারীরও অধম ভিখারী, তাহাই আবার তিনি সব। তিনি ধনি নহেন, তিনি দরিদ্রও নহেন, তাঁহার বর্ণনা "তিনিই সব" ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

তাঁহাকে দেখিলে পাগল বলিয়া বোধ হয়। বোধ হয়, শিবের ন্যায় উন্মাদ বুঝি এ সংসারে আর কখন জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার যে কোন হিতাহিত জ্ঞান আছে, তাহা তো বোধ হয় না। সকলে যাহা করিতে শত সহস্র বার ভাবিত, তিনি তাহাই অবাধে করেন। সকলে সুধা খাইলেন, বিষ দেখিয়া পলাইলেন, তিনিই সেই উৎকট হলাহল আনন্দে দুই হস্তে পান করিলেন। বিবাহের সময় তিনি সভাস্থানে উলঙ্গ হইয়া ছিলেন। তাঁহার উন্মত্ততার কত দৃষ্টান্ত প্রদান করিব? তাঁহার জীবন লীলার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, তাঁহার বিষয় আমরা যাহা যাহা পুরাণে ও তন্ত্রে উল্লিখিত দেখিতে পাই, তাহার সমস্ত আলোচনা করিলে, তাঁহাকে উন্মাদ, একেবারে জ্ঞান বিরহিত উন্মত্ত পাগল ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না।

তিনি কি তবে সত্যই পাগল? না, তাহা নহে। এক দিকে তাঁহাকে আমরা যেরূপ পাগল বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি, অপর দিকে আবার তাঁহাকে আমরা তেমনই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান

বলিয়া দেখিতে পাই। তাঁহার নিকট সমস্ত দেবতাগণ সর্ব্বদা জোড় হস্তে থাকিতেন।

এই যে অজ্ঞেয়; মনুষ্যবুদ্ধির অতীত, সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ের সম্মিলনযুক্ত শিব,—ইনি কে? পুরাণকার কেহই শিবের জন্ম-বৃত্তান্ত স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই। শিবের জননী নাই, শিবের পিতা নাই; তিনি কোথায় কবে জন্মিয়া ছিলেন তাহা আমরা জানি না। কেবল ইহাই নহে,—তিনি যে কবে জন্মিয়াছেন. কোথায় জন্মিয়াছেন, কিরূপে জন্মিয়াছেন, তাহাও কেহ এ পর্য্যন্ত স্পষ্ট বলিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে কয়েকটী অস্পষ্ট গল্প মাত্র বর্ণিত আছে, সেই সকল গল্পে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

আমরা শিবের জন্ম বৃত্তান্ত জানি না, তিনি কবে কোথায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না,—তাঁহাকে আমরা প্রথমেই কৈলাসে সংসারী রূপে দেখিতে পাই। সতী তাঁহার অঙ্ক সুশোভিনী পবিত্রতাময়ী দেবী,—নন্দী তাঁহার দাস, বলদ তাঁহার বাহন, কৈলাসের তুসার মণ্ডিত গিরি গহ্বর তাঁহার বাসভূমি। তিনি ভাং খান,—তিনি বাঘ ছাল পরেন,—তিনি ভস্ম মাখেন, হাড় মালা পরেন,—তিনি পরম সন্ন্যাসী,—অপরূপ যোগী।

অথচ তিনি গৃহী,—সতী তাঁহার গৃহের গৃহিণী।—আমরা প্রথমে যখন শিবকে দেখিতে পাই, তখন দেখি,—তিনি সম্পূর্ণ গৃহী, গৌরী তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিতা, তিনি কৈলাসে—সুন্দর, মনোহর, অদ্বিতীয়, ধরায় স্বর্গ সমান কৈলাসে—বাস করিতেছেন। তিনি পরম যোগী, সর্ব্বদাই যোগে নিমগ্ন হইয়া

রহেন; তাঁহার নাম যোগেশ্বর, কিন্তু যোগেশ্বর হইলেও তিনি পরম গৃহী, সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্বে পরম রূপবতী প্রকৃতিস্বরূপিনী অদ্বিতীয়া সতী বিরাজিতা। তাঁহার সহিত দক্ষ রাজার কন্যা সতীর বিবাহ হইয়াছে। সতী রাজার কন্যা, রাজসুখে লালিতা পালিতা হইলেও তিনি মহা সুখে ভিখারীর গৃহে ভিখারিণীর ন্যায় বাস করিতেছেন। তাঁহার সংসারিক অভাব সকলই আছে, তাঁহার অঙ্গে একখানি আভরণ নাই, তাঁহার পরিধান সর্ব্বদাই ছিন্নবস্ত্র, তৈল বিনা তাঁহার কেশে জটা জন্মিয়াছে; তিনি রাজকন্যা হইলেও দরিদ্রা ভিখারিণীর ন্যায় বাস করেন, এক দিনও এ সকলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন না। তিনি শিবের জন্য শিবানী, তিনি হরের জন্য পাগলিনী। বড় সুখেই শিবের সহিত শিবানী সোণার কৈলাসে পরম সুখে বাস করিতেছেন।

সতী প্রজাপতি দক্ষের কন্যা। দক্ষ রাজাধিরাজ মহারাজ, মানব, গন্ধর্ব্ব কিন্নর, দেব দানব, সকলেই দক্ষকে মান্য করেন, সম্ভ্রম করেন, মহারাজাধিরাজ মহারাজ বলিয়া স্বীকার করেন। সতী দক্ষের বড় আদরের কন্যা। তাঁহার আরও অনেক কন্যা ছিল. কিন্তু তিনি স্বর্ণপ্রতিমাসম নবনী নির্ম্মিত কোমল পুত্তলী সতীকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। এমন কন্যাকে তিনি কেমন করিয়া ভাঙ্গড়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন?

দেব দানব সকলে শিবকে মান্য করিতেন, শিবের নিকট ব্রহ্মা মস্তক অবনত করিতেন,—বিষ্ণু সর্ব্বদা সসম্মানে দূরে দণ্ডায়মান রহিতেন। সকলেই শিবকে মান্য করিতেন,—শিবের চরিত্র কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না,—ভাল বুঝা দূরে

থাকুক,—কেহই তাঁহাকে একেবারেই বুঝিতে পারিতেন না,—প্রজাপতি দক্ষও শিবকে ভাল বুঝিতে পারেন নাই। যাঁহাকে দেব দানব সকলেই ভক্তি করে, সেই শিবের হস্তে কন্যা সমর্পন করিয়া দক্ষ প্রকৃতই বড় সুখী হইয়াছিলেন,—কিন্তু তাঁহার এ সুখ চিরস্থায়ী হইল না।—শিবের গৃহে গিয়া রাজার কন্যা সতী, কাঙ্গালিনী ভিখারিণী হইলেন,—সন্ন্যাসীর গৃহে গিয়া তিনি সন্ন্যাসিনী হইলেন। রাজ কন্যা বল্কল ধারণ করিলেন। রত্ন ভূষার পরিবর্ত্তে হাড় মালা পরিধান করিলেন,—কোন দিন তাহার অন্ন সংস্থান হয়,—কোন দিন হয় না,—শিবের সংসারে সকলই আছে, অথচ কিছুই নাই। শিবের ভাণ্ডারী কুবের, কুবেরের হস্তে জগতের সমস্ত রত্ন রাজি, কিন্তু হইলে কি হয়,—শিবের কিছুতেই মমতা নাই, তাহার সকল থাকিয়াও কিছু নাই। থাকিলে কি হইবে, যিনি কিছুতেই মমতা করেন না, তাঁহার চরণ তলে রাশি রাশি রত্ন পতিত থাকিলেও তিনি ভিখারী, সতীরও তাহাই হইল। তাঁহার সোণার অঙ্গ ভস্মে আচ্ছাদিত হইল,—তাঁহার বিষাদময়ী সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া জগৎ ভুলিল, কিন্তু দক্ষের হৃদয়ে আঘাত লাগিল, দক্ষ কিছুই বুঝিলেন না ;— দক্ষ শিবের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। কন্যা শিবময়ী হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি সতীর প্রতিও বিরক্ত হইলেন। এই সময়ে আরও একটী ঘটনায় তিনি শিবের প্রতি একে বারে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন ; দেব গণের সভা আহুত হইয়াছে,—সকলে সমবেত, প্রজাপতি দক্ষও তথায় উপস্থিত, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য দেবগণ সকলেই স্ব স্ব আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন

কেবল শিব উঠিলেন না। তাঁহারই আসন পরিত্যাগ করিয়া দক্ষকে সম্মান প্রদর্শন অধিক কর্ত্তব্য ছিল, কারণ প্রজাপতি দক্ষ তাঁহার শ্বশুর। ইহাতে দক্ষ বড়ই অপমানিত বিবেচনা করিলেন; শিবের প্রতি মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন,—কিন্তু সেই দেব সভায় ক্রোধ প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে বিবেচনা করিয়া তিনি অতি কষ্টে হৃদয় ভাব গোপন করিলেন,—অতি ক্লেশে শিবের ঔদ্ধত্ব সহ্য করিলেন, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—শিব তাঁহার যেরূপ অপমাননা করিলেন,—তিনিও শিবের ঠিক তেমনই অপমাননা করিবেন।

ইহারই জন্য দক্ষ মহা যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। এ যজ্ঞে তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সর্ব্বত্রের সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন; কেবল শিবকে নিমন্ত্রন করিলেন না। যে যজ্ঞে ত্রিলোকের সকলে নিমন্ত্রিত,—সেখানে শিবের নিমন্ত্রণ নাই। শিব হীন যজ্ঞের আয়োজন, শিবের অপমাননা করিবার ব্যবস্থা,—কিন্তু শিব ও সতী ইহার কিছুই জানিতেন না। দূর কৈলাসের তুষার মণ্ডিত গিরি গহ্বরে তাঁহারা বাস করিতেন,—উভয়ে উভয়ের প্রেমে,—উভয়ের উভয়ের ধ্যানে মগ্ন রহিতেন, সংসারের ধার ধারিতেন না। জগতে কি হইতেছে,—কি না হইতেছে, তাঁহারা তাহার কিছুই দেখিতেন না। দক্ষপুরে যে মহা যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে তাহার তিনি কিছুই সম্বাদ রাখিতেন না।

সহসা শিবের সুখের সংসারে বিষাদের ছায়া পড়িল। দক্ষ রাজা মহা সমারোহে যজ্ঞের অয়োজন করিলেন। এই যজ্ঞে তিনি জগতের সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কেবল শিবের

নিমন্ত্রণ হইল না। তিনি ভিখারী শিবের প্রতি বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এমন উন্মাদ যে শিব তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার অপর অনেক জামাতা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ধনী ও সম্রান্ত, তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই ভদ্রলোক, শিবের মত উন্মাদ কেহই নহেন। শিব যেরূপ বেশভূষা করিতেন, তিনি যেরূপ সর্ব্বদা ভাঙ্গ খাইয়া ভোঁ হইয়া থাকিতেন, তিনি যেরূপ ভূত প্রেত লইয়া সর্ব্বদা ফিরিতেন, তাঁহার যেরূপ বলদ বাহন ছিল, তাহাতে তাঁহাকে জামাতা বলিয়া পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব। লোকালয়ে ও ভদ্র সমাজে তাঁহাকে পরিচয় প্রদান করিতে লজ্জা বোধ হয়। এতদ্ব্যতীত কন্যা সতীর কষ্টে দক্ষরাজা শিবের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কন্যার কষ্ট দেখিলে কোন্ পিতার না হৃদয়ে বেদনা লাগে? এই সকল কারণে দক্ষ নিজ যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ করিলেন না, সতীকেও গৃহে আনয়ন করিলেন না। পিত্রালয়ে যে মহা যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, সেই যজ্ঞে যে আকাশ, পাতাল, মর্ত্তের সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে, তাহা সতী কৈলাসে থাকিয়া কিছুই জানিতে পারিলেন না।

নারদ ঋষি দক্ষ যজ্ঞের নিমন্ত্রনে বহির্গত হইয়া ছিলেন। ভক্তির পূর্ণ আদর্শ ঋষি নারদ দক্ষের ব্যবহারে হৃদয়ে হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইয়া ছিলেন,—কিন্তু নিজ মনোভাব প্রকাশে কোনই ফল নাই ভাবিয়া তিনি দক্ষ রাজাকে কিছুই বলেন নাই,—তাঁহার অনুরোধে ত্রিলোকস্থ লোকগণকে নিমন্ত্রন করিতে প্রয়াণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি কৈলাসস্থ হাস্যময়ী মাকে একবার না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাকে

একবার এ সম্বাদ না দিলে তাঁহার মন প্রবোধ মানিবে না। তাহাই তিনি বীণা বাজাইতে বাজাইতে হরি গুণ গাইতে গাইতে কৈলাসে আসিয়া দেখা দিলেন।

তিনি কৈলাসে জগৎজননী রুদ্রানীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া গেলেন না। একবার এ যজ্ঞের কথা কৈলাসে না বলিয়া তিনি কিরূপে অন্যত্র গমন করিবেন। তিনি কৈলাসে আসিয়া জগৎজননীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যজ্ঞের কথা বলিলেন, তাঁহার মুখে পিতার যজ্ঞের কথা শুনিয়া নারদকে কিছুই না বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন, কেবল মাত্র হাসিয়া বলিলেন, "আমি ভিখারিণী, বাবা ভিখারিণীকে মনে করিবেন কেন!"

নারদের মুখে সতী পিতার আলয়ে মহাযজ্ঞের সম্বাদ পাইলেন, তিনি দরিদ্রা ভিখারিণী বলিয়া পিতা তাঁহাকে ভুলিয়াছেন ভাবিয়া তিনি হৃদয়ে ক্লেশও পাইলেন। পিতা নিমন্ত্রন করেন নাই, নাই করিলেন,—কন্যা পিতার আলয়ে যাইবে তাহার জন্য আবার নিমন্ত্রন কি! সকলে যেখানে আমোদ প্রমোদ করিবে, যেখানে তাঁহার সকল ভগিনী আসিয়া আমোদে মাতিবে, সেখানে সতী যাইবে না কেন! বিশেষতঃ সতী অনেক দিন জননীকে দেখেন নাই, একবার মাকে দেখিবার জন্য তাঁহার হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল;—এতদ্ব্যতীত, একবার পিতাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কি দোষে তিনি তাহার ভিখারিণী সতীকে ভুলিলেন? এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সতী দক্ষপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন,—এক্ষণে কেবল, শিবের অনুমতির অপেক্ষা!

নারদ চলিয়া গেলে সতী শিবকে দক্ষ যজ্ঞের কথা বলিলেন, "পিতা আমাকে সম্বাদ দেন নাই, নাই দিন। কন্যা পিতার বাড়ী যাইবে, তাহাতে তাহার আর নিমন্ত্রণ কি?" শিব শিবানীকে অনেক বুঝাইলেন; বলিলেন, "যেখানে আমার নিমন্ত্রণ হয় নাই, সতি, সেখানে তুমি গেলে কেবল অপমান হইবে।" কিন্তু সতী পিত্রালয়ে যাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তিনি কিছুতেই কোন কথা শুনিলেন না। তখন শিব নন্দিকে সঙ্গে দিয়া সতীকে দক্ষালয়ে প্রেরণ করিলেন।

মহা যজ্ঞের আয়োজন, মহা সভার অধিবেশন হইয়াছে। ত্রিলোকের সকলই সেই সভায় উপবিষ্ট, স্বয়ং ব্রহ্মা যে যজ্ঞের পুরোহিত, বিষ্ণু যে যজ্ঞের কার্য্যাধ্যক্ষ, দেবতাগণ যে যজ্ঞেরা পরিচারক, সে যজ্ঞের ও সে যজ্ঞ সভার বর্ণনা করিবার সাধ্য মানব লেখনীর কোথায়?

দক্ষালয়ে সতীর আগমনে কি ঘটিয়াছিল, তাহা ভারত-বর্ষের আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই অবগত আছেন। মহ যজ্ঞ বসিয়াছে, জগতের সকলেই সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছেন, দক্ষ রাজা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন; এমন সময়ে ভিখারিণী বেশে সতী সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধান ছিন্ন বস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাঁহার আজানুলম্বিত কৃষ্ণ কেশ জটায় বিলম্বিত, তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্য যেন মেঘাবৃত চন্দ্রের শোভা ধারণ করিয়াছে।

এই অপরূপ যজ্ঞ মণ্ডপে দুঃখিনী ভিখারিণীর ন্যায় সতী আসিয়া দাঁড়াইলেন, তৈল বিনা তাহার অজানুলম্বিত কৃষ্ণ কেশ

জটায় জড়িত হইয়া পৃষ্ঠে বিলম্বিত, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মে আবরিত, তাঁহার কণ্ঠে হাড় মালা সুশোভিত, পরিধানে বল্কল, হস্তে ত্রিশূল। অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ময়ী মা সভা মণ্ডপে আসিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন, দেব দানব, সকলে সসম্মানে সভয়ে সভক্তি সহকারে দণ্ডায়মান হইলেন,—কিন্তু ভ্রান্ত দক্ষ নিজ কন্যাকেও চিনিলেন না। রাজ সভায় নিজ কন্যাকে ভিখারিণী বেশে দেখিয়া অভিমানে, অপমানে, শোকে, দুঃখে দক্ষ আত্মজ্ঞান বিরহিত হইলেন, ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান হারাইলেন; তিনি সেই সভা মণ্ডপেই কন্যাকে ভৎ‍র্সনা করিতে আরম্ভ করিলেন, শিব নিন্দা ধরিলেন। সে নিন্দা, সে ভৎ‍র্সনার উল্লেখ আমরা করিব না। সতী কাতরে পিতাকে নিরস্ত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, পুনঃ পুনঃ বলিলেন, "পিতঃ,— আপনিই শিক্ষা দিয়াছেন, সতীর পক্ষে স্বামী নিন্দা শ্রবণ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। সতী সকল সহিতে পারে কেবল স্বামী নিন্দা সহিতে পারে না"।

এ কথায়ও দক্ষের চৈতন্য হইল না, দক্ষ শিব নিন্দা পরিত্যাগ করিলেন না, তখন সেই সভা মণ্ডপে ত্রিলোকের সমস্ত দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নরের সম্মুখে সতী প্রাণত্যাগ করিলেন, চারি দিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল, আনোন্দৎসব শোকে পরিণত হইল। দক্ষরাজমহিষী প্রভৃতি কন্যার শোকে উন্মাদিনী হইয়া রাজ সভায় আসিয়া সতীর মৃত দেহ ক্রোড়ে লইয়া ব্যাকুলে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সতী হারাইয়া নন্দি কৈলাসে ফিরিল।

ভূতনাথ এ নিদারুন সম্বাদ শুনিলেন, তাঁহার অচল অটল হিমালয় সদৃশ দেহ পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইল, তাঁহার ত্রিনয়ন হইতে ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি নির্গত হইতে আরম্ভ হইল, তিনি উন্মত্তের ন্যায় ভূত প্রেত সহ দক্ষপুরে যাত্রা করিলেন।

যোগেশ্বর সতীর মৃত্যু সম্বাদ পাইয়া কি করিলেন, তাহাও আমরা সকলে জানি,—পাগল শিব একেবারে পাগল হইলেন। এই সম্বাদ পাইয়া শিব একেবারে ক্ষেপিলেন। ভূত প্রেতগণ সঙ্গে লইয়া শিব মার মার শব্দে দক্ষযজ্ঞে আসিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলই নষ্ট হইল, দেখিতে দেখিতে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস হইল। দক্ষের মস্তক ভূপাতিত হইল। শিব ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া যজ্ঞমধ্যে ধেই ধেই নৃত্য করিতে লাগিলেন।

নিমিষে দক্ষ যজ্ঞ নষ্ট হইল, দক্ষ শির ভূতলে নিপতিত হইল, জগত ব্রহ্মাণ্ড শিব কোপানলে ভষ্মীভূত হইবার উপক্রম হইল।—তখন প্রসূতি আসিয়া শিবের চরণে কাতরে কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার ব্যাকুল ক্রন্দনে শিবের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল, তিনি দক্ষের প্রাণ দান করিলেন, তবে বলিলেন, "নন্দি, যে মুখে দক্ষ সতীকে ভৎর্সনা করিয়াছে ও শিব নিন্দা করিয়াছে সে মুখ আর তাহার হইবে না। উহার ছাগ মুণ্ড করিয়া দেও।" তাহাই হইল, তখন শিব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে ফেলিয়া উম্মত্তের ন্যায় নাচিতে নাচিতে কৈলাসের দিকে ফিরিলেন।

তিনি সে দেহ ছাড়েন না, দিন রাতি তিনি সেই দেহ স্কন্ধে করিয়া ত্রিলোক পরিবেষ্টন করিয়া বেড়ান, তাঁহার যোগ, ধ্যান,

ধারনা কোথায় গিয়াছে, সতীর প্রেমে তিনি আত্মহারা। তিনি সংসারের সহিত একেবারেই নির্লিপ্ত, যাঁহার সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ একেবারেই নাই, তিনিই আবার এত প্রেমিক। স্ত্রীর জন্য তিনিই আবার এত উন্মত্ত!—এত বিভিন্ন প্রকৃতির সম্মিলন আর কোন স্থানে নাই,—এত সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির একত্রে সমাবেশ আমরা জীবনে আর কখন কোথায়ও কাহারও চরিত্রে দেখি নাই। শিবে সকলই অদ্ভুত,—শিব চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে সম্পূর্ণ অসম্ভব চরিত্র বলিয়া প্রতীতি জন্মে। একাধারে যে কখনও এরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সম্মিলন হইতে পারে তাহা মানব মনে সহজে ধারণা হয় না। আমরা শ্বেত ও কৃষ্ণের এক সময়ে একত্রে অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। আলো ও অন্ধকার যে দুইই একত্রে থাকে তাহাও আমরা কল্পনা করিতে পারি না, কিন্তু শিব চরিত্র এই রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতি লইয়াই গঠিত। যত বিভিন্নতা (contradictions) সকলই একত্রে।

এই শিব পাগল, এই শিব পরম জ্ঞানী। এই শিব সন্ন্যাসী, এই শিব গৃহী,—এই শিব যোগী, এই শিব সংসারী। এই শিব ভয়াবহ ভয়ঙ্কর, এই শিব চিত্তবিনোদন মনোহর। এই শিব ক্রোধময়,—এই শিব দয়াময়। তাঁহাতে ভাল মন্দ, আলো অন্ধকার,—শ্বেত ও কৃষ্ণ,—সমস্তই একাধারে একত্রে বিরাজ করে।

ভগবানের চরিত্র ও রূপ যদি কল্পনা করিয়া দেখাইতে হয়, তাহা হইলে শিব চরিত্র ও শিব মূর্ত্তি ভিন্ন সুন্দর চরিত্র আর নাই। কল্পনায় ইহাপেক্ষা আর সুন্দর চরিত্র ও মূর্ত্তি হইতে পারে না।

শিবের অতুলনীয় চরিত্রের চিত্র আমরা কেবল একটি মাত্র দেখাইয়াছি, সেটী শিবের জীবন নাটকের প্রথমাঙ্ক মাত্র। আমরা শিবের জীবনের আর একটী অঙ্ক দেখাইব।

শিবের মৃত্যু নাই;—মৃত্যু থাকিলে শিব বোধ হয় সতীর বিরহে বাঁচিতেন না। তিনি যে কতকাল সতী দেহ স্কন্ধে করিয়া পাগলের ন্যায় ফিরিয়া ছিলেন, তাহার সীমা নাই। কেহ সাহস করিয়া তাঁহার নিকট যাইতে পারে নাই, কেহ সাহস করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সতী দেহ ছিন্ন করিয়া লইতে পারে নাই,—এমন কি কেহ তাঁহার নিকট সে দেহ চাহিতেও সাহস পায় নাই। তিনি পাগলের ন্যায় সতীর সেই মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া ত্রিলোক পরিবেষ্ঠন করিয়া ফিরিলেন, কোথাও কেহ তাঁহার নিকট হইতে সতী দেহ ছিন্ন করিয়া লইতে পারিল না। কথিত আছে,—শেষে বিষ্ণু সুদর্শনচক্রে দূর হইতে সেই দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া চারি দিকে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

তবুও শিবের চৈতন্য নাই। তবুও শিবের জ্ঞান যে সতী দেহ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার স্কন্ধেই রহিয়াছে। তিনি সেই ভাবেই কত কাল পাগলের ন্যায় ত্রিলোক পরিবেষ্ঠন করিলেন, তৎপরে যেই তাঁহার জ্ঞান হইল যে সতী দেহ আর তাঁহার স্কন্ধে নাই,—অমনই তিনি গভীরতম যোগে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন;—সে যোগ অনন্ত, অসীম, অতুলনীয়,—কতকাল যে তিনি এই রূপ সমাধিস্থ হইয়া ছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে।

এ[illegible]ক দৃশ্য. আবার আর এক দৃশ্য দেখুন।—তিনি প্রেমের [illegible]স। তিনি সতীকে ভুলেন নাই, ভুলিতে পারেন

নাই, সতীও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই, তাঁহার আত্মা ও শিবের আত্মা এক হইয়া গিয়াছে, তিনি কেমন করিয়া কোথায় গিয়া কতক্ষণ রহিবেন? তিনি শিবের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য আবার জন্ম গ্রহণ করিলেন।

এবার হিমালয়ের গৃহে মেনকার গর্ভে সতী "উমা" নাম ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। হিমালয় রাজাধিরাজ মহারাজ,-পরম রূপ লাবণ্য সম্পন্না কন্যা দেখিয়া কন্যার নাম আদরে "গৌরী" রাখিলেন। মহাকবি কালিদাস যে গৌরীর রূপ বর্ণনা করিতে পরাভব মানিয়াছিলেন, সে গৌরীর রূপ বর্ণনা এ সংসারে হইতে পারে না, হইলেও আমরা সে গৌরীর রূপ বর্ণনার প্রয়াস পাইব না। দিন দিন গৌরী হিমালয়ের গৃহে কৃষ্ণ পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় শোভা লাভ করিতে লাগিলেন।

পুরাণের পর পুরাণ রচিত হইয়া গৌরীর বাল্য লীলা বর্ণিত হইয়াছে। গৌরী অতি শৈশব হইতে শিব পূজা করেন, শিব ভিন্ন অন্য বরে কখনই আত্ম সমর্পণ করিবেন না। হিমালয় স্বর্গ, মর্ত, পাতালের পুরুষপ্রধানগণের সহিত প্রাণসমা কন্যা গৌরীর বিবাহ দিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু গৌরী তাঁহাদের কাহাকেই বিবাহ করিবেন না। তিনি গভীর অরণ্যে প্রবৃষ্ট হইয়া গৈরিকধারিণী সন্ন্যাসী রূপে সর্বদা শিবের ধ্যান করেন, যাহাতে শিব লাভ করিতে পারেন, তাহারই জন্য ব্যাকুল হইয়া ফিরেন।

যখন গৌরী যৌবন শোভায় ভাসমানা হইলেন; সেই সময়ে এক দিন নারদ হিমালয় গৃহে আসিয়া গৌরীকে দেখিয়া তাঁহাকে

জগত জননী শিবের শিবানী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তিনি এ রহস্য হিমালকে বলিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলেন না ও যাহাতে শিবের সহিত গৌরীর বিবাহ হয়, তাহারই চেষ্টা পাইবেন বলিয়া কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শিবের সহিত গৌরীর বিবাহ হইয়া গেল। এ বিবাহ বর্ণনা আমরা করিব না। মহাকবি কালিদাস সুন্দর রঙ্গে এই অতি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন; এমন বিবাহ এ জগতে আর কখনও হয় নাই। সন্ন্যাসীর সহিত গৃহীর সম্মিলন, আলোর সহিত অন্ধকারের মিলন, সৌন্দর্য্যের সহিত কুৎসিতের সংযোগ. দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির একত্রে বিবাহ।

তাহার পর কৈলাসে এ কি সুন্দব দৃশ্য! কৈলাসে প্রেমের হাট বসিয়াছে। ভিখারীর গৃহে রাজার রাজ পরিবারের সংঘটন হইয়াছে। সন্ন্যাসীর আশ্রমে গৃহীর গৃহ সংস্থাপিত হইয়াছে. গৌরীর সুন্দর পুত্র কন্যা প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় কৈলাসে শোভা বৃদ্ধি করিতেছেন। গজানন মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন, স্বয়ং শিব তাম্বুরা লইয়া গান ধরিয়াছেন. মা বিণাপানী,—সঙ্গীত বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—স্বয়ং বীণা বাজাইয়া সমস্ত কৈলাস মধুরতাময় করিতেছেন। কে বলে এ সংসারে দরিদ্রতা আছে, কে বলে এ সংসারে দুঃখ কষ্ট শোক সন্তাপ আছে, কে বলে সন্ন্যাসীর আশ্রমে গৃহীব গৃহ হয় না, কে বলে গৃহীর গৃহে সন্ন্যাসীর পূত আশ্রম সংস্থাপিত হওয়া অসম্ভব?

সকলই সম্ভব, এ জগতে "সুখী" হওয়া সম্পূর্ণ রূপে সম্ভব, যাহার বিশ্বাস না হয়, তিনি একবার উত্তরে হিমালয় উত্তীর্ণ হইয়া কৈলাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। একবার চক্ষু মুদিত

করিয়া, শিবের সংসারের ধ্যান ও ধারণা করুন। সহজে এ পরম সুন্দর অতুলনীয় দৃশ্য দেখিবার উপায় নাই, কেবল ধ্যান এবং মানব মনের ঐকান্তিক অভিনিবেশ ও ধারণা, এই সকলের সহিত দৃষ্টিপাত করিলেই কৈলাসের পবিত্র চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা কল্পনায় হইয়াছে, যাহা ভাবরাজ্যে জন্মিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে প্রাকৃতিক রাজ্যে না হইলেও অনেকটা হইবার সম্ভাবনা আছে। চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি? আসুন, আমরা সকলে শিব দুর্গা হইবার চেষ্টা করি,—কারণ এ সংসারে সুখী হইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই, পথ নাই;—শিব দুর্গাই গতি, শিব দুর্গাই মুক্তি।

হিন্দুর পুরাণ শাস্ত্রে ইহাই হইয়াছে। বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, দর্শন ও দর্শনাপেক্ষাও উচ্চ দর্শন,—বৌদ্ধ জ্ঞান.—এই ধর্ম্মের মূল; পুরাণ এই ধর্ম্মের শাখা প্রশাখা, রাধা কৃষ্ণ ও হর গৌরী এই সুন্দর অতুলনীয় মনোহর বৃক্ষের পল্লব ও বল্লরী, তৎপরে তন্ত্র, তৎপরে মহম্মদীয় ও খৃষ্টান ধর্ম্ম, তৎপরে পাশ্চত্য জ্ঞান ও শিক্ষা ইহার ফল ও ফুল।

ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম ধীরে ধীরে কত উন্নত ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আর্য্য ধর্ম্মের ইহাই পূর্ণতা নহে, পরে এই আর্য্যধর্ম্ম ভারতে কত উন্নত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এই পুস্তকের তৃতীয়াংশে আমরা অতি সঙ্ক্ষেপে তাহাই দেখাইব। হিন্দুর ভারতে হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত অবনতি হয় নাই,—কখন হইবেও না।

আমাদের বিশ্বাস, পুণ্যভূমি ভারতই মানবজাতির ধর্ম্মালোক দেখাইবার পূর্ণ চন্দ্র, মূল উৎস ও গভীরতম সমুদ্র। ভারত হইতে ধর্ম্মালোক ও জ্ঞানালোক চিরকাল জগতে বিকীর্ণ হইয়াছে, এখনও হইতেছে, এবং চিরকাল জগতের শেষ পর্য্যন্ত হইবে।

দ্বিতীয়াংশ সমাপ্ত।

তন্ত্র হইতে অধুনিক কাল।

শাস্ত্র মহিমা।

(তৃতীয়াংশ।)

তন্ত্র।

সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ।

আমরা দেখিয়াছি, পৌরাণিক কালে ভারতে জ্ঞান চর্চ্চা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়া ভক্তিরই প্রাবল্য হাইয়াছিল। যদি কেবল ইহাই হইত, যদি হিন্দু ধর্ম্মে এই সময়ে বহু লতা গুল্ম না জন্মিত, তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মে এই দুই সুন্দর চিত্রে যে উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে ইহার গৌরব ও মহিমা বৃদ্ধি হইত ব্যতিত কখনই লাঘব হইত না। কিন্তু গৃহী ব্রাহ্মণ গণ নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য সমাজে বহু প্রকার ক্রীয়া কলাপ প্রচলিত করিয়াছিলেন, এই সকল ক্রীয়া কলাপ, ব্রত, পূজা, তীর্থ দর্শন, সমাজে এত অধিক আধিপত্য লাভ করিয়াছিল যে কেবল বাহ্যিক ক্রীয়া কলাপের আড়ম্বরই ধর্ম্মের সকল [illegible] মূল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাণের ও হৃদয়ের ভাব উঠিয়া গিয়া সকলই বাহ্যিক আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্ম হৃদয় হইতে বাহ্যিক ক্রীয়া কলাপে বিরাজ করিতেছিল। এমন যে সুন্দর

রাধাকৃষ্ণ ও হর গৌরী, তাঁহারা লোকের প্রাণে প্রাণে প্রবিষ্ট হইতে পারিতেন না। লোকে ফুল নৈবিদ্য দিয়া তাঁহাদের পূজা করিতেন বটে, কিন্তু প্রাণের সহিত ও হৃদয়ের সহিত সে পূজার কোন সম্বন্ধ ছিল না। ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য, ব্রাহ্মণগণের স্বার্থপরতায় ও ব্রাহ্মণগণের কৌশলে ভারত হইতে প্রকৃত বেদ বিহিত হিন্দু ধর্ম্ম একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

তাহাই আবার ভারতে জ্ঞান চর্চ্চার আবশ্যক হইল। পৌরাণিক কালে ভক্তির চর্চ্চা নাম মাত্র থাকিলেও, ভক্তি চর্চ্চা ছিল, কিন্তু জ্ঞান চর্চ্চা একেবারেই ছিল না।—তাহাই আবার দেশে জ্ঞান চর্চ্চার উন্নতি হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িল ;—ইহারই ফল তন্ত্র শাস্ত্র।

অনেকে তন্ত্র শাস্ত্রের নামে শিহরিয়া উঠেন, অনেকে তন্ত্র শাস্ত্রকে কুৎসিত, অশ্লীলতা পুর্ণ বিষয় ভাবিয়া একেবারে তন্ত্র শাস্ত্রের নামে কর্ণে অঙ্গুলি আচ্ছাদন দেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তন্ত্র শাস্ত্র হিন্দু শাস্ত্রের অবনতির চিহ্ন নহে, জ্ঞান ও চিন্তার কখনও অবনতি হয় নাই এবং হইবেও না।

বেদ হিন্দু শাস্ত্রের মূল,—আরণ্যক ও উপনিষদ্ সেই বেদের গভীরতম ভাব ব্যাখ্যার চেষ্টা মাত্র, দর্শন তাহারই আরও অধিক উন্নত বিকাস, বৌদ্ধ শাস্ত্র তাহারই আবার আরও উন্নত ভাব, পুরাণোল্লিখিত রাধা কৃষ্ণ ও হর গৌরী তাহাপেক্ষাও উন্নত ব্যাপ্তি,—তন্ত্র অবনতি নহে। তন্ত্র পুরাণ অপেক্ষাও উন্নত হিন্দু ধর্ম্মের বিকাশ।

বেদ বলিলেন, "ভগবান আছেন. তিনি অজ্ঞেয় অসীম।" আরণ্যক ও উপনিষদ তাঁহার স্বরূপ জানিবার চেষ্টা করিলেন ;

দর্শন আসিয়া মানবের মুক্তির উপায় কি তাহারই বিচার করিলেন। স্থির হইল, জ্ঞান ও ভক্তিই ইহার উপায়। গীতা বলিলেন, "জ্ঞান ও ভক্তিই মূল; এই দুই পথের এক পথ অবলম্বন কর।" শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিলেন, "জ্ঞানমার্গ বড় কঠিন, সংসারে থাকিয়া এ পথে বিচরণ সহজ নহে, ভক্তিতেই মজিয়া যাও।" তৎপরে পুরাণ আসিয়া বলিলেন, "দেখ, ভগবান জ্ঞান রূপে কৈলাসে ও প্রেম রূপে বৃন্দাবনে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুই অবতারের মত হইবার চেষ্টা কর, ঐ দুই চিত্রের সমতুল্য হইলেই মুক্তি।" তৎপরে তন্ত্র আসিয়া বলিলেন, "জ্ঞান ও ভক্তিকে প্রভেদ করিবার আবশ্যক কি? "এক" ব্যতিত এ সংসারে দুই নাই। তাঁহাকে "এক" রূপে পূজা কর, ধ্যান কর। তিনিই ভাল, তিনিই মন্দ, তিনিই সুন্দর, তিনিই কুৎসীত, তিনিই আলোক, তিনিই অন্ধকার; তিনিই হাসি, তিনিই কান্না; ভাল মন্দ এ সংসারে কিছুই নাই।"

তন্ত্রকার এই বেদবিহিত, উপনিষদঅনুমোদিত, দর্শন-সম্মত ও পুরাণোল্লিখিত "শক্তি" ধর্ম্মের পতাকা ভারতে উড্ডিয়মান করিলেন। কি নামে তাঁহারা এই ভগবানকে অভিহিত করিবেন? তাঁহারা দর্শনের প্রকৃতি, পুরাণের সতীকে "কালি", নাম প্রদান করিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম প্রাঙ্গনে তাঁহার আসন সংস্থাপন করিলেন। দর্শন বহু চিন্তায় জগতের মূলে দুইটী শক্তি আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্ত্রকার বলিলেন, "এই দুই শক্তির মূল, মহাশক্তি;—তিনিই মহাকালী।" ভগবানের ভাব যদি উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা উচ্চভাব আর হইতে পারে না!

তন্ত্রকার এই মূর্ত্তির একটী আকারও প্রদান করিলেন,—এই আকারময়ী মহাশক্তিই কালী নামে ভারতের মন্দিরে মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। মা,—জগত জননী, বিপদ নাশিনী, দুষ্ট দলনী, এক হস্তে জগতকে অভয় প্রদান করিতেছেন, অপর হস্তে শানিত খড়্গে তিনি জগতকে ধ্বংশ করিতেছেন; এক হস্তে খর্পরি পূর্ণ শোনিত, অপর হস্তে নরমুণ্ড। তিনি এক হস্তে জগত ধ্বংশ করিতেছেন, অপর হস্তে তিনিই আবার জগতকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি উন্মাদিনী, তিনিই আবার শক্তিময়ী মহাদেবী। মা,—তিনি জগতের মা;—তিনি ব্যতিত এ সংসারে আর কিছুই নাই। তাঁহার যে রূপ ভারতে কল্পিত হইয়াছে, তেমন রূপ আর কল্পিত হইবে না। ইহাপেক্ষা দয়াময়ী মায়ের আর উৎকৃষ্টতর রূপ হইতে পারে না।

শাক্ত ধর্ম্মের এই মূল কথা। এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য শত শত গ্রন্থ তন্ত্র নামে প্রকাশিত হইয়াছে; বোধ হয় তন্ত্রের সংখ্যা পুরাণাপেক্ষা অল্প নহে। এত তন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে যে তাহার সংখ্যা হয় না, এই সমস্ত তন্ত্রের নাম এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। কালী তন্ত্র, জামল তন্ত্র, মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি তন্ত্র অতি সুন্দর ও জ্ঞানগর্ভ কথায় পূর্ণ। সমস্ত তন্ত্রেই মঙ্গলময় শিব শিবানীকে উপদেশচ্ছলে এই সকল তন্ত্র শাস্ত্র বলিয়াছেন। ইহাতে কিরূপে শক্তিকে উপাসনা করিলে শক্তিকে লাভ করিতে পারা যায়, তন্ত্র শাস্ত্রে তাহাই বিষদরূপে লিখিত হইয়াছে। এই উপাসনা ও পূজা পদ্ধতি একরূপ নহে, দুই সহস্র প্রকার শক্তি পূজা প্রণালী ভারতে প্রচলিত আছে। কত শ্রেণীর ও

কত সম্প্রদায়ের যে শাক্ত আছেন, তাহারও সংখ্যা করা যায় না।

দুঃখের বিষয়, আধুনিক কালে এই সকল উপাসনাপদ্ধতির নাম ভিন্ন আমরা আর অন্য কিছুরই উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। আধুনিক সমাজে যাহা কিছু কুৎসিত, মন্দ, অশ্লীল, তাহাই লইয়া তন্ত্রের শক্তি সাধনা। এই সকল বিষয় উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে গেলে আধুনিক সমাজে আমাদের এই পুস্তক অতি হেয়, ঘৃণিত ও হতশ্রদ্ধ হইবে; বোধ হয় এই পুস্তকের জন্য আমাদিগকে কারাগারেও যাইতে হইবে। এই সকল কারণে অতি দুঃখের সহিত আমরা এই সকল বিষয় বর্ণনা করিব না।

যদি এই সকল তন্ত্রোল্লিখিত বিষয় এতই কুৎসিত ও অশ্লীল হয়, তবে কি রূপে তন্ত্র শাস্ত্র এত উন্নত ও এত উচ্চ হইতে পারে? তবে কোন সাহসে আমরা এই রূপ তন্ত্র শাস্ত্রকে এত উন্নত ও মহান বলিতেছি?

আমরা তন্ত্র শাস্ত্র আলোচনার প্রথমেই বলিয়াছি, তন্ত্রের মূলে তান্ত্রিক বলিতেছেন, "এ সংসারে ভাল মন্দ কিছুই নাই।" বেদান্তের মত আরও পরিস্ফুট করিয়া তন্ত্র শাস্ত্রে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্ত বলেন, "এ সংসারে ভেদাভেদ নাই।" তবে বেদান্ত ভাল ও মন্দ, এ উভয়েই যে এক,—এ কথা কখনও বলেন নাই। তন্ত্র শাস্ত্র বলিলেন, "যদি কিছুরই ভেদাভেদ না থাকে, তবে সংসারে যখন ভাল মন্দ দুই আছে, তখন ভাল মন্দ আবার কি? তখন আবার ভাল মন্দে প্রভেদ করিবার চেষ্টা কেন?" তন্ত্র বলিলেন, "সংসারে যে গুলি মন্দ বলিয়া গণিত,

দেখিতে পাওয়া যায়, মানব মন তাহাতেই অধিক আকৃষ্ট হয়। যখন ইহাই স্বভাবের নিয়ম, তখন মনকে এই প্রবত্তি হইতে নিবৃত্তি করিতে না পারিলে কখনই মনকে শক্তিতে একোনিবেশ করিতে পারা যায় না।" তাহাই শাক্ত বলেন, "এই সকল দ্রব্য,—যথা মদ্য মাংস, মৈথুন,—প্রভৃতি লইয়া সাধনা করিলে ক্রমে এই সকলে আর কোনই প্রবৃত্তি থাকিবে না; প্রবৃত্তি না থাকিলেই মন শক্তিতে বিলীন হইবে,—ইহাই মুক্তির উপায়।"

ব্রাহ্মণের যাগ যজ্ঞ ক্রীয়া, পুরাণের ব্রত পালনাদি, যোগের গুপ্ত বিষয় সকল, এইরূপ হিন্দুধর্ম্মের সকল গূঢ়তত্ত্বের উন্নতি করিয়া শাক্তগণ তাঁহাদের এই মহ ধর্ম্ম সৃষ্টি করিলেন;—দুঃখের বিষয়, কালে কালে কুলোকের হস্তে পড়িয়া পবিত্র ঋষিধর্ম্ম লোকাচারে ও পাপাচারে পরিণত হইয়াছে।

ধর্ম্মের নামে দেশে এতই পাপ চার আরম্ভ হইল যে অবশেষে চৈতন্যদেবের জন্ম আবশ্যক হইল। নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ জন্ম গ্রহণ করিলেন,—তিনি ভক্তির ধর্ম্ম ও প্রেমের ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়া জগতকে একেবারে মাতাইয়া তুলিলেন। যে প্রেমের স্রোতস্বতী এত দিনে ধীরে ধীরে বহিতেছিল, তাহাই গৌরাঙ্গের আবির্ভাবে আবার প্রবল তরঙ্গে দেশ ভাসাইয়া ছুটিল; গৃহে গৃহে রাধা কৃষ্ণের নাম ধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইল; কৃষ্ণপ্রেমে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে পাগল হইয়া গেল। গৌরাঙ্গ বলিলেন, "প্রেমই সব, প্রেমে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাও, তাহা হইলেই মুক্তি,—পরমানন্দ।"

ভারতের সকল গিয়াছে, কিন্তু চৈতন্যের প্রেম যায় নাই। হিন্দুধর্ম্মে কত লতা গুল্ম জন্মিয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রেম,—চৈতন্যের প্রেম,—প্রবল স্রোতে উৎক্ষীপ্ত হইতেছে, রাধানামে ভারত মাতিতেছে।

আধুনিক কাল।

অনেকের বিশ্বাস,—আধুনিক সময়ে ভারতবর্ষে ইংরাজি শিক্ষাও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় দেশ হইতে হিন্দুধর্ম্ম বিলীন হইতেছে। আমরা বলি,—তাহা নহে; ইহাতে পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি ব্যতিত অবনতি হইতেছে না। কই, উন্নত, জ্ঞানপূর্ণ, প্রেমময় জিষুধর্ম্ম ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আসিয়া হিন্দুধর্ম্মকে বিলীন করিতে পারে নাই! কই, হিন্দুগণতো খৃষ্টিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই! বরং আমরা দেখিতে পাই, ইহাতে দিন দিন লোকের মনে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ জন্মিতেছে।

রাজা রাম মোহন জন্মিয়া উপনিশদ, দর্শন ও তন্ত্রের আদর বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন;—এক্ষণে ইয়োরোপে, মুয়ার, গোল্ড-ষ্টুকার, মাক্সমলার প্রভৃতি যাহা লিখিতেছেন, তাহাতেও হিন্দু শাস্ত্রের মহিমা বৃদ্ধি হইতেছে, পরে মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন জন্ম গ্রহণ করিয়া যে নববিধান ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাও হিন্দু ধর্ম্মের অতি অধিকতর বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই।

যে পুস্তকে হিন্দু শাস্ত্রের মহিমা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য, সে পুস্তকে আধুনিক কালে যে সকল ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে,

তাহাদের বিশেষ আলোচনা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই, তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলি,—কি মুসলমান ধর্ম্ম, কি খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম, কি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, কি নববিধান ধর্ম্ম, সমস্তই হিন্দুধর্ম্মকে উৎকর্ষিত করিয়াছে। ইয়োরোপিয় জ্ঞান ও শিক্ষা ভারতে আসিয়া হিন্দুধর্ম্মকে আরও অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছে? হিন্দু ধর্ম্মের গৌরবের শেষ হয় নাই; হিন্দু ধর্ম্ম জ্ঞানের ধর্ম্ম, হিন্দু ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম। যতই জগতে জ্ঞান ও প্রেম বৃদ্ধি হইবে, ততই হিন্দু ধর্ম্ম উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবে।

সম্পূর্ণ